



এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমণ্ড*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম*দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো
মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?
বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার
গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ
পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ*বিদম্ম রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা
সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা
পালাবে কোথায়*টাগেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রত্যাভ্রা*বন্দী গগল*জিম্মি
তথ্য যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ধ্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্ণরাজ্য
উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুড়া
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ
শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা
অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট
মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে
মুক্ত বিহঙ্গ*কচক্র*চাই সম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অন্তঃ*জুয়াড়ী*কালো টাকা
কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যাবাবী*যাত্রীরা হিশিয়ার*অপারেশন চিতা
আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*স্থাপন সংকল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক
তিষ্ঠা অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর
কম্পক*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্যায়ী
ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাঁউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি
কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল
মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া
টাগেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাদ*শয়তানের ঘাটি
ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি
দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তরুণের তাস*কালসীপ
গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্ধাডু*কান্তার মক্ক*ককটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে
শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত ধাবা*জন্মশত্রু
মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা
মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা
সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপূর্ণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু
মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোষ্ঠুর*আবার ষড়যন্ত্র
অন্ধ আক্রোশ*অন্তঃ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল
শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত
*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাক্ষনজজ্যা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15
অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম
*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশ্কাপনের টেকা
কালো নকশা*কালনাগিনী*বেইমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন
*বিষচক্র।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনভুক্ত দণ্ডনীয়।

এক

পাকিস্তান, রাজধানী ইসলামাবাদ। স্থানীয় সময় সকাল দশটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের উপর আততায়ীদের একটা হামলা হতে যাচ্ছে।

প্যাভোরা থেকে মাইল দুই দক্ষিণে পাতা হয়েছে অ্যামবুশটা।

এর আগেও যেহেতু বেশ কয়েকবার প্রেসিডেন্টের উপর হামলা হয়েছে, সেইহেতু নিরাপত্তার আয়োজনটা যতটুকু সম্ভব নিশ্চিত আর নিখুঁত করা হয়েছে, কোথাও এতটুকু অবহেলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি।

প্যাভোরার একটা ফাইভ স্টার হোটেলে কাশ্মীর ইস্যুকে নিয়ে বিদেশী দূতাবাস প্রধানদের একটা সেমিনার উদ্বোধন করবেন প্রেসিডেন্ট, সেটার মূল সুর হবে ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে ভারতের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার মধ্যেই রয়েছে পাকিস্তানের মঙ্গল। ওখান থেকে ভাবরা আর লিয়াকত বাগ হয়ে রাউয়ালপিন্ডি ক্যান্টনমেন্টে যাবেন তিনি, রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন: আমেরিকার সহায়তা নিয়ে কীভাবে ধর্মাত্মক মৌলবাদীদের শায়েস্তা করা যায়।

সংশ্লিষ্ট রাস্তাগুলো থেকে এক ঘণ্টা আগেই সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ট্রাফিক পুলিশও তুলে নেওয়া হয়, তাদের বদলে হাজির হয় ভ্যান ভর্তি আর্মড মিলিটারি পুলিশ:

শয়তানের দ্বীপ

প্রতিটি রাস্তায় বিশ গজ পর পর জোড়ায় জোড়ায় পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেছে তারা।

রাস্তার দু'ধারের বহুতল ভবনগুলোর ছাদে সামরিক বাহিনীর স্নাইপাররা পজিশন নিয়েছে, যার যার টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রেখে রাস্তা আর চারপাশে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। মিলিটারি পুলিশ আর স্পেশাল ব্রাঞ্চের পেট্রল কার প্রতি তিন মিনিট অন্তর টহল দিচ্ছে প্রতিটি রাস্তায়। ফুটপাথ, আইল্যান্ড, ফোয়ারা, লাইটপোস্ট, ফুলবাগিচা, পার্ক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দোরগোড়া, বিলবোর্ড ইত্যাদির চারপাশে বিস্ফোরক বা বোমা আছে কিনা পরীক্ষা করে গেছে সামরিক বাহিনীর এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টরা। আর আছে হেলিকপ্টার, সংশ্লিষ্ট রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করছে সেগুলো, তীক্ষ্ণ নজর রাখছে গোটা এলাকার উপর।

নিরাপত্তার এই আয়োজন করা হয় তিনটে রুটে, তার মধ্যে কোনটা ধরে প্রেসিডেন্টের মোটর বহর যাবে সেটা শেষ মুহূর্তের আগে কাউকে বলা হবে না। ব্যাপারটা কেবল প্রেসিডেন্ট জানেন, অর্থাৎ গাড়িতে ওঠার পর রুটটা তিনি বাছাই করবেন।

প্যাভোরা থেকে দু'মাইল দূরে বাইশতলা একটা বাণিজ্যিক ভবনের ছাদে ছিল ওরা দু'জন, তেরপলের নীচে। মাথায় লোহার হেলমেট, শার্টের নীচে বুক জোড়া ইস্পাতের বর্ম। দু'জনেই কালো ট্রাউজার আর চকলেট রঙের শার্ট পরে আছে। ওদের চোখগুলো যখন যেমন প্রয়োজন, রঙ বদলায়, সেগুলো ব্যবহারও করা হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। গাড় সবুজ হলে, বহুদূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পায়। নীল হলে অদৃশ্য মারণ-রশ্মি বিকিরণ করে। সাদা হলে প্রচণ্ড তাপ ছড়ায়; তিন সেকেন্ডের মধ্যে ত্রিশগজ দূরে দাঁড়ানো মানুষের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, আর দূরত্ব দশগজ হলে ধাতব পদার্থ গলে যেতে শুরু করবে। তবে এই অস্ত্রটা ব্যবহার করলে এত বেশি এনার্জি ব্যয় হয় যে

নড়াচড়ার শক্তি কমে যায় ওদের।

সঙ্গে কোন প্রচলিত আগ্নেয়াস্ত্র নেই, তবে ধাতব ডান হাত লম্বা করলে ইস্পাতের তৈরি আঙুলের ফাঁপা ডগা থেকে সেভেন এমএম বুলেট বেরোয়। বাঁ হাত থেকে বেরোয় ছোট আকারের শক্তিশালী গ্রেনেড।

প্রেসিডেন্টের মোটর বহর রওনা হয়েছে দেখে তেরপলের তলায় লুকিয়ে রাখা রশির একটা কুণ্ডলী ছাদের কিনারা থেকে নীচে ফেলে দিল ওদের একজন। এই বাইশতলা ভবনের সাত ও তিনতলার ঝুল-বারান্দায় সামরিক বাহিনীর স্নাইপাররা পজিশন নিয়ে আছে। ঝুলে পড়া রশির শেষ প্রান্ত সাততলার ঝুল-বারান্দার মেঝে থেকে আট ফুট উপরে স্থির হলো। ওই রশি বেয়ে তরতর করে নেমে এসে ওদের একজন সরাসরি নিঃসঙ্গ স্নাইপারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। অদ্ভুত ব্যাপার, স্নাইপার ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লেও, হামলাকারী লোকটা এতটুকু ভারসাম্য হারাল না। একটু হেঁচট খাওয়ার ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সংঘর্ষের মুহূর্তেই স্নাইপারের ঘাড়ে বাম কনুই দিয়ে আঘাত করেছে, হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনে বুঝেছে, মারা গেছে লোকটা।

দ্বিতীয় লোকটা পনেরো সেকেন্ড পর সাততলার ঝুল-বারান্দায় পৌঁছাল। বাইশতলার ছাদের কিনারায় লোহার একটা রডের সঙ্গে জড়ানো হয়েছে রশিটা, কৌশল জানা থাকায় বারকয়েক ঝাঁকি দিতেই খুলে এল সেটা, ঝপ করে নেমে এসে স্তূপ হলো তার সামনে।

রশিটা তুলে নিয়ে সাততলা থেকে তিনতলার ঝুল-বারান্দায় নামছে দ্বিতীয় লোকটা। দশ ফুট বাকি থাকতে সে-ও লাফ দিল। নিখুঁত মাপ বা নিশানা, পড়ল সরাসরি নিঃসঙ্গ আরেকজন স্নাইপারের উপর। একই কায়দায় কনুই দিয়ে স্নাইপারের ঘাড়ে আঘাত করা হলো। হাড় ভাঙার আওয়াজ তাকে জানিয়ে দিল,

শয়তানের দ্বীপ

লোকটা মারা গেছে।

প্রেসিডেন্টের মোটর বহরের সামনে-পিছনে রয়েছে দুটো করে চারটে আর্মারড কার; মিলিটারি পুলিশের চারটে করে আটটা হাফ-ট্রাক, পিছনে মেশিন গান ফিট করা; সামনে-পিছনে রয়েছে বারোজন করে চব্বিশজন মোটর সাইকেল রাইডার; এ ছাড়াও আছে দুটো অ্যামবুলেন্স, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী আর সচিবদের বিশটা গাড়ি।

প্রেসিডেন্ট রয়েছেন চারটে বুলেটপ্রুফ মার্সিডিজের যে-কোনও একটায়।

প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা বাইশতলা ভবনের গেট থেকে আর যখন মাত্র একশো গজ দূরে, তিনতলার বুল-বারান্দা থেকে রশি বেয়ে নীচের ফুটপাথে পৌঁছাল ওরা দু'জন। ফুটপাথে পা ফেলার আগেই সাদা হয়ে গেল ওদের চোখ, তাকিয়ে আছে কাছাকাছি আর্মড আর মিলিটারি পুলিশ দু'জনের দিকে।

কোথাও কিছু নেই, চোখের পলকে দু'জনের ইউনিফর্মে আগুন ধরে গেল। বিস্ময়ের ঘোর ভাঙতে এক পলকও লাগল না, হাতের একে-ফোরটি সেভেন রাইফেল ফেলে ফুটপাথে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল তারা।

ওদিকে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে প্রেসিডেন্টের মোটর বহর। দুটো আর্মারড কার আর চারটে হাফ-ট্রাক এগিয়ে গেল। মোটরসাইকেল রাইডাররা পাশ কাটাচ্ছে জ্বলন্ত দুই পুলিশকে, এই সময় ফুটপাথে নেমে এল দুই আততায়ী।

তার আগেই প্রথম বারোজন মোটরসাইকেল রাইডার হিপ হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আততায়ীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে চারটে হাফ-ট্রাক, তা সত্ত্বেও ওগুলোয় ফিট করা মেশিন গানের ব্যারেল ঘুরে গেল ফুটপাথে সদ্য নেমে আসা দুই আততায়ীর দিকে।

আকস্মিক গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে আততায়ীদের উদ্দেশে ছুটে এল কয়েক শো বুলেট।

আততায়ীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সামনে চলে আসা চারটে মার্সিডিজের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে। বুলেটের ধাক্কায় ঝাঁকি খাচ্ছে তাদের শরীর। কিন্তু ওগুলো তাদেরকে ফেলে দিতে পারছে না।

আততায়ী দু'জনের চোখ সাদা হয়ে আছে। মার্সিডিজগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, তবে দূরত্ব দশ গজের চেয়ে বেশি হওয়ায় ইস্পাত গলছে না। প্রথম লোকটা তার ডান হাত লম্বা করে দিল সেদিকে, সেকেন্ডে ষাটটা করে বুলেট বেরুতে শুরু করল।

দ্বিতীয় লোকটা লম্বা করেছে তার বাম হাত, সেটা থেকে প্রতি সেকেন্ডে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা করে হ্যান্ড গ্রেনেড।

প্রথম মার্সিডজে আগুন ধরে গেল। অন্তত তিনটে গ্রেনেড ওটার ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরিত হয়েছে। দ্বিতীয় মার্সিডিজ গতি হারানো প্রথমটার উপর চড়াও হলো; আততায়ীদের দশ গজের মধ্যে চলে আসায় আগুন ধরে গেল দ্বিতীয় আর তৃতীয় মার্সিডজে। শুধু চতুর্থ মার্সিডিজের ড্রাইভার সময় পেল ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ার, দূরত্ব ত্রিশ গজ হওয়ায় আগুন ধরল না। তবে একজোড়া গ্রেনেড উড়িয়ে দিল সেটার ফুয়েল ট্যাংক।

চারটে মার্সিডিজই বিধ্বস্ত হয়েছে। ভিতরে যে বা যারাই থাকুক, নিঃসন্দেহে বলা যায় কেউ তারা বাঁচেনি।

মার্সিডিজগুলোর পিছনের দুটো আর্মারড কার থেকে এবার বাজুকা ব্যবহার করা হলো। টিউব আকৃতির অস্ত্রটা থেকে একজোড়া রকেট ছুটে এসে আততায়ী দু'জনকে উড়িয়ে নিয়ে এল বাইশতলা বিল্ডিংয়ের গেটের পাশে, পাঁচিলের গোড়ায়। দু'জনেরই হেলমেট খসে পড়েছে মাথা থেকে, ভেঙে গেছে শার্টের নীচে পরা ইস্পাতের বর্ম। ফুটপাথে রক্তের ধারা

গড়াচ্ছে। সেই রক্তের রঙ লালই। আততায়ীরা মারা গেছে।

প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বেঁচে গেলেন স্রেফ ভাগ্যবশত। হামলার শিকার এই মোটর বহরটা ছিল আসলে একটা ডাইভারশান। নতুন একটা কৌশল হিসাবে আজই এটা প্রথম কাজে লাগানো হলো— হুবহু আরেকটা মোটর বহর রওনা হবে আধঘণ্টা পর, আশা করা যায় সেটায় থাকবেন তিনি।

সেদিন, ওই সকাল দশটাতেই, লাহোর আর করাচী সহ পাকিস্তানের আরও অন্তত পাঁচটা শহরে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, পথচারী আর বাসযাত্রীদের উপর হামলা হলো। এ ছাড়াও, অন্তত তিনটে রেলস্টেশন আর বিমান বন্দরে স্যাবটাজ করা হলো।

লাহোরের একটা কলেজের গেটের সামনে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ একটা ভেসপা নিয়ে সেখানে হাজির হলো দু'জন পুলিশ। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরকে দেখে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কারণ তাদের হাবভাব কেমন যেন নির্লিপু আর ঠাণ্ড। কেউ একজন জানতে চাইল, আপনারা কি কাউকে খুঁজতে এসেছেন?

‘না, তোমাদেরকে যমের বাড়ি পাঠাতে এসেছি,’ বলে পুলিশ দু'জন যার যার ডান হাত লম্বা করে দিল, তারপর ঘোরাল একদিক থেকে আরেক দিকে। চোখের পলকে নরক হয়ে উঠল জায়গাটা।

দুই হাত থেকে প্রতি মিনিটে বুলেট বেরুচ্ছে একশো বিশটা করে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীরা শিকড় কাটা গাছের মত সটান পড়ে গেল, বেশির ভাগই পড়ার আগে মারা গেছে।

রক্তের স্রোত নদী হয়ে উঠল। যদিকে চোখ যায় শুধু লাশ আর লাশ। ভেসপায় উঠে নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে পুলিশ দু'জন। হাসছে তারা।

করাচীর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে হামলা করল ওদের দলের তিনজন। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির ইউনিফর্ম পরে ভিতরে ঢুকল ওরা, তিনজন তিনটে গেট দিয়ে। রানওয়েতে উঠে এসে তিনজন তিন দিক থেকে এগোল টার্মিনাল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বোয়িং-এর দিকে। সময়সূচি অনুসারে লন্ডনগামী ওই প্লেনে এই মুহূর্তে দুশো বারোজন যাত্রী থাকার কথা।

কাছাকাছি এসে যে যার বাম হাত বোয়িংটার দিকে লম্বা করল ওরা। প্রতি সেকেন্ডে একটা করে গ্রেনেড ছুটল। তিন সেকেন্ডে নয়টা গ্রেনেড। যাত্রীদের পরম সৌভাগ্য বলতে হবে, যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় প্লেনে তখনও তাদেরকে তোলা হয়নি। ককপিটে দাঁড়িয়ে তিনজন ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ করছিল, নয়টা গ্রেনেড আর ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারা। চোখের পলকে প্লেনটা হয়ে উঠল অগ্নিকুণ্ড।

ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম বেজে ওঠায় রানওয়ে ধরে ছুটে এল মিলিটারি পুলিশের ভ্যান, বাজুকা সহ আর্মারড কার, মেশিন গান নিয়ে হাফ-ট্রাক, এক ঝাঁক ফায়ার ব্রিগেড ভেহিকেল আর অ্যামবুলেন্স।

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলায় নির্দয় লোকগুলো পালাতে পারল না। তবে কোণঠাসা হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাদের আচরণে এতটুকু উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন নেই। দুই হাত লম্বা করে একই সঙ্গে বুলেট আর গ্রেনেড ছুঁড়ল তারা। পুলিশের একটা ভ্যান উল্টে পড়ল, আগুন ধরে গেছে সেটায়। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো একটা হাফ-ট্রাক।

দ্বিতীয় ভ্যান থেকে ছুটল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। পায়ে, কোমরে, পেটে বা বুকে লাগছে, তবে ঝাঁকি খাওয়া ছাড়া কোন ক্ষতিই হচ্ছে না তিন হামলাকারীর, অবশেষে সিকিউরিটি চিফের

নির্দেশে তাকেই ছোঁড়া হলো।

তাকেই আঘাতে একজনের খুলি উড়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটার গলায় তৈরি হলো তিন ইঞ্চি চওড়া গর্ত। অপর লোকটার বুক ভেঙে গেল।

গ্রেনের আগুন নিভিয়ে ফেলা হলো দ্রুত। গোটা এলাকা কর্তন করে ঘিরে রাখল মিলিটারি পুলিশ।

কোয়েটা শহরের রেলস্টেশনে হামলা চালাতে এসে বিপদে পড়ল দু'জন নকল পুলিশ। টহলরত সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তাদেরকে।

নিজেদের মধ্যে আলাপ করল তারা। তাদেরকে হামলা চালাতে বলা হয়েছে প্যাসেঞ্জার ভর্তি ট্রেনের উপর। কিন্তু স্টেশনে এখনও ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। এদিকে নিজেদের নিরাপত্তা আর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। কী করা যায়?

তারা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

পিস্তল আর রাইফেল তাক করে থামতে বলা হলো তাদেরকে। কোথেকে এলে তোমরা? পরিচয়-পত্র দেখাও। সঙ্গে অস্ত্র নেই কেন? শহর জুড়ে গ্রেনেড আর বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে, সে ববর রাখো?

একটা প্রশ্নেরও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না তারা। দুই হাত এক করে হাতকড়া পরানো হলো দু'জনকে।

এতক্ষণে, হাতকড়া পরানোর পর, নকল পুলিশ দু'জন উপলব্ধি করল, তাদের অপেক্ষা করার সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল। নিজেদের মধ্যে আবার আলাপ করল তারা।

‘যত দূর মনে পড়ে, আমরা হইলাম গিয়া জাউলা,’ বাংলা, তবে আঞ্চলিক ভাষায় বলল প্রথম জন, ‘ডাক্তার সাবে দইরা নিয়া গিয়া শব্দের মইদ্যো কী সব ঢুকাইলো, কইলো বুদ্ধি আর শক্তি বলে দশগুণ বাড়রো। এক্ষেত্রে মিছা কতা, উল্টা আমাগো বুদ্ধি কইমা গেছে। হেরা যে হাতে কড়া লাগায়া দিল, অহন কী অইব ক?’

‘আমার বুদ্ধি তর খেও কইমা গেছে!’ দ্বিতীয় জনের সরল স্বীকারোক্তি।

‘ডাক্তারে কইছে আশপাশে তার চর থাকব, হেরা হিসাব রাখব কয়টা গুলি করলাম, কয়টা গেরেনেড ছুড়লাম, কয়জন মারা গেল।’

‘আয়, এক কাম করি, গুলি আর গেরেনেড বেবাকটি ফুড়াই! ডাক্তার সাবে জিগাইলে কইতে পারুম, জব্বর ফাইট দিছি।’

‘তুই আসলেই আমার খেইকা বোকা। আমরা এহান খে বাইচা ফিরলে তয়না ডাক্তারে জিগাইব।’

‘তাইলে অহন কী করা?’ দ্বিতীয়জনকে অসহায় দেখাল। ‘ডাক্তার সাবে কইয়া দিছে দরা পড়লে নিজেই মাইরা ফালাইতে হইব। নকল দাতে কররা বারুদ আছে, মাটী খন খসাইলেই ফাটব-সঙ্গে সঙ্গে লাল কুয়াশার মত বাতাসে মিলায়া যামু।’

‘হেইডা ডাক্তারে কেন কইছে বুঝস না? আমরা তো আসলে ওই হালার পুতের হারামিপনার নমুনা। এই নমুনা হালার কাউরে দেখবার দিতে চায় না।’

‘তাইলে উল্টাটাই করি আমরা, কী কস?’

‘হ। মাইনষে আমাগরে খুইলা দেখুক। ডাক্তার হালার শয়তানি হউক না জানাজানি। কেউ কিছু একটা করুক। না করলে টেকনাক আর আকিয়াব অঞ্চলে জাউলা বইলা কেউ আর থাকব না...’

‘ডাক্তার সাবে মানুষ বালা না। হের বিচার হওয়ন চাই। নিষ্ক্রিয় থাকল এই দুজন।’

একই ধরনের হামলা চালানো হলো ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান আর মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া সহ অনেকগুলো শহরে। আশ্চর্যই বলতে হবে, হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে কোনও

দেশের সরকারই পরিষ্কার করে কিছু বলল না। 'দেশের শত্রু' আর 'দুহৃতকারী' বলে দায়সারা গোছের বিবৃতি দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো গোটা ব্যাপারটাকে।

দুই

মায়ানমার। রাখাইন রাজ্যের রাজধানী, সিটুয়ে (আকিয়াব)।

সন্ধ্যা ঠিক ছ'টা বাজার মুহূর্তে মৃদু একটা শব্দ প্রেমি পেই রোডের নীরবতা ভেঙে দিল। বাক ঘুরে ধীর পায়ে হেঁটে এল তিনজন অন্ধ ভিখারি। নির্জন রাস্তা সাবধানে রাস্তা পেরুল তারা, আকিয়াব সিটি ক্লাবের সামনে পার্ক করা প্রাইভেট গাড়িগুলোর দিকে এগোচ্ছে।

অভিজাত এলাকা এটা। আগেই সবাই অফিস সেরে বাড়ি ফিরে গেছে। সন্ধ্যায় কিছু মুখে দিয়ে কেউ ক্লাবে, কেউ সিনেমায়, কেউ বা বউ-বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। এখন এই রাস্তা সুমসাম, নিঝঝুম। বাতাস নেই, দু'পাশের গাছের পাতা নড়ছে না। ঝোপঝাড় ডাকছে ঝিঝি পোকাক, এখানে-ওখানে জমাট বেঁধে আছে জেসমিন ফুলের তীব্র, ভারী গন্ধ। গোটা রাস্তায় বিরাজ করছে যেন শূণ্য মঞ্চের রোমাঞ্চ।

ঠক-ঠক-ঠক।

তিনজন রোহিঙ্গা ওরা। স্থলকায়ী বলা যায়, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে। কংক্রিটের রাস্তায় তিনটে সাদা ছড়ি শুধু আওয়াজ করছে ঠক-ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক।

এক লাইনে হাঁটছে ওরা। প্রথম লোকটার চোখে গাঢ় নীল

কাঁচের চশমা, বাম হাতে ছড়ি আর ডান হাতে ছোট একটা টিনের বাটি নিয়ে সামনে রয়েছে সে। দ্বিতীয় লোকটার ডান হাত প্রথম লোকটার কাঁধে, তৃতীয়জনের ডান হাত দ্বিতীয়জনের কাঁধে রাখা।

দ্বিতীয় আর তৃতীয়জনের চোখ বন্ধ। তিনজনের পরনেই ছেঁড়া ফাটা জোকা আর ময়লা বার্মিজ লুঙ্গি, মাথায় তেল চিটচিটে নোংরা কিস্তি টুপি। কেউ তারা কথা বলছে না, ছড়ির নরম ঠক-ঠক শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আকিয়াবে তিনজন অন্ধ ভিখারি বেমানান বলা যায় না, এই রাজ্যে যেহেতু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। কিন্তু প্রেমি পেই-এর মত অভিজাত এলাকা, যেখানে নাইট ক্লাব, থিয়েটার, ফ্যাশন হাউস আর শপিং মলের ছড়াছড়ি, এখানে ভিক্ষা করতে এসে লোকগুলো একটু যেন অপ্রীতিকর একটা পরিবেশ তৈরি করেছে। তার উপর অন্ধ ওরা, অর্থাৎ বিড়ম্বনাও বটে।

আকিয়াব সিটি ক্লাবের কার্ড রুমে, সেন্ট্রাল টেবিলে বাঁটা তাসগুলো টেনে নিল রোদে পোড়া একটা হাত। তাসগুলোর উপর চোখ বুলিয়েছে কি বুলায়নি, হঠাৎ কিছু ম. ব. পড়ে যাওয়ার হাতটা ঘুরিয়ে কবজিতে বাঁধা ঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল রানা এজেন্সির আকিয়াব শাখার প্রধান সূর্য সারওয়ার।

ছ'টা বাজছে। 'দুঃখিত,' বলে চেয়ার ছাড়ল সূর্য, পাশের টেবিলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা পরিচিত এক লোককে ইস্তিতে নিজের চেয়ারটা দেখাল। 'তুমি খেলতে পারো।'

সেন্ট্রাল টেবিলের একজন পার্টনার, ব্রিগেডিয়ার আউই মাউই, হেসে উঠে বললেন, 'ও, হ্যাঁ, আজ যে রোববার! কার সাধ্য ছ'টার পরে মিস্টার সারওয়ারকে ধরে রাখে!'

'অসম্ভব!' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল আরেক পার্টনার, রিটার্ডার্ড ম্যাজিস্ট্রেট থোনমোনা উথা। 'মিস্টার সারওয়ার রোববারের

অভিসার মিস করলে মিস মনসুরকে বোধহয় বাঁচানোই দায় হয়ে পড়বে!

প্রতি রোববার সন্ধ্যা ছ'টার দিকে এরকম তাড়াহুড়ো করেই রচনার ফ্ল্যাটে যায় সূর্য, তাস খেলার টেবিলে এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সেটাই কারণ।

আসল ব্যাপার হলো, নিরাপদ মনে করে সূর্যের প্রাইভেট সেক্রেটারি রচনা মনসুরের ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে হাই-পাওয়ার্ড ওয়ায়্যারলেস সেটটা। প্রতি রোববার বিকেল সোয়া ছ'টায় ওই সেটের সাহায্যে ঢাকায় সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠায় সূর্য। তবে ছুটির দিন নিভতে দু'জনের এই দেখা হওয়াটার আলাদা একটা তাৎপর্য আছে। সত্যি কথা বলতে কি, পরস্পরকে ভালবাসছে ওরা। যানে, ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আর কী।

চলনে-বলনে ভারি স্মার্ট, দেখে মনে হয় অ্যাথলেট, আকিয়াব সিটি ক্লাবের দরজা খুলে ধাপ তিনটে টপকে ফুটপাথে নেমে এল সূর্য। তাজা সন্ধ্যা, সুগন্ধী বাতাসে শ্বাস নিতে ভাল লাগছে তার, এই মুহূর্তে তেমন কিছু ভাবছে না সে। ও, হ্যাঁ, হাতের কাজটার কথা তো ভাবতে হচ্ছেই।

কাজটা পেয়ে রীতিমত গর্বিত সূর্য। তার কারণও আছে। রানা এজেন্সির এজেন্ট সে, আর এই এজেন্সির ডিরেক্টর হলো মাসুদ রানা। এজেন্সিটা রানার সৃষ্টি হলেও, সংশ্লিষ্ট সবাই জানে এটা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনের সময় দুই প্রতিষ্ঠান পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তবে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আর বিধি মেনে চলার মাধ্যমে। যেমন, এজেন্সির এজেন্টরা একা শুধু রানার কাছ থেকে নির্দেশ পায়। তবে এবার, হুগা তিনেক আগে, এই নিয়মটা ভাঙা হয়েছে। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান স্বয়ং যোগাযোগ করেছেন সূর্যের সঙ্গে। তাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

অদ্ভুত টাইপের জটিল একটা কেস। তবে তাদের তদন্ত ভালই এগোচ্ছে। কপালগুণে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া একটা সূত্র সুফল প্রসব করছে। কিছু উদ্ভট ব্যাপার আলোয় টেনে আনা হয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে চমকে ওঠার মত কিছু বেরিয়ে আসবে বলেই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

সূর্যের মনের একটা অংশ তিন অঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। পিচের রাস্তায় ঠক-ঠক আওয়াজ করে ধীর পায়ে ওর দিকে হেঁটে আসছে। এই মুহূর্তে ওর কাছ থেকে প্রায় বিশ ফুট দূরে তারা। নিজের অজান্তেই সূর্য হিসাব করল, ও যখন নিজের গাড়ির কাছে পৌছাবে তার দুই কি তিন সেকেন্ড আগে ওকে পাশ কাটাতে লোকগুলো। তার মানে খসল দুটো ক্রিয়াত।

খুচরো কয়েনের জন্য পকেটে হাত ভরল সূর্য। একটা কয়েন পাওয়া গেল-দুই ক্রিয়াতের। সেটা বের করল। ইতিমধ্যে ভিখারি তিনজনের সঙ্গে একই সমান্তরাল রেখায় চলে এসেছে ও। হাতটা লম্বা করল সূর্য। টিনের বাটিতে টং করে আওয়াজ করল কয়েনটা।

'শতায়ু হন, মালিক!' সামনের লোকটা বলল।

'শতায়ু হন,' প্রতিধ্বনি তুলল বাকি দু'জন।

মজল কামনা গুনতে ভালই লাগে। সূর্যের হাতে গাড়ির চাবি বেরিয়ে এসেছে। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল সাদা ছড়িগুলো আওয়াজ করছে না। তবে ততক্ষণে দেরি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

সূর্য শেষ লোকটাকে পাশ কাটাতেই তিন অঙ্গ ঘুরে গেছে। পিছনের দু'জন দু'পাশে এক পা করে সরে গেল, নিজেরা যাতে গুলির পথে বাধা না হয়। তিনজনের হাতে তিনটে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, সাইলেন্সার লাগানো থাকায় বেটপ লাগছে দেখতে। সুশৃংখল দক্ষতার সঙ্গে একযোগে যে যার হাতের অঙ্গ তুলল তারা, তাক করল সূর্যের মেরুদণ্ডের তিনটে আলাদা

অংশে-শোভার ব্রেডের মাঝখানে, শিরদাঁড়ার মাঝের ও নীচের প্রান্তে।

তিনটে ভরাট কাশি প্রায় একটার মত শোনা। সামনের দিকে ছিটকে পড়ল সূর্যের শরীর, যেন লাথি মারা হয়েছে। ফুটপাথে স্থির হয়ে পড়ে থাকল ওটা।

সময় এখন ছ'টা পাঁচ মিনিট। রাস্তার সঙ্গে ঘর্ষণে আর্তনাদ করে উঠল চাকাগুলো, বেওয়ারিশ লাশ সংগ্রহকারী সংস্থার একটা মাইক্রোবাস বাক ঘুরে ঢুকে পড়ল প্রেমি পেই রোডে, ছুটে এল পার্কিং লটের দাঁড়িয়ে থাকা ছোট দলটার দিকে। ওটার ছাদের চারকোণে ছোট আকৃতির চারটে কালো পতাকা উড়ছে।

মাইক্রোবাস থামা মাত্র সূর্যের লাশটা ধরাধরি করে তুলে ফেলল ওরা। গাড়ির পিছনে দরজাটা খোলা রয়েছে। খোলা রয়েছে ভিতরে পড়ে থাকা কফিনটাও, সেটা সাধারণ কফিনের চেয়ে বেশ কিছুটা উঁচু। লাশটাকে গাড়িতে তুলে ওই কফিনে শুইয়ে দিল তারা। তারপর কফিনের ঢাকনি আর গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

মাইক্রোবাসের ভিতর তিনটে সিট রয়েছে, সেগুলোয় বসল তারা, শান্ত অলস ভঙ্গিতে যে যার হাতের ছড়ি নিজের পাশে শুইয়ে রাখল। প্রতিটি সিটের পিঠে একটা করে কমলো রঙের ঢোল, কোট ঝুলছে, ওগুলো পরল তারা। এরপর কিস্তি টুপি খুলে সিটের নীচ থেকে পাওয়া বার্মিজ হ্যাট পরল মাথায়।

ড্রাইভার, সে-ও একজন রোহিঙ্গা, নার্সাস ভঙ্গিতে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

‘যাও, মিয়া, যাও!’ খুনিদের লিডার তাগাদা দিল, হেঁটে আসার সময় সবার সামনে ছিল যে লোকটা। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল সে। ছ'টা বেজে সাত মিনিট। কাজটা সারতে দুই কি তিন মিনিট লেগেছে তাদের।

বেওয়ারিশ লাশ সংগ্রহকারী সংস্থার মাইক্রোবাস একটা ইউ

টার্ন নিয়ে চৌরাস্তার দিকে ছুটছে। ওখানে পৌঁছে ডান দিকে বাক নিয়ে স্পিড তুলল ঘন্টায় ত্রিশ মাইল। ঢালু পথ ধরে পাহাড়ের দিকে উঠে যাচ্ছে। চার কোণের চারটে কালো পতাকা শোকের সংকেত দিচ্ছে। গাড়ির ভিতর বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে, নত মস্তকে বসে আছে তিন খুনি, দেখে মনে হচ্ছে আপনজন কেউ মারা যাওয়ায় শোকে কাতর।

ছুটির দিন। সন্ধ্যার ঠিক আগে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে এক কাপ কফি বানিয়ে খেল রচনা মনসুর, তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল সাজগোজ সারতে। আজ রোববার, ঠিক ছ'টা পনেরোয় ঢাকায় রিপোর্ট করতে হবে সূর্যকে। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের কাজ, তারপর পুরোটা সন্ধ্যা খালি পাবে ওরা। কোন দিন নাটক বা ফ্যাশন শো দেখতে যায়, কিংবা ক্লাবে গিয়ে টেবিল টেনিস খেলে, তারপর ডিনার সারে ভাল কোন রেস্টে রাঁয়; মাঝে-মধ্যে স্নেক পরস্পরের হাত ধরে পাশাপাশি বসে টিভি দেখে, তারপর নিজেরাই কিচেনে ঢুকে ডিনার তৈরি করে।

আজ ওরা বাইরে বেরুবে, সাজগোজটা তাই সময় নিয়ে করছে রচনা। একটু যেন আভাস পাওয়া যাচ্ছে, বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলতে পারে সূর্য। ঢাকা থেকে কাল ওর মায়ের টেলিফোন এসেছিল, দরজা বন্ধ করে প্রায় আধঘণ্টা কথা বলেছে ও। তারপর থেকে ওকে খুশি খুশি লাগছে দেখে রচনা কারণ জানতে চেয়েছিল। সূর্য জবাব দিয়েছে, ‘অপেক্ষা করো, সারপ্রাইজ আছে।’

সাজগোজ শেষ করে সিটিং রুমে চলে এল রচনা। সূর্যের জন্য মাইক্রো-ওয়েভ আভনে চিকেন সুপটা গরম করতে দিয়ে টিভি অন করল, তারপর প্যাসেজে বেরিয়ে এসে ফ্ল্যাটের তালাটা খুলে রাখল-সূর্য এলে দরজা খুলতে আসতে হবে না।

সিটিং রুমে ফিরে টিভিটাকে বোবা করে রাখল রচনা। ছোট

রিম্‌টওয়াচে চোখ বুলাল আবার। ছ'টা বেজে দশ, আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছে মিনিটগুলো। উদ্বেগ অস্থিরতা কাটিয়ে দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল রচনা। যে-কোন কারণেই হোক আসতে দেবি হচ্ছে সূর্যের, নিয়ম অনুসারে ঢাকার সঙ্গে রচনাকেই কথা বলতে হবে। আজ অবশ্য রিপোর্টটা রানা এজেন্সির অফিসে নয়, পাঠাতে হবে বিসিআই অফিসে-গত দুই হপ্তা হলো তাই পাঠাচ্ছে ওরা।

কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা পনেরোয় ওয়ায়্যারলেস সেট অন করল রচনা। 'আকিয়ার থেকে আমি রচনা মনসুর বলছি। সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছি...'

রিসিভার থেকে বেরিয়ে আসা শব্দদূষণ কানে বাজছে, তা সত্ত্বেও অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রচনা-ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। তারপর...প্যাসেজে জুতোর আওয়াজ...

'এক মিনিট, প্রিজ, ঢাকা,' অপরপ্রান্তের রেকর্ডিং মেশিনকে বলল রচনা। কান থেকে রিসিভার খুলে টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল সে।

সিটিং রুমের খোলা দরজার সামনে এসে চমকে উঠল রচনা। সূর্য নয়। প্রকাণ্ডদেহী একজন রোহিঙ্গা, গায়ের রঙ সামান্য হলদেটে, নাকটা মোটেও খাড়া নয়। ডান হাতটা পিছন থেকে সামনে আনল সে-একটা পিস্তল ধরে আছে, ওতে সাইলেন্সার ফিট করা।

'কে আপনি?' বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল রচনা।

লোকটার মুখে চওড়া হাসি দেখা দিল। ধীর ভঙ্গিতে, উপভোগ্য আয়েশের সঙ্গে, পিস্তলটা তুলে রচনার বাম স্তনের আশপাশে তিনটে গুলি করল সে।

সোফার এক পাশে কাত হয়ে পড়ল রচনা, অন করা সেটের

মাধ্যমে ঢাকায় রেকর্ড হয়ে গেল শব্দগুলো।

সিটিং রুমের দোরগোড়া থেকে সরে গেল খুনি। একটু পরেই পেট্রল ভর্তি একটা প্রাস্টিক ক্যান আর পাটের একটা বড় বস্তা নিয়ে ফিরে এল সে। ক্যানটা মেঝেতে রেখে সোফায় কাত হয়ে পড়ে থাকা রচনাকে বস্তায় ভরল। সবটুকু ঢুকল না ভিতরে, পা দুটো বেরিয়ে থাকল বাইরে। ওগুলোকে ভাঁজ করে ভিতরে ঢোকাতে হলো। এরপর ভারী বস্তাটা প্যাসেজে রেখে এল সে। ফ্ল্যাটটা সার্চ করে যেখানে যত ফাইল আর কাগজ-পত্র পেল সব সিটিং রুমের মাঝখানে, কার্পেটের উপর জড়ো করল। সোফায়, যেখানে বসে ওয়ায়্যারলেসে কথা বলছিল রচনা, জোট একটা নোটবুক পাওয়া গেল সেখানে। খুনিকে বলে দেওয়া হয়েছে, এই নোটবুকটা অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে। কামরার মাঝখানে তৈরি স্তূপটায় সেটাও রাখল সে। রাখল কমপিউটারটাও।

এরপর জানালা-দরজার পরদা খুলে এনে জড়ো করল ওখানে। সবশেষে একেবারে উপরে দুটো কাঠের চেয়ার রাখল। ক্যানটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে স্তূপের চারদিকে পেট্রল ঢালল সে।

এরকম আরও দুটো স্তূপ তৈরি করা হলো-একটা বেডরুমে, আরেকটা প্যাসেজে। প্যাসেজের স্তূপটাতেই সবশেষে আগুন ধরাল খুনি। প্রতিটি স্তূপে অল্প করেই পেট্রল ঢালা হয়েছে, তবে কাগজ আর শুকনো ফার্নিচার পেয়ে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ল আগুন।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বাইরে তাকাল লোকটা। বাগানের ভিতর দিয়ে লাশ বহনকারী মাইক্রোবাসটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে সে। ঝিঝি পোকার ডাক আর অলস ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কোথাও আর কোন আওয়াজ নেই। রাস্তার দুই মাথা একদম খালি।

ধোঁয়ায় ঢাকা প্যাসেজ ধরে খানিকটা পিছিয়ে এল লোকটা, তারপর ঝুঁকে লাশসহ বস্তাটা দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে শয়তানের দ্বীপ

নিল চওড়া কাঁধে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর দরজাটা বন্ধ করল না, কারণ বাতাসের অভাব ঘটলে আগুনটা নিভেও যেতে পারে।

বাগানের ভিতর দিয়ে দ্রুত হেঁটে রাস্তায় বেরিয়ে এল খুনি। মাইক্রোবাসের পিছনের দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। বস্তাটা সঙ্গী দু'জনের হাতে তুলে দিল সে। ব্যস্ততার সঙ্গে কফিনের ভিতর, সূর্যের লাশের উপর, বস্তাটা ভরল তারা।

গাড়িতে চড়ল খুনি, নিজের সিটে বসল, তারপর মেঝে থেকে তুলে নিয়ে বার্মিজ হ্যাটটা পরল মাথায়।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের জানালায় লাল শিখা নাচানাচি শুরু করেছে। গাড়িটা ছেড়ে দিল ড্রাইভার। বন্দরকে পাশ কাটিয়ে নির্জন একটা সৈকতে চলে এল তারা। এখানে একটা বোট অপেক্ষা করছে।

অস্বাভাবিক উঁচু কফিনটা ধরাধরি করে তোলা হলো বোটে। খোলা সাগরে বেরিয়ে এসে কফিনটার সঙ্গে বাঁধা হলো কিছু ভারী পাথর। তারপর বোট থামিয়ে সেটাকে পঞ্চাশ ফ্যাদম পানির তলায় নামিয়ে দেওয়া হলো। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে রানা এজেন্সির নিবেদিত প্রাপ দু'জন কর্মকর্তা আর তাদের মূল্যবান রিপোর্ট নিশ্চিত করে দেওয়া হলো।

তিন

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকা।

তিন মাস পর বিদেশ থেকে মাত্র গতকাল ফিরেছে মাসুদ

রানা। আজ সকালে অফিসে এসেই শুনল বস ওকে ডেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাততলায় উঠে এসেছে ও, বরাবরের মত আজও দুরূহ দুরূহ করছে বুকটা।

আউটার অফিসে ঢুকে বিসিআই চিফের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরার ডেস্ক লক্ষ্য করে এগোচ্ছে রানা। 'এই পাজি মেয়ে, কিছু জানো নাকি, আমাকে নাকি খুব দরকার বুড়োর?'

কথা না বলে ভুরু জোড়া সামান্য একটু উপরে তুলল সুন্দরী ইলোরা, তারপর চোখ ইশারায় শুধু ইন্টারকমটা দেখিয়ে দিল।

সেদিকে তাকাতে পিলে চমকে উঠল রানার-যন্ত্রটা অন করা রয়েছে। ভিজে বিড়ালের মত বিসিআই-এর কর্পোর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়াল ও। দরজায় নক করতে ভিতর থেকে জলদগদগীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কাম ইন।'

চেম্বারের ভিতর ঢুকে অপরিচিত একটা দৃশ্য দেখতে পেল রানা। রিভলভিং চেয়ারে প্রায় শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে রয়েছেন বস, হাত দুটো মাথার পিছনে এক করা, সিলিন্ডার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন।

দোরগোড়ায় এক মুহূর্ত থেমে ইতস্তত করছে রানা। আবার শোনা গেল হুঙ্কার।

'এসো।' ভারী গলা রাহাত খানের। রিভলভিং চেয়ারটার সিঁথে হয়ে বসলেন তিনি, হাত বাড়িয়ে তামাক ভরছেন পাইপে, তাকিয়ে আছেন প্রিয় এজেন্ট এমআর-নাইনের দিকে। 'বসো।'

সাবধানে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসল রানা।

'আমি একটা ভুল কাজ করে ফেলেছি, রানা।' রানাকে চমকে দিয়ে এভাবে শুরু করলেন রাহাত খান। 'তুমি বিদেশে ছিলে, যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না, তাই তোমার এজেন্সির একটা শাখাকে সরাসরি আমি নিজেই একটা কাজ দিয়েছিলাম।' থেমে হাতের কাজটা শেষ করছেন তিনি।

রানা স্বভাবতই উদ্ভিগ্ন, বুঝতে পারছে সিরিয়াস কিছু ঘটেছে। 'কোন শাখা, সার?'

পাইপটা ধরালেন বিসিআই চিফ, একরাশ নীলচে ধোয়ার ভিতরে ঝাপসা হয়ে এল তাঁর চেহারা। 'মায়ানমারের আকিয়াব শাখা।'

ওখানে সূর্য আছে, দ্রুত স্মরণ করল রানা, শাখা প্রধান হিসাবে; আর আছে রচনা, তার প্রাইভেট সেক্রেটারি...

'আমার দেয়া কাজটা করতে গিয়ে সূর্য আর রচনা, দুজনেই ওরা নিখোঁজ হয়ে গেছে,' রানাকে আরেকবার চমকে দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'এটা তিন হপ্তা আগের কথা, সেই থেকে আমি একটা অপরাধবোধে ভুগছি...'।

'ওহ্, গড!' ফিসফিস করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'কীভাবে...মানে, ঠিক কী ঘটেছিল, সার?'

'হপ্তা ছয়েক আগে অয়েস্টার দ্বীপে পাখিদের কী অবস্থা দেখতে বলেছিলাম সূর্যকে।'

'অয়েস্টার দ্বীপটা, সার...'

'ওটা ভারত মহাসাগরে, মায়ানমারের একটা দ্বীপ, মেইনল্যান্ড থেকে পনেরো-বিশ মাইল দূরে।'

'ওখানে...মানে, পাখিদের ব্যাপারটা কী, সার?'

'এইচআরবি সোসাইটি নামে পাখি-প্রেমিকদের আন্তর্জাতিক একটা সংস্থা আছে, জানো বোধহয়?' জিজ্ঞেস করলেন বস্, জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দুনিয়ার যেখানে যত পাখি অস্তিত্ব হারাতে বসেছে সেগুলোকে বিরল ঘোষণা করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই এই সংস্থার কাজ। আমি ওই সোসাইটির একজন উপদেষ্টা।'

রানার মনে পড়ল, প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরানো একটা সংস্থা, অন্যান্য অনেক দেশের মত কিছুদিন হলো বাংলাদেশেও ওদের একটা শাখা কাজ শুরু করেছে।

সংস্থা হিসেবে অত্যন্ত শক্তিশালী ওরা, অন্তত ইউরোপ আর আমেরিকায় তো বটেই। পাখিদের কিছু বাসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এ-কথা বলে অ্যাটম বোমা পরীক্ষার জায়গা বদলাতে একবার বাধ্য করেছিল ওরা মার্কিন সরকারকে।

বস্ যে অনেক বছর আগে থেকে এইচআরবি সোসাইটির উপদেষ্টা, তা-ও জানে রানা। 'সূর্যকে পাখিদের অবস্থা জানতে বলেছিলেন,' ইতস্তত করেছে রানা, 'ভুলটা কোথায় হলো ঠিক বুঝলাম না, সার। আমাকে বা আমার এজেন্সিকে কোনও নির্দেশ দেওয়া তো আপনার এজিয়ারের মধ্যেই পড়ে।'

'জানুয়ারীর বিশ তারিখে সূর্যকে আমি একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম,' বললেন রাহাত খান। 'মেসেজটা পেয়েছে বলে জানিয়েছিল সে, তবে বিষয়টা নিয়ে কতটুকু কী করতে পারল তা রিপোর্ট করেনি। ওই মেসেজে তাকে আমি পাখিটা সম্পর্কে জানাই...'

ধীরে ধীরে বলে গেলেন বিসিআই চিফ।

পাখির নাম রোজিয়েট স্পুনবিল। লালচে-বেগুনি রঙের ঠোঁট, কাদা থেকে খাবার খুঁটে খায়। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, এই প্রজাতির পাখি অস্তিত্ব হারাতে বসেছিল। নব্বইয়ের দশকে সারা দুনিয়ায় মাত্র কয়েকশো পাখি ছিল, বেশিরভাগই আমেরিকার ফ্লোরিডা আর আশপাশের কয়েকটা দ্বীপে।

তারপর কেউ একজন রিপোর্ট করল মায়ানমারের অয়েস্টার দ্বীপে রোজিয়েট স্পুনবিলের একটা কলোনি আছে।

অয়েস্টার ছিল গোয়ানো আইল্যান্ড। গোয়ানো হলো অন্য একজাতের সামুদ্রিক পাখির বিষ্ঠা, এক সময় সার হিসাবে খুব দামে বিক্রি হত। তবে রাসায়নিক সার বাজারে আসার পর প্রাকৃতিক সার গোয়ানোর দাম কমে যায়। তা ছাড়া, অয়েস্টার দ্বীপের গোয়ানোর মান খুব ভাল না হওয়ায়, খননের যে খরচ তাতে ব্যবসায়ীদের পোষাচ্ছিল না।

অয়েস্টারে যখন বিরল প্রজাতির রোজিয়েট স্পুনবিল পাওয়া গেল, তার বিশ বছর আগে থেকে ওখানে লোকজনের বসবাস ছিল না। এইচআরবি সোসাইটি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওখানে যায়, তারপর মায়ানমার সরকারের কাছ থেকে দ্বীপের একটা প্রান্ত লিজ নিয়ে ওই স্পুনবিলের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তোলে। দু'জন কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় দেখাশোনা করার জন্য, বিভিন্ন দেশের এয়ার লাইসকে রাজি করানো হয় দ্বীপটার উপর দিয়ে প্লেন না চালাতে। এরপর পাখির সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। শেষবার গোণা হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার।

তারপর হঠাৎ করেই প্রাকৃতিক সার গোয়ানোর দাম খুব বেড়ে গেল। ব্যবসা-বুদ্ধি আছে এমন এক লোক প্র্যান করল, অয়েস্টার দ্বীপ কিনে আবার গোয়ানো খুঁড়বে। মায়ানমার সরকারকে পঁচিশ লাখ মার্কিন ডলার সাধল সে। ইয়াদুন রাজি হলো এক শর্তে-রোজিয়েট স্পুনবিলের নিরাপদ আশ্রয়টা নষ্ট করা যাবে না।

এটা দু'হাজার এক সালের কথা। ওই লোক সস্তায় শ্রমিক লাগিয়ে গোয়ানো সংগ্রহের কাজ শুরু করে। গোটা দুনিয়া জুড়ে প্রাকৃতিক সারের চাহিদা আবার বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা ভালই চলছে তার।

'কে এই লোকটা, সার?' মাঝপথে জিজ্ঞেস করল রানা।

'একজন রোহিঙ্গা,' বললেন রাহাত খান। 'ভদ্রলোকের নাম ডক্টর থাকিন গজনবি।'

'তার সম্পর্কে আর কী জানি আমরা?'

আবার শুরু করলেন বসু।

না, প্রচারবিমুখ ছাড়া ডক্টর থাকিন গজনবি সম্পর্কে আর ভেমন কিছু জানা যায়নি। মায়ানমার সরকারের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার পর তাঁকে আর কেউ দেখেছে বলেও মনে হয় না। মেইনল্যান্ড আর দ্বীপটার মধ্যে কোন ধরনের যোগাযোগ বা

আসা-যাওয়াও নেই। দ্বীপটা তার জন্য বৈধি দেয়নি। হিসাবে দেখেন, রাইজেন্স ফল তার খুবই মূল্যবান। পাখি তাঁকে যুগ্মবান গোয়ানো দিয়ে, সবচেয়ে ভাল করে ওগুলোকে কেউ বিক্রি করত। রানাও আগ্রহী হয়ে উঠে।

সব ঠিকঠাক মতই চলছে, হঠাৎ করে 'মায়ানমার সোসাইটি'র একজন কর্মী, লোকটা আস্তে আস্তে দ্বীপ থেকে নিয়ে অয়েস্টার থেকে যেমন প্যাচও পৌঁছান দুই মাসের অত্যন্ত অসুস্থ ছিল সে। সারা শরীর জ্বরের জ্বরে পুড়ে কয়েকদিন পরেই হাসিপাতালে যাবা বাস লোকটা।

মারা যাওয়ার আগে অবিস্ময়, ভৌতিক একটি পদ্য রচিত গেছে ওই জাপানি। তারপর ক্যান্সার নাকি একটি তুলনামূলক চালিয়েছিল, ওটার সুখ থেকে আশ্রমের শিখা যেহেতু সেরা গেছে। ড্রাগনটা তার সহকর্মীকে বুন করেছে, ক্যান্সার জ্বলিয়ে দিয়েছে, তারপর পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়ে দুই মাসের ভ্রম দেখিয়ে খেদিয়ে দিয়েছে ওগুলোকে। ওই আশ্রম পুড়ে শেষ মারা যাচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে একটা ভিত্তি নীচের চুপি করে কোনরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

এইচআরবি সোসাইটির হেড অফিস নিউ ইয়র্ক, অয়েস্টার কী ঘটেছে রিপোর্ট পেয়ে একটা বিচক্ষণকর্মে প্রেরণ করে দু'জন কর্মকর্তাকে পাঠায় তারা তদন্ত করার জন্য। দ্বীপটার ছোট একটা এয়ারফিল্ড আছে। ডক্টর গজনবির নিজস্ব একটা অর্গো প্লেন সাপ্রাই নিয়ে মাসে দু'তিনবার আসা-যাওয়া করে।

কিন্তু এইচআরবি সোসাইটির বিচক্ষণকর্মে ল্যান্ড করার সমন জ্ঞাশ করে ওখানে। পাউলটনও দুই কর্মকর্তাই মারা যান। এ নিয়ে সোসাইটির কর্তব্যাক্ষিরা মহা হতচই শুরু করে দেন। জাপান সাগরে টহলরত মার্কিন ট্রেনিং স্কোয়াড্রনকে অয়েস্টার দ্বীপে একটা করভেট পাঠাতে অনুরোধ করেন তারা।

হালকা অস্ত্রে সজ্জিত এসবটুকু তদন্তশীল করভেটের

ক্যাপটেন উপরমহলের নির্দেশ পেয়ে ডক্টর থাকিন গজনবির সঙ্গে দেখা করার জন্য অয়েস্টার দ্বীপে চলে আসেন। এ থেকেই বোঝা যায় কতটা প্রভাব এইচআরবি সোসাইটির।

পরে করভেটের ক্যাপটেন রিপোর্ট করেন, তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ডক্টর গজনবি, তবে গোয়ানো সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি কাউকে।

এয়ারস্ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, বিধ্বস্ত প্রেনটার অবশিষ্ট পরীক্ষা করেন তিনি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ওটা, তবে সন্দেহজনক কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি। ল্যান্ড করার জন্য আকাশ থেকে খুব দ্রুত নেমে আসাটাই দুর্ঘটনার কারণ বলে মনে হয়েছে তাঁর।

দুই কর্মকর্তা আর পাইলটের লাশ সমতুলে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। সেগুলো দামী কফিনে ভরে, একটা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, হস্তান্তর করা হয়। ডক্টর গজনবির সৌজন্যবোধ আর অমায়িক ব্যবহার মুগ্ধ করেছে ক্যাপটেনকে।

সবশেষে দুই কর্মীর ক্যাম্পটা দেখতে চান ক্যাপটেন। দ্বীপের লোকজন সেখানে তাঁকে নিয়ে যায়। ক্যাম্পের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল দেখার পর ডক্টর গজনবির মতামত জানতে চান তিনি। গজনবি জানান, অত্যধিক গরম আর নিঃসঙ্গতার কারণে ওদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। অন্তত একজন যে পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, তা না হলে কি সঙ্গীকে ভিতরে রেখে ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয় সে?

এই ব্যাখ্যা আর যুক্তি ক্যাপটেনের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছে লোকগুলো কোথায় থাকত দেখার পর। ক্যাম্পটা দুর্গন্ধময় একটা জলার মাঝখানে, সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; বছরের পর বছর ওখানে থাকাত হলে পাগল না হওয়াটাই

অস্বাভাবিক। ওখানে আর কিছু তাঁর দেখার ছিল না, কাজেই অমায়িক হেসে বিদায় নিয়ে ফিরে এসেছেন ক্যাপটেন। তাঁর রিপোর্টের শেষ দিকে উল্লেখ করা হয়েছে, রোজিয়েট স্পুনবিল দেখেছেন তিনি, তবে হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র।

এই রিপোর্ট পাওয়ার পর, বিশেষ করে পাখির সংখ্যা মারাত্মক ভাবে কমে গেছে শুনে, এইচআরবি সোসাইটি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ে। মায়ানমার সরকারকে গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার অনুরোধ করে তারা। কিন্তু ইয়াঙ্গুন জানিয়ে দিয়েছে, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে যখন খুশি ইচ্ছে হলেই নাক গলানো তারা সমর্থন করে না।

এরপর সোসাইটির হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্ক থেকে অনারারি উপদেষ্টা রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করণীয়, পরামর্শ চান কর্মকর্তারা। রাহাত খান তাঁদেরকে বলেন, কতটুকু কী করা যায় দেখেছেন তিনি। তারপর সূর্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

বসের দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হতে রানা জানতে চাইল, 'আমরা জানলাম কীভাবে যে সূর্য আর রচনা নিখোঁজ হয়েছে?'

'কিছু একটা বিপদ যে হয়েছে সেটা আমরা জানতে পারি তিন হপ্তা আগের এক রোববারে, রচনা যখন সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল,' বললেন বিসিআই চিফ। 'তারপর ওখানকার পুলিশ চিফ আর আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারা জানায়, আকিয়াব সিটি ক্লাব থেকে ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় বেরিয়ে যায় সূর্য, তারপর থেকে কেউ আর দেখেনি তাকে।

'একই দিন সন্ধ্যায় রচনার ফ্ল্যাটটা আগুন লেগে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। সময় মত ফায়ার ব্রিগেড এসে না পৌছালে পুরো ছয়তলা বিল্ডিংটাই ধ্বংস হয়ে যেত। পুলিশ বলছে সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যায়নি রচনা, সম্ভবত এক কাপড়ে চলে গেছে। এমনকী ছাই হয়ে যাওয়া তার পাসপোর্টটাও পাওয়া গেছে'

বেডরুমে। ওখানকার পুলিশ প্রশ্ন তুলছে, তারা কিডন্যাপ হলে মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি কেন? খুন হয়ে থাকলে লাশ কই?

‘এই হলো পরিস্থিতি,’ সবশেষে বললেন রাহাত খান। ‘এখন তুমি বলো কী করা দরকার।’

‘এ নিয়ে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না, সার,’ দৃঢ় একটা সুরে বসকে আশ্বস্ত করল রানা। ‘কী করা যায় দেখছি আমি।’

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা একটু শব্দ করেই ছাড়লেন বিসিআই চিফ। ‘থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।’

‘সার, ইয়ে হোয়ে-র সঙ্গে কি যোগাযোগ করা হয়েছে?’ জানতে চাইল রানা। ‘সে কী বলছে?’

ইয়ে হোয়ে আকিয়াব অঞ্চলের অত্যন্ত সফল একজন ট্যুরিস্ট গাইড। তার আরেকটা পরিচয়, মাসুদ রানার সাংঘাতিক ভক্ত সে। মায়ানমারে বেড়াতে এলে তাকে ছাড়া চলে না রানার। লোকটার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সরলতার পরিচয় পেয়ে নিজের এজেন্সির আকিয়াব শাখায় কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল ও।

নিজের পেশা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হোয়ে রানাকে পাল্টা প্রস্তাব দিয়ে বলেছিল, ‘তারচেয়ে আমি যদি, কর্নেল বস, আপনাদের ভ্রাম্যমাণ পাবলিক রিলেশন্স অফিসার হিসেবে কাজ করি, তাতে বরং বেশি উপকারে লাগব। গাইড হিসেবে গোটা দেশ চষে বেড়াই, কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়, কত কথা কানে আসে-সব আপনাদেরকে জানাতে পারব। সেটাই ভাল হয় না?’

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিল রানা। সেই থেকে ইয়ে হোয়ে রানা এজেন্সির কাজ করছে, তবে নিয়মিত অফিস করে না। তাকে এক ধরনের ইনফরমারই বলা যায়; কোথায় কী ঘটছে সব খবরই তার জানা, যথা সময়ে রিপোর্ট করে চলেছে সে।

‘হ্যাঁ, যোগাযোগ করা হয়েছে,’ বললেন রাহাত খান। ‘তবে

ইয়ে হোয়ে সে-সময় ইয়াদুনে ছিল, সে কিছুই জানে না।’

‘ঠিক আছে, কী ব্যাপার ওখানে গিয়ে দেখছি আমি,’ বলল রানা, ‘আপনি আমাকে পনেরো দিনের ছুটি দিন, সার।’

‘অ্যাপ্রিকেশন জমা দাও, ছুটি পেয়ে যাবে,’ বললেন বস। ‘তুমি যে আকিয়াবে যেতে চাইবে, এটা আমরা আগেই ধারণা করেছিলাম, তাই ব্যাপারটা ইয়াদুন সরকারকে জানানো হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ওই রাজ্যের সামরিক প্রশাসক আর পুলিশ চিফের অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে হবে।’

‘জী।’ মাথা ঝাঁকাল রানা, বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

‘আরেকটা কথা,’ বললেন বিসিআই চিফ, হঠাৎ তাঁকে চিন্তিত দেখাল। ‘খেয়াল করেছ, রানা, কিছুদিন আগে হঠাৎ কি শুরু হয়েছিল এশিয়ার অনেকগুলো দেশে?’

‘জী, সার, ওই যে নকল পুলিশ সেজে খুন-খারাবি করা হচ্ছিল। ব্যাপারটা হঠাৎ শুরু হয়, আবার হঠাৎই থেমে যায়।’

‘আর কী জানো তুমি?’

‘বেশিরভাগই মারা যায় তারা, ধরাও পড়ে অনেক। তবে কোন দেশই ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলেনি। দেশে দেশে অদ্ভুত সব গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল...’

‘ওদের অ্যাকটিভিটি কোথায় ছিল আর কোথায় ছিল না, এটা খেয়াল করেনি?’ উত্তরের জন্য না থামলেন না রাহাত খান। ‘ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে আমার। এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশে এই নকল পুলিশের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল, শুধু মায়ানমার আর চীন বাদে।’

শুনে রানার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এখন ওর কাছেও ব্যাপারটা ধরা পড়ছে।

‘দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আমরা কাউকে জীবিত ধরতে পারিনি। মায়ানমারে যখন যাচ্ছি, আমি চাই এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবে তুমি,’ বললেন বিসিআই চিফ। ‘হয়তো

চিন বা মায়ানমারের কোথাও থেকে পাঠান হচ্ছিল ওই নকল পুলিশদের। ঠিক আছে?' দেবাজ খুলে 'টপ সিক্রেট' লেখা একটা ফাইল বের করলেন তিনি। 'ওড লাক, রানা।'

'ধন্যবাদ, সার,' বলে চেয়ার ছেড়ে চেয়ার থেকে বেরিয়ে এল রানা।

চার

চট্টগ্রাম থেকে আকিয়াব মাত্র দুশো মাইল দূরে, একটা চার্টার করা হেলিকপ্টার নিয়ে সন্ধ্যার খানিক পর এয়ারস্ট্রিপ সংলগ্ন হেলিপ্যাডে নামল রানা। এয়ারস্ট্রিপটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকার পর সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে।

কপ্টার থেকে নেমে রানওয়ে পার হলো রানা, কাস্টমস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন শেডে ঢুকে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিল।

আধ ঘণ্টা পর ছোট টার্মিনাল ভবনে ঢোকার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একবার হেলিপ্যাডের দিকে তাকাল রানা। হেলিকপ্টারটা নেই, ফুরেল ভরে নিয়ে এরই মধ্যে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেছে পাইলট।

টার্মিনাল ভবনের ভিতরটা প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। কয়েকজন ফটো-জার্নালিস্টকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল, সম্ভবত ভিআইপি কেউ আসবেন, তাঁর ছবি তোলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রকাণ্ড শরীর, যেন একটা দৈত্য, অথচ চোখে-মুখে শিশুর

সারল্যা; সবাইকে সুখি দেখতে চাওয়ার আশ্চর্য একটা প্রবণতা আছে তার মধ্যে, সেই সঙ্গে দুর্দান্ত সাহসী। দূর থেকে তাকে দেখামাত্র রানার সমস্ত মন জুড়ে ভাল লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ইয়ে হোয়ে একটা বুকস্টলের পাশে স্নান মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রানাকে দেখতে পেয়ে শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে। চিনা বংশোদ্ভূত বার্মিজ সে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; রানার সামনে দাঁড়িয়ে বারকয়েক মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা আর শুভেচ্ছা জানাল। তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সব ভাল তো, কর্নেল বস?' বারণ করলেও শোনে না, রানাকে কর্নেল বস বলে সম্বোধন করবে সে। তার যুক্তি হলো, সেনাবাহিনীর চাকরিটা ছেড়ে না দিলে এতদিনে জেনারেল হয়ে যেত রানা, তাই কমপক্ষে কর্নেল বস না বললে ওকে বঞ্চিত করা হয়।

'সব ভাল,' বলল রানা। 'গাড়ির ব্যবস্থা করেছ?'

'জী, কর্নেল বস,' বলে রানার সুটকেসটা চাইল হোয়ে।

মাথা নেড়ে সেটাকে নিজের হাতেই রাখল রানা।

দরজার দিকে এগোচ্ছে ওরা, ক্লিক করে আওয়াজের সঙ্গে ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট কলসে উঠল। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজের মুখের সামনে একটা হাত তুলেছে রানা আগেই। এক রোহিঙ্গা তরুণী, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো, কৃত্রিম হাসি মুখে ঝুলিয়ে ওদের সামনে চলে এল। 'ধন্যবাদ,' রানাকে বলল সে। 'আমি ডেইলি মর্নিং পোস্টে আছি।' হাতে ধরা কাগজটার চোখ বুলাল একবার। 'মিস্টার প্রণয় শামসুল, তাই না? এ-দেশে আপনি কতদিন থাকছেন, মিস্টার শামসুল, প্লিজ?'

অপ্রতিভ দেখাচ্ছে রানাকে। গুরুটা খুব খারাপ ভাবে হলো। মাথা নাড়ল ও। 'আপনি ভুল করছেন। আমি ভিআইপি নই।'

'আচ্ছা? তাই? আই য়াম সরি, সার। মিস্টার শামসুল, মেয়েটির চোখে-মুখে অবিশ্বাস ভরা কৌতুক, 'কোন হোটেলে

উঠছেন আপনি?

ভাগ্য শালী, মনে মনে গাল দিল রানা। 'শেরাটনে,' বলেই দ্রুত পা চালিয়ে পাশ কাটাল তাকে।

বাইরে বেরিয়ে এসে পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে রানা, হোয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটিকে আগে কখনও টার্মিনাল বিল্ডিং দেখেছ?'

'না, কর্নেল বস। তবে ওই পত্রিকার প্রচুর মেয়ে ফটোগ্রাফার আছে।'

সামান্য হলেও উদ্বেগ বোধ করছে রানা। মিডিয়ার জানার কথা নয় আকিয়াবে আসছে ও, অথচ যেভাবেই হোক জেনেছে। শুধু জানেনি, ওর ফটো সংগ্রহের জন্য ক্যামেরাম্যানও পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি আসলেই কি মর্নিং পোস্টে চাকরি করে?

পার্কিং লটে ঢুকে কালো একটা মার্সিডিজের পাশে থামল হোয়ে। রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুটে গেল নাম্বার প্লেটের দিকে। সূর্যের গাড়ি এটা। এর মানে? 'এটা তুমি কোথায় পেলে, হোয়ে?'

'আকিয়াব সিটি ক্লাবের সামনের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ এটাকে থানায় নিয়ে যায়,' ব্যাখ্যা করল হোয়ে। 'খবর পেয়ে গেলাম আমি। ওরা জানে, রানা এজেন্সির পাবলিক রিলেশন্স অফিসার আমি, তাতেই গাড়িটা দিয়ে দিল। কেন, কর্নেল বস, কাজটা ভাল করিনি?'

'না, ঠিক আছে,' স্মান সুরে বলল রানা। 'চলো।'

প্যাসেঞ্জার সিটে বসল ও। ভুলটা পুরোপুরি ওর। আন্দাজ করা উচিত ছিল সূর্যের গাড়ি সংগ্রহ করতে পারে হোয়ে। এই গাড়ি ব্যবহার করার ফলে যাদের কৌতূহল আর আগ্রহ আছে তারা স্বভাবতই আঙুল তুলবে ওর দিকে, বুঝে নেবে আকিয়াবে কেন এসেছে ও।

দু'সারি ক্যাকটাস-এর মাঝখান দিয়ে সিটুয়ে শহরের দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। সন্ধ্যার পর এখন বাতাস ঠাণ্ডা হতে শুরু

করেছে। ইঞ্জিনের মৃদু শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ঝিঝি পোকাদের একটানা ডাক। মাথার উপর তারকাখচিত কালো আকাশ। হারবার যেন হলুদ আলোর বিন্দু দিয়ে তৈরি নেকলেস, পানির গায়ে বলমল করেছে। ভাল লাগার চমৎকার অনুভূতি জাগছে রানার মনে; কিন্তু তাতে বাদ সাধছে একটা চিন্তা।

বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ওর প্রাণপ্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদ আকিয়াবের পুলিশ চিফ আর রাজ্যের সামরিক প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাচ্ছে শুনে তাকে রানা অনুরোধ করেছিল সম্ভব হলে চেণ্ডুবা দ্বীপে ইয়ে হোয়ের কাছে যেন একটা মেসেজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে সে।

সোহেলের মাধ্যমে তাকে পাঠানো মেসেজে সানফ্রান্সিসকো হোটেলে একটা স্যুইট বুক করতে বলেছিল ও, আর বলেছিল একটা গাড়ি নিয়ে যেন টার্মিনাল ভবনে উপস্থিত থাকে। এই আয়োজনের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে ভুল হয়ে গেছে। উচিত ছিল প্রথমে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ওঠা, পরে হোয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা। সেক্ষেত্রে আগেই জানতে পারত কার গাড়ি ব্যবহার করছে হোয়ে, ফলে ওটার বদলে অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা যেত।

অনেক সময় এ-ধরনের ছোটখাট ভুলেরও বড় ধরনের খেসারত দিতে হয়। অন্তত এ-সব ভুল শত্রুকে প্রথমেই খানিকটা সুবিধে পাইয়ে দেয়।

শত্রুর কথা ভাবতেই নিজের অজান্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। একশো গজ পিছনে নিস্তেজ একজোড়া সাইডলাইট দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ বার্মিজ ড্রাইভার হেডলাইট পুরোপুরি অন করে গাড়ি চালায়। ঘাড় সোজা করে নিল ও। 'হোয়ে। সামনের তেমাথায় একটু কৌশল করো। বাক ঘুরবে, তারপর মোড় নেবে, মোড় নেয়া শেষ হতেই রাস্তার পাশে ঝোপে নেমে থামবে, বন্ধ করে দেবে ইঞ্জিন আর আলো। ঠিক

আছে? এখন স্পিড তোলা যত খুশি।

‘ওকে, কর্নেল বস, ওকে!’ আনন্দে যেন টগবগিয়ে উঠল হোয়ে। সে তার পা গাড়ির ফ্লোরবোর্ডে নামিয়ে দিল। বিরাট গাড়িটা গম্ভীর একটা গর্জন ছেড়ে লাফ দিল, লাগামবিহীন বুনো ঘোড়া যেন।

সরল বিস্তৃতির শেষ মাথায় পৌছাল মার্সিডিজ। ধনুকের মত বাঁকটা ঘোরার সময় পিছলে গেল চাকা, কর্কশ আওয়াজ উঠল, মুহূর্তের জন্য মনে হলো রাস্তার কিনারা থেকে লাফ দিয়ে হারবারে পড়তে যাচ্ছে গাড়ি। আর পাঁচশো গজ এগোলেই তেমাথায় পৌছে যাবে ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। পিছু নেওয়া গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। সামনে তাকাল ও। একটা সাইন পোস্ট দেখা যাচ্ছে। মোড় ঘুরে চাকাগুলো লক করে দিল হোয়ে। স্টিয়ারিং যতটুকু ঘোরাবার আগেই ঘুরিয়েছে। কংক্রিটের সঙ্গে ঘষা খেতে খেতে রাস্তা ছেড়ে নেমে এল মার্সিডিজ। কোপের ভিতর ঢুকে বাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। হেডলাইট সহ অন্যান্য সব আলো আগেই নিভে গেছে।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। একটু পরেই বড় একটা গাড়ির ক্ষিপ্ৰগতি আর গম্ভীর গর্জন অনুভব করল ও। চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে খুঁজছে ওদেরকে। পলকের মধ্যে মার্সিডিজকে পাশ কাটিয়ে আকিয়াবের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। টয়োটা কোম্পানির একটা ট্যাক্সিক্যাব, দেখে নিয়েছে রানা। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।

কথা না বলে দশ মিনিট বসে থাকল ওরা। তারপর হোয়েকে রাস্তায় গাড়ি তুলে আকিয়াবের পথে এগোতে বলল রানা। ‘আমার ধারণা ড্রাইভার আমাদেরকেই খুঁজছে, হোয়ে। টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে খালি ট্যাক্সি নিয়ে ফেরে না কেউ-লোকসান হয়ে যাবে। সতর্ক থাকো। বোকা বানানো

হয়েছে বুঝতে পারলে আমাদের জন্যে কোথাও অপেক্ষা করতে পারে।’

‘ওকে, কর্নেল বস,’ হাসিমুখে বলল হোয়ে। রানা আকিয়াবে আসছে শুনেই ধরে নিয়েছিল সে, সময়টা এরকম উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের মধ্যে কাটবে তাদের।

সিটুয়ে বা আকিয়াব শহরের যানবাহনের স্রোত টেনে নিল ওদের মার্সিডিজকে। বাস, কার, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি, পিঠে ভারী বস্তা নিয়ে গাধা, শূরোর আর ছাগলের পাল-সবই বিরতিহীন একটা মন্তরগতি মিছিলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রানা খেয়াল করল ওদের পিছনে লম্বা লাইনে অনেকগুলো কার রয়েছে, ওগুলোর যে-কোন একটা জাপানি ট্যাক্সিক্যাব হতে পারে।

দ্বীপের প্রধান রাস্তা ধরে মাইল ছয়েক এগোবার পর সানফ্লাওয়ার হোটেলে পৌছাল ওরা। কেয়ারি করা ফুলবাগানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে গাড়িপথ।

ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা হাইওয়ের দিকে তাকাতে কালো ট্যাক্সিক্যাবটাকে আবার দেখতে পেল রানা। বাঁক ঘুরে ফিরে যাচ্ছে হারবারের দিকে।

প্রাচীন চেহারা নিয়ে দালানটা বার্মিজ ঐতিহ্য ধারণ করে আছে, ত্রি স্টার হোটেল হিসাবে বেশ নামও করেছে সানফ্লাওয়ার। পাঁচতলার এক কোণে ওর স্যুইট, ফুল-বারান্দায় দাঁড়ালে পুরো আকিয়াব বন্দর দেখতে পাওয়া যায়।

ঘামে ভেজা কাপড়চোপড় ছেড়ে দরজায় কাঁচ লাগানো শাওয়ারে ঢুকে ঠাণ্ডা পানি ছাড়ল রানা। স্নান সেবে হালকা নীল সুতি শার্টস পরল, খালি গায়ে এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ঠাণ্ডা ভাল লাগছে; সুটকেস খুলে প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস বের করার পর ইন্টারকমের বোতাম টিপে ডেকে পাঠাল রুম সার্ভিসকে।

ডাবল জিন, টনিক আর সবুজ কাগজি লেবুর অর্ডার দিল

রানা। ওগুলো পৌছবার পর লেবুটাকে কেটে দুটুকরো করল ও, নিওফ্যানো রস সহ টুকরো দুটো লম্বা গ্রাসে ফেলল, তারপর আইস ক্রিউব আর টনিক তেলে প্রায় ভরে ফেলল সেটা।

ত্রিষ্ণু নিয়ে কুল-বারান্দার বেরিয়ে এল রানা, একটা আরাম-কেন্দ্রবাস বসে মন-তোলালো দৃশ্যটার উপর চোখ বুলাচ্ছে।

আলসো যা বুঝিয়ে চূপচাপ বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকল রানা, জিন্টুককে সুযোগ দিচ্ছে ওকে শিখিল করে তোলার। আরেকটা ত্রিষ্ণুর অর্ডার দিয়ে শেষ করল সেটাও। হাতঘড়িতে আটটা পনেরো। হোরোকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে আটটা ত্রিশে ডুলে নিতে আসবে ওকে। এক সঙ্গে তিনার খেতে যাবে ওরা। সেটা কোথায় হলে ভাল হয় জিজ্ঞেস করতে এক মুহূর্ত বিব্রত বোধ করার পর হোরে জানিয়েছে, 'ফুড, ত্রিষ্ণু আন্ত মিউজিক, এই তিনটেই যদি ভাল চান আমি সাজেস্ট করব ওয়াটারফ্রন্ট নাইটস্পট জয় সাং-পাং। জয় ইংরেজি হলেও, সাং-পাং চিনা শব্দ, অর্থ-সাম্পান। ওটা আমার বন্ধুর বোক্তারা। একবার বিরাট এক অস্ট্রোপাসের সঙ্গে লড়েছিল বলে লোকে তাকে বাহাদুর বলে ডাকে।'

বেতরুমে ফিরে এসে কাপড় পরল রানা-গাঢ় নীল ট্রপিকাল সুট, সাদা সুতি শার্ট, হাতেবোনা কালো টাই, মাথায় পরল কালো একটা হ্যাট। আয়নার চোখ রেখে ভাল করে দেখে নিল বগলের নীচে অস্ত্রের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে কি না। যাচ্ছে না।

এলিভেটরে না চড়ে সিঁড়ি ভাঙল রানা। লাউঞ্জ হয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি-বারান্দায়, কারটা বেখানে অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

শহরকে গিছনে ফেলে হারবার এলাকায় চলে এল ওরা। কয়েকটা আলো ঝলমলে রেস্তোরাঁ আর নাইটক্লাবকে পাশ কাটাল হোয়ে, ভিতর থেকে উদ্দাম মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে।

রাস্তাটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে হারবারকে গিছনে ফেলল। একটা বস্তিকে পাশ কাটাল গাড়ি। সামনে অভিজাত শপিং মল, তারপরই বহুরঙা নিওন সাইনে লেখা নামটা চোখে পড়ল, 'জয় সাং-পাং'।

পার্কিং এরিয়ার গাড়ি থামাল হোয়ে। তার শিঁখু নিয়ে একটা পেট নিয়ে বাগানে ঢুকল রানা, লনে বেশ কিছু গাছ দাঁড়িয়ে আছে। লনের শেষ মাথায় সৈকত আর সাগর। টেবিলগুলো ফেলা হয়েছে পামগাছের নীচে। সিমেন্টের ডাল ফ্লোরটা লনের ঠিক মাঝখানে। লাল শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরা তিন তরুণ বার্মিজ মিউজিকের সঙ্গে ইংরেজিতে গাইছে: 'যদি তার চোখে উল্লাস দেখতে চাও, নির্জন কোন ধীপে নিয়ে যাও তাকে।'

টেবিলগুলোর মাত্র অর্ধেক ভরেছে। ঝঞ্ঝরতা বেশির ভাগই লুপি পরা বার্মিজ, কিছু চিনাও আছে, আর আছে অল্প কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্ট। পাগড়ি পরা দু'জন শিখ আর গাড়ি পরিহিতা দু'জন শ্রীলঙ্কান তরুণীকে দেখা যাচ্ছে।

প্রকাণ্ডদেহী একজন বার্মিজ-চিনা, পরনে সাদা তিনার জ্যাকেট, একটা টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'হাই, মিস্টার হোয়ে ইয়ে,' ঠাট্টাচ্ছিলে নামটা উল্টো করে বলল সে। 'বহুদিন হয়ে গেল দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। দু'জনের জন্যে ভাল একটা টেবিল চাই তো?'

'ঠিক ধরেছ, বাহাদুর আঙু-পাঙু। কান ফাটানো বাদ্যের চেয়ে হেঁসেলের কাছাকাছি হলে ভাল হয়।'

'কোন ব্যাপার না,' বলে হাসল বাহাদুর, পথ দেখিয়ে সাগরের দিকে নিয়ে এল ওদেরকে, একটা নির্জন পাম গাছের তলায় ফেলা টেবিলে বসাল। 'অর্ডার করুন, সার,' রানাকে বলল সে, 'কী দিয়ে গলা ভেজাতে চান।'

জিন, টনিক আর লেবু চাইল রানা; হোয়ে নিল বিয়ার। মেনুতে চোখ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত নিল ওরা, ব্রয়েলড লবস্টার আর শয়তানের ধীপ

স্থানীয় ভেজিটেবলের সঙ্গে স্টেক খাবে।

ড্রিঙ্ক পৌছাল। গ্রাসের গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম গড়াচ্ছে। কয়েক গজ দূরে সমতল বালিতে আছড়ে পড়ছে সাগর। ডাস ফ্লোরে নরম সুরে নতুন একটা গান ধরেছে গায়ক। রাতের বাতাস লাগায় ওদের মাথার উপর পাম গাছের শাখাগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে মৃদু। বাগানের কোথাও থেকে একটা রাত জাগা পাখি ডেকে উঠল। 'ধন্যবাদ, হোয়ে,' বলল রানা। 'জায়গাটা খুব ভাল লাগছে আমার।'

হোয়ে খুশি। 'আঙু-পাঙু আমার ভাল বন্ধু। আকিয়াবের কোথায় কী ঘটছে আপনি তার কাছে সব খবর পাবেন। ও-ও চেভুবা দ্বীপের মানুষ। এক সময় আমাদের দু'জনের একটা বোট ছিল। তারপর একদিন একাই অয়েস্টার দ্বীপে গেল গলন্দা চিংড়ি আনতে। বেশি চিংড়ির লোভে একটা পাথরের দিকে সাতরাচ্ছিল, মস্ত এক অষ্টোপাস ধরে বসল তাকে।'

'সর্বনাশ!'

'এদিকের পানিতে অষ্টোপাসগুলো ছোটই, কিন্তু অয়েস্টারের ওদিকে বিরাট দানব একেকটা। জন্তুটার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয় আঙু-পাঙুকে। একটা ফুসফুস মারাত্মকভাবে জখম হয় তার। ছুরি দিয়ে কয়েকটা গুঁড় কেটে কোন রকমে ছাড়াতে পারে নিজেকে।'

'তারপর?'

'ঘটনাটা সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দেয় তাকে,' বলল হোয়ে। 'সে তার বোটের অর্ধেক অংশ আমার কাছে বিক্রি করে দিয়ে আকিয়াবে চলে আসে। এটা দশ-বারো বছর আগের ঘটনা। এখন সে বিরাট ধনী মানুষ।'

'অয়েস্টার দ্বীপ,' বলল রানা। 'কী ধরনের জায়গা ওটা?'

রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল হোয়ে। 'ওটা এখন একটা অভিশপ্ত জায়গা, কর্নেল বস,' গম্ভীর সুরে বলল সে।

'বছর কয়েক আগে এক রোহিঙ্গা ভদ্রলোক কিনেছেন দ্বীপটা। লোকজন নিয়ে গিয়ে পাখির বিষ্ঠা খোঁড়েন। দ্বীপে কাউকে উঠতে দেন না, কাউকে ফিরে আসতেও দেন না। দ্বীপটাকে সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে।'

'সেটা কেন?'

'তার অনেক গার্ড আছে। আছে অস্ত্র-মেশিন গান। আর রাডার। আমার জানা শোনা বেশ কয়েকজন লোক ওখানে যাবার পর আর ফিরে আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, কর্নেল বস, দ্বীপটাকে আমিও খুব ভয় পাই।'

রানা চিন্তিত। 'হুম। আচ্ছা।'

ডিনার এল। আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্কের অর্ডার দিয়ে খাওয়া শুরু করল ওরা। সূর্য আর রচনার কেসটা সংক্ষেপে হোয়েকে বুঝিয়ে দিল রানা। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনল হোয়ে, মাঝেমাঝে দু'একটা প্রশ্ন করল। অয়েস্টার দ্বীপের পাখি আর জ্বাশ করা প্লেন, এই দুটো বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল তার।

খাওয়া শেষ হতে পেটটা ঠেলে দিল হোয়ে। পেপার ন্যাপকিনে হাত মুছে সামনের দিকে ঝুঁকল। 'পাখি হোক, ফড়িং হোক বা মৌমাছি হোক, আমার কোন আগ্রহ নেই, কর্নেল বস,' চাপা গলায় বলল সে। 'ভুলেও কারও ওই দ্বীপে যাওয়া উচিত নয়। গেলেই কন্ম সাবাড়!'

'কেন? এ-কথা বলছ কেন?'

'ওই রোহিঙ্গা ভদ্রলোক নিজের প্রাইভেসি ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। তিনি চান তাঁকে যেন একা থাকতে দেয়া হয়। ওই দ্বীপে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু তাঁর গার্ডদের হাতে মারা গেছে। আরও অনেক লোক মারা গেছে। যে তাঁর ব্যাপারে নাক গলাবে তাকেই মরতে হবে।'

'কেন?'

'কেন? তা বলতে পারব না, কর্নেল বস। এ দুনিয়ার মানুষ

একেকজন একেকটা জিনিস চায়। আর কেউ কেউ যত চায় তত পায়।

চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল, দ্রুত সেদিকে তাকাল রানা। স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা টার্মিনাল ভবনের সেই রোহিঙ্গা মেয়েটি কাছাকাছি ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতের দামী ডিজিটাল ক্যামেরাটা উঠে আসছে চোখের সামনে। দক্ষ পেশাদারি ভঙ্গিতে বারকয়েক শাটার টানল মেয়েটি। প্রতিবার মুখের সামনে হাত তুলে ফটো তোলায় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল রানা। মাথায় স্কার্ফ থাকলেও, চিলেঢালা সারং-এর বদলে এখন তার পরনে আঁটসাঁট জিনসের প্যান্ট আর লম্বা আস্তিন সহ ব্লাউজ।

‘ওই মেয়েটাকে আটকাও,’ দ্রুত বলল রানা।

লম্বা দুই পদক্ষেপে তার কাছে পৌঁছে গেল হোয়ে। নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। ‘ইভিনিং, মিস,’ নরম সুরে বলল।

মৃদু হাসল মেয়েটি। স্ট্র্যাপটা গলায় পরে ক্যামেরাটা খুলিয়ে নিল সে, তারপর হোয়ের বাড়ানো হাতটা ধরল। দক্ষ একজন ব্যালে নর্তকের মত তাকে পুরো এক পাক ঘোরাল হোয়ে। এই মুহূর্তে মেয়েটির পিঠে রয়েছে তার একটা হাত, অপর হাতের ভাঁজে আটকা পড়েছে মেয়েটি।

চোখ গরম করে তার দিকে তাকাল ক্যামেরা গার্ল। ‘এ কী! আপনি আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন!’

পানপাতা আকৃতির মুখে বসানো চকচকে কালো চোখ দুটোর দিকে তাকাল হোয়ে। ‘কর্নেল বস্ খুশি হবেন আপনি যদি আমাদের সঙ্গে বসে একটু গলা ভেজান,’ সহাস্যে বলল সে। নিজেদের টেবিলে ফিরে এল, সঙ্গে করে মেয়েটিকেও নিয়ে এসেছে। পা দিয়ে বাধিয়ে একটা চেয়ার টেনে আনল, নিজের পাশে বসাল তাকে, তার পিছনে কবজিটা চেপে ধরেছে। দু’জনেই শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে, যেন ঝগড়াটে

প্রেমিক-প্রেমিকা।

সুশ্রী, রাগে লাল চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। ‘ভূত ইভিনিং। এখানে কী করছ তুমি? আমার ছবি তোলায় কী দরকার পড়ল?’

‘এদিকে ডিউটি পড়েছে আমার,’ ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল মেয়েটি। ‘আপনার প্রথম ফটোটা কোন কারণে ওঠেনি। আমাকে ছেড়ে দিতে বলুন এই লোককে।’

‘তুমি কি সত্যি মর্নিং পোস্টে কাজ করো?’ জানতে চাইল রানা। ‘নাম কী তোমার?’

‘বলব না।’

হোয়ের দিকে ফিরে একটা ভুরু উচু করল রানা।

হোয়ের চোখ সরু হয়ে গেল। মেয়েটির শিরদাঁড়ার কাছে তার হাত ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। বাইন মাছের মত মোচড় খাচ্ছে মেয়েটি, নীচের ঠোঁটে গঁথে যাচ্ছে উপর সারির দাঁত। হাতটা আরও জোরে ঘোরাচ্ছে হোয়ে।

হঠাৎ মেয়েটি বলল, ‘উহ!’ হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। ‘বলব!’ বাঁধন-কষণে একটু ঢিল দিল হোয়ে। চোখে আগুন নিয়ে রানার দিকে তাকাল মেয়েটি। ‘তামান্না...তামান্না রিরিন ডলি।’

হোয়েকে বলল রানা, ‘বাহাদুরকে ডাকো।’

খালি হাত দিয়ে একটা ফর্ক তুলে নিল হোয়ে, সেটা একটা গ্লাসে বারকয়েক ঠুকল। প্রকাণ্ডেহী রেস্টোরাঁ মালিক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল।

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রানা। ‘এই মেয়েকে আগে কখনও দেখেছেন আপনি?’

‘ইয়েস, সার। মাঝামাঝি আসে এখানে। কোন রকম বেয়াদবি করেছে? চান ভাগিয়ে দিই?’

‘না। ওকে আমাদের ভাল লাগছে। তবে যেহেতু ফটো তুলতে চাইছে, জানা দরকার সত্যি প্রফেশনাল কিনা। মর্নিং

পোস্টে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন, তামান্না রিরিন ডলি নামে তাদের কোনও ফটোগ্রাফার আছে কি না।

‘ইয়েস, সার।’ আঙু-পাঙু দ্রুত অদৃশ্য হলো।

মেয়েটির উদ্দেশ্যে মৃদু হাসল রানা। ‘উদ্ধার পাবার জন্যে ওই লোককে তুমি ধরলে না কেন?’

তার দৃষ্টি দেখে মনে হলো রানাকে ভস্ম করে দিতে চায় সে।

‘চাপ প্রয়োগ করতে হওয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত,’ বলল রানা। ‘তবে ঢাকায় আমার এক্সপোর্ট ম্যানেজার বলেছে, আকিয়াবে দু’নম্বরী মানুষ গিজগিজ করছে। আমি নিশ্চিত তাদের দলে তুমি পড়ো না, তবে এটারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না আমার ছবি তুলতে এত কেন আগ্রহ তোমার। কারণটা বলবে?’

‘যা বলার আগেই বলেছি,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানাল রিরিন ডলি। ‘এটা আমার পেশা।’

আরও কিছু প্রশ্ন করল রানা। একটারও জবাব দিল না মেয়েটি।

বাহাদুর আঙু-পাঙু ফিরে এল। ‘কথাটা সত্যি, বস। তামান্না রিরিন ডলি ওদের ফ্রিল্যান্স মেয়েদের একজন। বলল, খুব ভাল ছবি তোলে।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা।

বাহাদুর ফিরে গেল।

মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। ‘ফ্রিল্যান্স,’ নরম করে বলল ও। ‘অর্থাৎ এখনও পরিষ্কার হলো না আমার ফটো ঠিক কার দরকার।’ ওর চোখ-মুখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ‘এবার স্বীকার যাও!’

‘না!’ মেয়েটির গলায় জিদ।

‘ঠিক আছে, হোয়ে, শুরু করো।’ নিজের চেয়ারে হেলান দিল রানা। ওর ইস্টিঙ্কট বলছে, প্রশ্নটার গুরুত্ব ছোট করে দেখার উপায় নেই। উত্তরটা আদায় করা সম্ভব হলে কয়েক

হুগার ফিল্ডওঅর্ক থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

হোয়ের ডান কাঁধ নীচের দিকে ডেবে যেতে শুরু করেছে। চাপের ব্যথা কমাবার জন্য তার দিকে নুয়ে পড়তে চাইল ডলি, কিন্তু খালি হাতটা দিয়ে তাকে দূরে ঠেলে রাখল হোয়ে। ক্রমশ টকটকে লাল হয়ে উঠছে মেয়েটির চেহারা, একটু একটু কাঁপছে। হঠাৎ থোক করে হোয়ের চোখে থুথু ছুঁড়ল সে। নিঃশব্দে হেসে আরও জোরে মোচড় দিল হোয়ে। টেবিলের তলায় এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়ছে ডলি। বার্মিজ ভাষায় হিসহিস করে উঠল সে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

‘বলো ফেলো,’ নরম সুরে অনুরোধ করল রানা। ‘বললেই তোমাকে ছেড়ে দেবে ও, তোমাকে আমরা বন্ধু বলে মেনে নেব।’ মনে মনে উদ্বিগ্ন ও। মেয়েটির হাত নিশ্চয়ই ভেঙে যাওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে।

‘ইউ ...!’ অশ্রাব্য একটা গাল দিল মেয়েটি, তারপর হঠাৎ বাঁ হাত দিয়ে হোয়ের মুখে আঘাত করল। দেখতে পেলো সেটাকে ঠেকাবার সময় পেল না রানা। কী যেন একটা ঝনাৎ করে উঠল, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ একটা আতর্জিৎকার বেরিয়ে এল হোয়ের গলা থেকে। ছোঁ দিয়ে ডলির হাতটা টেনে নিল রানা। হোয়ের গাল থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। চাবির গোছা দিয়ে হোয়ের মুখে মেরেছে ডলি। ভাগ্যক্রমে চোখের নাগাল পায়নি সে, পেলো অন্ধ হয়ে যেত হোয়ে।

হোয়ের খালি হাতটা গালে উঠে গেল। আঙুলগুলো চোখের সামনে এনে রক্ত দেখল সে।

খেপে ওঠা তো দূরের কথা, হাসল হোয়ে, রানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এই বেটি মুখ খুলবে না, কর্নেল বস। আপনি অনুমতি দিলে হাতটা ভেঙে দিই।’

‘ওড গড, নো!’ মেয়েটির হাত ছেড়ে দিল রানা। ‘ছাড়ো ওকে, চলে যেতে দাও।’ নিজের উপর অসন্তুষ্ট ও, মেয়েটিকে

বাখা দিয়েও কথা বলাতে সফল হলো না। তবে একটা জিনিস শিখেছে। যার পক্ষেই কাজ করুক তামান্না রিগিন ডলি, নিজের লোকদের ইম্পাতের চেইন দিয়ে বেঁধে রেখেছে সে।

ডলির হাতটা সামনে এনে কবজিটা ছেড়ে দিল হোয়ে। ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল মেয়েটি, ব্যথায় এখনও কঁচকে আছে মুখ, হাতটা ডলছে। তারপর লেদার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে-মুখে নগ্ন হিংস্রতা। 'তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, ইউ বাস্টার্ড!' তারপর ঝট করে ঘুরে গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটল।

'ধরব নাকি, কর্নেল বস?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল হোয়ে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

পাঁচ

'তিনি তোমাকে ছাড়বেন না...তিনি তোমাকে ছাড়বেন না, ইউ বাস্টার্ড!'

পরদিন বুল-বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট সারার সময় কথাগুলো রানার মাথার ভিতর অনুরণন তুলল। এখন প্রায় নিশ্চিত রানা, সূর্য আর রচনাকে খুন করা হয়েছে। তদন্ত করতে গিয়ে কারও গোপন কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই জেনে ফেলেছিল তারা।

ডিনার সেরে কাল রাতেই সূর্যের ফ্ল্যাট আর এজেন্সির শাখা অফিসে গিয়েছিল রানা, কিন্তু সার্চ করে তাৎপর্যপূর্ণ কিছুই খুঁজে পায়নি-না অফিসে, না ফ্ল্যাটে। তার মানে যদি ধরে নেওয়া হয়

যে গুরুত্বপূর্ণ কোন ফাইলের অস্তিত্ব ছিল, সেটা থাকার কথা রচনার ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটা পুড়ে যাওয়ায় কিছুই রক্ষা পায়নি।

সম্ভবত আকিয়াবের পুলিশ চিফ কোইচি মো বা সামরিক প্রশাসক চাও পারায়া-র অফিস থেকে লিক হয়েছে খবরটা-সূর্য আর রচনার কেসটা তদন্ত করতে বাংলাদেশ থেকে মাসুদ রানাকে পাঠানো হচ্ছে। জানা কথা, শত্রু এখন রানার উপর কড়া নজর রাখবে। সূর্য যে সূত্র ধরে এগোচ্ছিল, সেই একই সূত্র ধরে এগোতে দেখলে রানাকেও সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে সে। একা শুধু ওকে নয়, ইয়ে হোয়েকেও বোধহয় ছাড়বে না।

প্রশ্ন হলো, কে এই শত্রু?

প্রাণী মাত্র একজনকেই পাওয়া যাচ্ছে। ডক্টর থাকিন গজনবি। একজন রোহিঙ্গা, বার্মিজ-মুসলমান; নকসুই বড়রের লিজ নেওয়ার সূত্রে অয়েস্টার দ্বীপের মালিক; গোয়ানো বিক্রি করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে।

কিন্তু এ-সবের সঙ্গে অস্ত্রখাতক নকল পুলিশের আদৌ কি কোন সম্পর্ক আছে?

ঢাকা ত্যাগ করার আগে এই লোক সম্পর্কে ইন্টারপোল সহ আন্তর্জাতিক কয়েকটা সংস্থায় খোজ-খবর নিয়েছে রানা। কোথাও তার সম্পর্কে কোন তথ্য বা রেকর্ড নেই।

তবে কাল রাতে জানা গেল ইয়ে হোয়ে ডক্টর গজনবি আর তাঁর দ্বীপ অয়েস্টারকে ভয় পায়। এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে রানার। কারণ চেঙ্গুবা দ্বীপের লোকেরা, বিশেষ করে ইয়ে হোয়ে, সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নয়।

ডক্টর গজনবি প্রাইভেসি রাখার জন্য এতটা উন্মাদ কেন? তার গোয়ানো দ্বীপ থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাওয়ার পিছনে আসল কারণটা কী?

গোয়ানো জিনিসটা কী? পাখির বিষ্ঠা। কার দরকার ওই জিনিস? কতটা দামী?

আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক চাও পারায়া-র সঙ্গে দশটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওর, এ-দেশের নিয়ম অনুসারে কী বিষয় নিয়ে তদন্ত করতে চায় রানা সেটা তাকে জানাতে হবে। তাকেই ধরবে রানা, গোয়ানো আর অয়েস্টার দ্বীপ সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে। বহু বছর আগে ব্রিটিশ রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে একসঙ্গে একটা কোর্স কমপ্লিট করেছিল ওরা, এখন দেখার বিষয় রানাকে আজও চাও পারায়া-র মনে আছে কি না।

দরজায় দুবার নক হলো। চেয়ার ছেড়ে তালাটা খুলে দিল রানা।

হোয়ে। বাঁ গালে স্টিকিং প্লাস্টার দেখা যাচ্ছে। 'মর্নিং, কর্নেল বস্। আপনি বলেছিলেন সাড়ে-আটটায়।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঢুকে পড়ো। আজকের দিনটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে আমার। আগে ব্রেকফাস্ট সারো।'

'সেরেই এসেছি, কর্নেল বস্।'

ঝুল-বারান্দায় বসল ওরা।

'সামরিক প্রশাসকের অফিস থেকে আমাকে একবার হয়তো আকিয়াব ইন্সটিটিউটে যেতে হতে পারে,' হোয়েকে জানাল রানা। 'কাল সকালের আগে তোমাকে আমার দরকার হবে না, তবে কয়েকটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে তোমাকেও।'

'হুকুম করুন, কর্নেল বস্।'

'প্রথম কাজ, গাড়িটা বদলাতে হবে। পাশের কোন শহরে গিয়ে রেন্ট-আ-কার থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করো। সেলুন। এক মাসের জন্যে।'

'ওকে, কর্নেল বস্।'

'তারপর সৈকতে ঘুরে বেড়ানো বেকার দু'জন তরুণকে বাছাই করবে, দেখতে হওয়া চাই যতটা সম্ভব আমার আর তোমার মত, অন্তত আকার-আকৃতি যেন মেলে। আমাদের মত

কাপড়-চোপড় কিনে দেবে তাদেরকে। একজনের মাথায় কালো হ্যাটও থাকবে। ওদেরকে বলবে কাল সকালে মোয়ে-মায়ে শহরে সূর্যের মার্সিডিজটা পৌঁছে দিতে হবে। উ থান্ট রোডে, আপাই-এর গ্যারেজে পৌঁছে দিলেই চলবে।' ওই গ্যারেজটা রানা এর্জেন্সির আকিয়াব শাখার একজন ইনফরমারের। 'আপাইকে ফোন করে বলে দাও গাড়িটা যেন রিসিভ করে সে।'

দাঁত বের করে হাসল হোয়ে। 'আপনি কাউকে বোকা বানাতে চান, কর্নেল বস্?'

'ঠিক ধরেছ। প্রত্যেকে পাঁচ হাজার কিয়েত করে পাবে তারা। বলবে আমি এক ধনী ব্যবসায়ী, একটু পাগলাটে-আমি চাই দু'জন বেকার মানুষকে একটা কাজের বিনিময়ে কিছু পয়সা পাইয়ে দিতে। ওরা শুধু আমাদের মার্সিডিজটা মোয়ে-মায়ে শহরে আপাই-এর গ্যারেজে পৌঁছে দেবে।'

'বুঝলাম, আপনি চাইছেন, যারাই আমাদের ওপর চোখ রাখছে, তারা মনে করুক আমরা এ-শহর ছেড়ে চলে গেছি। কিন্তু অচেনা লোক খুঁজে বের করার চেয়ে আমার পরিচিত কাউকে দিয়ে কাজটা করালে ভাল হয় না, কর্নেল বস্?'

'খুবই ভাল হয়,' রাজি হলো রানা। 'কাল সকাল ছ'টায় এখান থেকে রওনা হবে তারা। নতুন গাড়ি নিয়ে তুমিও চলে আসবে এখানে।'

'ওকে, কর্নেল বস্।'

'আরেকটা কাজ করবে। পানসি বে-র কাছাকাছি, পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট অনেক কটেজ আছে, ওগুলোর একটা ভাড়া করবে। ওদিকে আগেও আমি থেকেছি, মনে আছে তোমার?' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পাঁচশো কিয়েতের বিশটা নোট ধরিয়ে দিল রানা হোয়ের হাতে। 'প্রয়োজন মনে করলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। তুমি জানো কোথায় থাকব আমি।'

'আর কিছু, কর্নেল বস্?'

‘না। তবে সাবধান, কেউ যেন তোমার পিছু না নেয়। গাড়িটা খানিক দূরে কোথাও রেখে হেঁটে আসবে এখানে। সকাল সোয়া ছটায় কটেজে উঠব আমরা-আপাতত ওটাই আমাদের ঘাঁটি হবে।’

‘ওকে, কর্নেল বস।’ বিদায় নিয়ে চলে গেল হোয়ে।

আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক কর্নেল চাও পারায়াকে সারপ্রাইজ দেওয়া সম্ভব হলো না। দেখা গেল সে-ই বরং রানাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এমন সারপ্রাইজ, পত্রপাঠ বিদায়ের সঙ্গেই শুধু যার তুলনা চলতে পারে।

সামরিক প্রশাসকের চেম্বারের বাইরে, একটা আউটার অফিস রুমে বসানো হলো রানাকে। ওর হাতের এনভেলাপটা একজন করণিক চেয়ে নিল। খানিক পরেই কর্নেল চাও পারায়ার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল তার এডিসি, হাতে রানার এনভেলাপটা। তার চোখ-মুখের থমথমে অবস্থা দেখে মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা।

‘মিস্টার মাসুদ রানা?’ নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল এডিসি।

‘ইয়েস।’

আউটার অফিসে আরও লোকজন অপেক্ষা করছে, এডিসির ইঙ্গিতে আরদালিরা তাদেরকে বের করে নিয়ে গেল। এখন শুধু দরজার বাইরে সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র গার্ডরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

‘মিস্টার রানা,’ কামরা খালি হয়ে যেতে গম্ভীর সুরে বলল এডিসি, এনভেলাপটা ফিরিয়ে দিল ওকে। ‘কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে জানাচ্ছি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আপনার ভিসা বাতিল করা হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে বারো ঘণ্টার মধ্যে মায়ানমার ত্যাগ করতে হবে আপনাকে।’

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ‘হোয়াট!’

‘বারো ঘণ্টার মধ্যে মায়ানমার ত্যাগ করতে বার্ষ হলো,’ রোবটের মত একঘেয়ে সুরে বলে চলেছে এডিসি, ‘দেশরক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারায় অ্যারেস্ট করা হবে আপনাকে। মাত্র তিনদিনের মধ্যে মিলিটারি ট্রাইবুনালে আপনার বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। ধারাগুলোর প্রতিটিতে শাস্তি হিসাবে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা বলা আছে।’

ঘামতে শুরু করেছে রানা। অকস্মাৎ যেন অদৃশ্য একটা পাঁচিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ও। ‘কিন্তু কেন? হোয়াই? এরকম কঠোর একটা নির্দেশ জারি করা হচ্ছে কী কারণে? আমার অপরাধটা কোথায়?’

‘প্রিজ, মিস্টার রানা, চেনাবেন না,’ সতর্ক করে দেওয়ার সুরে বলল এডিসি। ‘আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না, সে অধিকার আমাকে দেয়া হয়নি। আমি শুধু আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক কর্নেল চাও পারায়ার সিদ্ধান্ত আপনাকে জানালাম।’

শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। ‘ঠিক আছে,’ শান্তভাবে বলল ও। ‘কর্নেল পারায়াকে বলুন তাঁর সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।’

মাথা নাড়ল এডিসি। ‘তা সম্ভব নয়, মিস্টার রানা। এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইল দেখছেন তিনি।’

‘রাখুন আপনার গুরুত্বপূর্ণ ফাইল!’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা। ‘আমার দেশের দু’জন মানুষকে মায়ানমারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো খুনই করা হয়েছে তাদের, আমি এসেছি ব্যাপারটা তদন্ত করতে-আমার কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। গিয়ে বলুন, তার সঙ্গে দেখা না করে আমি ফিরছি না।’

‘দুঃখিত, মিস্টার রানা...’

কড়া ধমক দিল রানা। সামনে এগোল এক পা। 'আপনার দুঃখ আপনার নিজের কাছেই রাখুন, মিস্টার এডিসি! হয় তাকে জানান, নয়তো পথ ছাড়ুন...' রুদ্রমূর্তি ধারণ করে আরও এক পা এগোল ও।

পিছু হটল এডিসি, হকচকিয়ে গেছে। 'দেখুন, আপনি একজন বিদেশী হয়ে একটা রাষ্ট্রের সার্বভৌম বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে...'

'ও-সব বিধি-বিধানের আমি নিকুচি করি!' বলে হঠাৎ মারমুখো হয়ে উঠল রানা। 'ওই শালা চাও পারায়াকে আমি আমার নিজের বিধি-বিধান শেখাতে চাই...'

দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াল এডিসি। স্যাৎ করে তাকে পাশ কাটল রানা, দরজার ভারী পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ল আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক কর্নেল চাও পারায়ার চেম্বারে।

ভিতরে ঢুকেই সরাসরি চাও পারায়ার বাড়ানো দুই হাতের ভিতর সঁধিয়ে গেল রানা। দরজার ঠিক সামনেই অপেক্ষা করছিল সে, ঠোটে মিটিমিটি হাসি।

রানা বিহ্বল আর বিমূঢ়, সমস্ত ক্রোধ এক নিমেষে ঠাণ্ডা পানি হয়ে গেছে। 'এটা কী?' চাও পারায়ার শিথিল বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে।

'স্রেফ হার্মলেস একটা রসিকতা, পরীক্ষাও বটে।' পুরোদস্তুর সামরিক উর্দি পরা কর্নেল পারায়া আনন্দে আপ্ত হয়ে হাসছে। 'ব্রিটিশ রয়্যাল আকাদেমির সেই তরুণ রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার সময়ের সঙ্গে কতটুকু বদলেছে জানার কৌতূহল হচ্ছিল।' মাথা নাড়ল সে, চোখ-মুখ থেকে প্রশংসা ঝরে পড়ছে। 'তুমি দোস্ত সেই আগের মতই আছ-চির উন্নত মম শির!'

হাসল রানাও। 'অথচ আমি ভাবছিলাম এত দিন পর আমাকে তুমি চিনতে পারবে কিনা...'

এরপর আপ্যায়ন আর অতীত রোমন্থনে কীভাবে যে দেড়টি ঘন্টা বেরিয়ে গেল বলতে পারবে না ওরা। খাস চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দুই পুরানো বন্ধু নিজেদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকল।

সবশেষে কাজের কথা পাড়ল রানা।

কর্নেল পারায়া বলল, 'গোটা মায়ানমারের মধ্যে আকিয়াবেই ক্রাইম রেট বেশি। অপরাধীরা বেশির ভাগই রোহিঙ্গা। সূর্য আর রচনার ব্যাপারে আমি নিজে দু'বার তাপাদা দিয়েছি পুলিশকে, কিন্তু ওরা নাকি কোন সূত্রই খুঁজে পাচ্ছে না। এই কেসের সুরাহা তোমাকেই করতে হবে, রানা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল ও। 'তবে আমি আশা করছি যদি সম্ভব হয় তোমরা আমাকে কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে।'

'ইয়েস, অভকোর্স। বলো কী তথ্য দরকার তোমার।'

'অয়েস্টার আইল্যান্ড সম্পর্কে ডিটেইলস জানতে চাই আমি,' বলল রানা। 'জানতে চাই-দ্বীপটা যে কিনেছে-রোহিঙ্গা ব্যবসায়ী ডক্টর থাকিন গজনবি সম্পর্কে। তারপর ওই গোয়ানোর ব্যাপারটা আসলে কী? কোথায়, কার কাছে গেলে এ-সব জানতে পারব?'

'কোথাও তোমাকে যেতে হবে না,' রানাকে আশ্বস্ত করল চাও পারায়া। 'গোয়ানো সম্পর্কে তোমাকে ঘন্টার ঘন্টা লেকচার দিতে পারব আমি। সব তথ্যই কমপিউটার ফাইলে পাওয়া যাবে।' রিভলভিং চেয়ার খানিকটা সরিয়ে একটা কমপিউটার মনিটরের সামনে চলে গেল সে। অন করল সেটটা, তারপর নির্দিষ্ট একটা ফাইল ওপেন করল। 'শুরু করছি-গোয়ানো।'

একঘেয়েমির শিকার হওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হলো রানা।

সবাই জানে, পাখির শুকনো বিষ্ঠা ওটা। দুই প্রজাতির পাখির পিছন থেকে বেরোয়-মাস্কড বুবি আর গোয়ানেই। তবে

অয়েস্টার আইল্যান্ডে শুধু গোয়ানেই পাখি আছে। ওটার আরেক নাম-গ্রিন করমরান্ট।

গোয়ানেই বা গ্রিন করমরান্ট হলো মাছকে গোয়ানোয় রূপান্তর করার একটা মেশিন। ওগুলোর প্রধান খাবার অ্যানচাভি। সংখ্যা বা পরিমাণটা অবিশ্বাস্য! কোন কোন পাখির পেটে সত্তরটা পর্যন্ত ওই মাছ পাওয়া গেছে। পেরুতে এই পাখি প্রচুর দেখা যায়। গোটা পেরুর মানুষ সারা বছরে বারো হাজার টন মাছ খায়। আর ওই দেশের সামুদ্রিক পাখিরা খায় পনেরো হাজার টন!

হাজার হাজার এই গোয়ানেই পাখি কমবেশি এক পাউন্ড মাছ খেয়ে এক আউন্স গোয়ানো ডেলিভারি দেয়, এ থেকেই নামটা এসেছে-গোয়ানো আইল্যান্ড। গোয়ানেই পাখি শুধু বিশেষ দ্বীপেই করে কাজটা।

‘কেন,’ মাঝপথে জানতে চাইল রানা। ‘সাগরে কেন করে না?’

‘জানি না।’ হাসল চাও পারায়া। ‘প্রশ্নটা আগে কখনও মাথায় আসেনি। তবে জানি, কম্মটি শুধু ল্যান্ডেই সারে ওগুলো-সেরে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। অর্থাৎ পরিমাণে জিনিসটা মিলিয়ন মিলিয়ন টন।

‘আঠারোশো পঞ্চাশ সালের দিকে কেউ একজন আবিষ্কার করে গোয়ানো হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সার, নাইট্রেট আর ফসফেটে ভরা। এরপর জাহাজে করে বিভিন্ন দ্বীপে হাজির হলো লোকজন, বিশ-ত্রিশ বছর ধরে খুঁড়ে সংগ্রহ করল গোয়ানো...’

‘অয়েস্টার দ্বীপ সম্পর্কে বলো,’ মনে করিয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার শুরু করল চাও পারায়া।

এত পূর্বে গোয়ানো আইল্যান্ড এই একটাই। এখানে অতীতে কোন এক সময় ফার্টলাইজার উত্তোলনও করা হয়েছে, আল্লাহ

মালাম কারা ছিল তারা। তবে এবানকার গোয়ানোর নাইট্রেট-এর মাত্রা কম। পেরু বা ক্লোরিডার ওদিকে যতটা, এদিকের পানি ততটা ভাল নয়, মাছও তত কেমিক্যাল সমৃদ্ধ নয়। ফলে উন্নত মানের গোয়ানোও পাওয়া যায় না। সেজন্যই প্রাকৃতিক সারের দাম ওঠা-নামার সঙ্গে ভাল রেখে অয়েস্টার দ্বীপে কখনও গোয়ানো খোঁড়ার কাজ শুরু হয়, কখনও বন্ধ থাকে।

কৃত্রিম সার বাজারে আসার পর গোয়ানোর চাহিদা একদম কমে গেল। কিন্তু কয়েক বছর পর জানা গেল কৃত্রিম সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা কমে যায়, তখন আবার গোয়ানোর কদর আকাশচুম্বি হয়ে উঠল।

এই সুযোগটাই নিলেন রোহিঙ্গা ভদ্রলোক, ডক্টর থাকিন গজনবি। গোয়ানোর তখন দাম উঠেছে প্রতি টন দেড়শো মার্কিন ডলার। ভাল ব্যবসা-বুদ্ধি থাকায় সরকারকে পঁচিশ লাখ মার্কিন ডলার সাধলেন তিনি। লোকমুখে শোনা যায় লিজ নেওয়ার পর থেকে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। এক হিসাবে জানা গেছে, প্রথম দু’বছরেই টাকাটা তুলে নিয়েছেন তিনি। তারপর থেকে সবটাই নাকি লাভ।

তার গোয়ানোর চাহিদা ইউরোপ আমেরিকাতেই বেশি। জাহাজে তুলে প্রতি মাসে নিয়মিত সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছেন। উৎপাদন দ্রুত আর সুষ্ঠু করার জন্য অত্যাধুনিক জ্যাশার আর সেপারেটর মেশিন বসিয়েছেন তিনি। শোনা যায় শ্রমিকদের গাধার মত খাটান। মোটা টাকা লাভ করতে হলে অবশ্য এর কোন বিকল্প নেই।

তবে এত সবার মধ্যে চমকে ওঠার মত খবরটা হলো, ডক্টর গজনবি নাকি কখনোই তার গোয়ানো প্রতি টন দেড়শো ডলারে বেচতে পারেননি। একশো ত্রিশ থেকে চল্লিশ, তার বেশি পাওয়া যায় না। খরচও পড়ে প্রায় ওই রকম। তা হলে তিনি লাভ করেছেন কীভাবে?

শয়তানের দ্বীপ

অরেস্টার আইল্যান্ডে শুধু গোয়ানেই পাখি আছে। ওটার আরেক নাম-গ্রিন করমরান্ট।

গোয়ানেই বা গ্রিন করমরান্ট হলো মাছকে গোয়ানোর রূপান্তর করার একটা মেশিন। ওগুলোর প্রধান খাবার অ্যানচাভি। সংখ্যা বা পরিমাণটা অবিশ্বাস্য! কোন কোন পাখির পেটে সত্তরটা পর্যন্ত এই মাছ পাওয়া গেছে। পেরুতে এই পাখি প্রচুর দেখা যায়। যেটা পেরুর মানুষ সারা বছরে বারো হাজার টন মাছ খায়। আর ওই দেশের সামুদ্রিক পাখিরা খায় পনেরো হাজার টন!

হাজার হাজার এই গোয়ানেই পাখি কমবেশি* এক পাউন্ড মাছ খেয়ে এক আউন্স গোয়ানো ভেনিচারি দেয়, এ থেকেই নামটা এসেছে-গোয়ানো আইল্যান্ড। গোয়ানেই পাখি শুধু বিশেষ দীপেই করে কাজটা।

‘কেন’ মাঝপথে জানতে চাইল রানা। ‘সাগরে কেন করে না?’

‘জানি না।’ হাসল চাও পারারা। ‘প্রশ্নটা আগে কখনও মাথার আসেনি। তবে জানি, কমন্টি শুধু ল্যান্ডেই সারে ওগুলো-সেয়ে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে। অর্থাৎ পরিমাণে জিনিসটা মিলিয়ন মিলিয়ন টন।

অঠারোশো পঞ্চাশ সালের দিকে কেউ একজন আবিষ্কার করে গোয়ানো হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সার, নাইট্রোট আর ফসফেট তরা। এরপর জাহাজে করে বিভিন্ন দীপে হাজির হলো লোকজন, বিশ-ত্রিশ বছর ধরে খুঁড়ে সংগ্রহ করল গোয়ানো—

‘অরেস্টার দীপ সম্পর্কে বলো,’ মনে করিয়ে দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার শুরু করল চাও পারারা।

এত পুরে গোয়ানো আইল্যান্ড এই একটাই। এখানে অতীতে কোন এক সময় কার্টলাইজার উত্তোলনও করা হয়েছে, অত্যা

মাণুম কারা ছিল তারা। তবে এখানকার গোয়ানোর নাইট্রোট-এর মাত্রা কম। পেরু বা ফ্লোরিডার ওদিকে যতটা, এদিকের পানি ততটা ভাল নয়, মাছও তত কেমিক্যাল সমৃদ্ধ নয়। ফলে উন্নত মানের গোয়ানোও পাওয়া যায় না। সেজন্যই প্রাকৃতিক সারের দাম ওঠা-নামার সঙ্গে তাল রেখে অরেস্টার দীপে কখনও গোয়ানো খোঁড়ার কাজ শুরু হয়, কখনও বন্ধ থাকে।

কৃত্রিম সার বাজারে আসার পর গোয়ানোর চাহিদা একদম কমে গেল। কিন্তু কয়েক বছর পর জানা গেল কৃত্রিম সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা কমে যায়, তখন আবার গোয়ানোর কদর আকস্মিক হয়ে উঠল।

এই সুযোগটাই নিলেন রোহিঙ্গা তদ্রলোক, ডক্টর থাকিন গজনবি। গোয়ানোর তখন দাম উঠেছে প্রতি টন দেড়শো মার্কিন ডলার। ভাল ব্যবসা-বুদ্ধি থাকায় সরকারকে পঁচিশ লাখ মার্কিন ডলার সাধলেন তিনি। লোকমুখে শোনা যায় নিজ নেওয়ার পর থেকে চুটিয়ে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। এক হিসাবে জানা গেছে, প্রথম দু’বছরেই টাকটা তুলে নিয়েছেন তিনি। তারপর থেকে সবটাই নাকি লাভ।

তার গোয়ানোর চাহিদা ইউরোপ আমেরিকাতেই বেশি। জাহাজে তুলে প্রতি মাসে নিরমিত সাপ্লাই নিয়ে যাচ্ছেন। উৎপাদন দ্রুত আর সুচল করার জন্য অত্যাধুনিক জাহাজ আর সেপারেটর মেশিন বসিয়েছেন তিনি। শোনা যায় শ্রমিকদের গাধার মত খাটান। মোটা টাকা লাভ করতে হলে অবশ্য এর কোন বিকল্প নেই।

তবে এত সবার মাঝে চমকে ওঠার মত খবরটা হলো, ডক্টর গজনবি নাকি কখনোই তার গোয়ানো প্রতি টন দেড়শো ডলারে বেচতে পারেননি। একশো ত্রিশ থেকে চল্লিশ, তার বেশি পাওয়া যায় না। খরচও পড়ে প্রায় ওই রকম। তা হলে তিনি লাভ করেছেন কীভাবে?

শতাব্দের দীপ

এই প্রশ্নের উত্তর জানা যায়নি।

দ্বীপটাকে একটা দুর্গের মত সংরক্ষণ করেন ডক্টর গজনবি, এক ধরনের লেবার ক্যাম্প আর কী। কেউ কখনও ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। নানা রকম উদ্ভট সব কাহিনী কানে আসে, তবে কেউ কখনও কোন অভিযোগ করেনি। দ্বীপটা তাঁর, সেটাকে নিয়ে তিনি যা খুশি করতে পারেন।

আবার মাঝপথে প্রশ্ন তুলল রানা। দ্বীপটার এত কী মূল্য?

উত্তরে কর্নেল পারায়া বলল, দুনিয়ার সবচেয়ে দামী পাখি এই গোয়ানেই। প্রতি জোড়া পাখি বছরে ছয় ডলার মূল্যের গোয়ানো উৎপাদন করে কোন রকম খরচ ছাড়াই। প্রতিটি মেয়ে পাখি গড়ে তিনটে করে ডিম পাড়ে, দুটো করে বাচ্চাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে। প্রতি জোড়ার দাম ধরা যাক পঁয়তাল্লিশ ডলার, তারপর ধরা যাক পাঁচ লাখ পাখি আছে ওখানে। তারমানে পাখির দামই ওঠে সাড়ে বাইশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বেশ মূল্যবান সম্পত্তিই বলতে হবে। তারপর স্থাপনা আর ইকুইপমেন্ট, আরও তিন মিলিয়ন ধরা যাক।

ইতিমধ্যে সময় গড়িয়ে দুপুর হতে চলেছে। পুরানো বন্ধুকে সহজে ছাড়তে রাজি হলো না কর্নেল পারায়া, রানাকে শহরের অভিজাত একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে এল লাঞ্চ খাওয়াতে।

লাঞ্চ খাওয়ার সময়ও অয়েস্টার দ্বীপ আর ডক্টর গজনবি সম্পর্কে আলাপ করল ওরা। ডক্টর গজনবি নাকি মিষ্টভাষী নিপাট ভদ্রলোক। তবে ব্যবসাটা তাঁর কাছে সবচেয়ে আগে। সবাই জানে এইচআরবি সোসাইটির সঙ্গে একটা বিরোধ বেধেছিল। আর দ্বীপটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আকিয়াব ইন্সটিটিউটে যেতে হবে রানাকে। লোকমুখে শুনে যতটা জানা গেছে, অভিশপ্ত একটা জায়গা বলে মনে হয়। মাইলের পর মাইল শুধু জলাভূমি, আর এক প্রান্তে প্রকাণ্ড হিমালয় হয়ে আছে পাখির বিষ্ঠা।

এক ঘণ্টা পর দেখা গেল আকিয়াব ইন্সটিটিউটের একটা কামরায় বসে অয়েস্টার দ্বীপের অর্ডিন্যান্স সার্ভে ম্যাপ পরীক্ষা করছে রানা, উনিশশো দশ সালে তৈরি। একটা কাগজে স্কেচ-ম্যাপ একে নিল ও, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোকে তারকাচিহ্নিত করতেও ভুলল না।

অয়েস্টার নামে এক সময় ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপ ছিল, প্রকৃতির খেলায় সেগুলো জোড়া লেগে এক হয়ে গেছে। হাজার বছর ধরে অয়েস্টার দ্বীপ একটু একটু করে শুধু বড়ই হচ্ছে। বর্তমানে ওটার আকার পঞ্চাশ বর্গমাইল। এর তিন চতুর্থাংশই জলা আর লেক। সেগুলো পূর্বে। লেক থেকে একটা সমতল নদী বেরিয়ে সাগরে পড়েছে। দক্ষিণ উপকূলের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে বালিভর্তি ছোট একটা সৈকত।

রানা আন্দাজ করল নদীর কোনও শাখার কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে এইচআরবি সোসাইটির কর্মী দু'জন তাদের ক্যাম্প বানিয়েছিল।

পশ্চিমে দ্বীপটা প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে, পাঁচশো ফুট উঁচু একটা পাহাড় তৈরি হয়েছে ওদিকে, অপর প্রান্তটা অকস্মাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায় মাথা থেকে নীচের সাগরে ঝপ করে নেমে গেছে প্রাচীরটা।

দ্বীপের কোথাও কোন রাস্তা, এমনকী পায়ে হাঁটা পথেরও কোন চিহ্ন নেই। বাড়ি-ঘরও দেখানো হয়নি। রিলিফ ম্যাপ দেখে মনে হয় একটা জলচর ইঁদুর সাঁতরাচ্ছে-শিরদাঁড়া ক্রমশ উঁচু হয়ে মাথার দিকে এগিয়েছে। যাচ্ছে পশ্চিমে। অয়েস্টার থেকে মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি থানখামা দ্বীপের দূরত্ব পনেরো-ষোলো মাইলের বেশি হবে না-তার বেশিরভাগই অগভীর সাগর, কোমর সমান পানি ঠেলে হেঁটে পার হওয়া যায়।

মাথার উপর ফ্যান চললেও ঘামে রানার পিঠের সঙ্গে সঁটে গেছে শার্টটা। কাজ শেষ হতে দেখা গেল চারটে বাজতে

চলেছে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে পাহাড়ের উপর নিজের হোটেলে ফিরে এল ও।

হোটেলে ঢুকে রিসেপশন ডেস্কে চলে এল রানা, জিজ্ঞেস করল ইয়ে হোয়ে কোন মেসেজ পাঠিয়েছে কিনা।

‘না, সার,’ বলল মেয়েটি, ‘কোন মেসেজ আসেনি। তবে সামরিক প্রশাসকের অফিস থেকে এক খুড়ি ফল পাঠানো হয়েছে লাঞ্চের ঠিক পরেই। একজন আরদালি আপনার স্যুইটে পৌছে দিয়ে গেছে।’

‘আরদালি? কী ধরনের আরদালি?’

‘একজন রোহিঙ্গা, সার, উর্দি পরা। বলল কর্নেল চাও পারায়ার অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে তাকে।’

‘ধন্যবাদ।’ চাবি নিয়ে ঘুরল রানা, এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতলায়। এরকম কিছু ঘটান সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ, ভাবল রানা। কোটের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্রে হাত রেখে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

কি হোলে চাবি ঘুরিয়ে কবাটে লাথি মারল রানা। ফাঁক হয়ে গেল দরজা। খালি সিটিংরুম হাঁ করে আছে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। তারপর প্রতিটি কামরা সার্চ করল। কেউ নেই।

ওর বেডরুমে, ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা হয়েছে ফল ভর্তি খুড়িটা। ঢাকনি তুলে আপেল, বেদানা, আঙুর, কমলা, আতা আর পিচফল দেখতে পেল রানা। খুড়ির হাতলে চওড়া ফিতের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে সাদা একটা এনভেলাপ।

এনভেলাপটা আলোর সামনে ধরে পরীক্ষা করল রানা। ভিতরে কী আছে বোঝা গেল না। অগত্যা খুলল সাবধানে। একটুকরো দামী রাইটিং পেপার পাওয়া গেল, তাতে লেখা—‘আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের তরফ থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ।’ কেউ সই করেনি। কোন সিলও মারা হয়নি।

নাক কোঁচকাল রানা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফলগুলো দেখছে। একটু খুঁকে ওড়লোর দিকে একটা কান তাক করল, কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। এরপর হাতল ধরে কাত করল খুড়িটা, সমস্ত ফল ঝরে পড়তে দিল। কার্পেটের উপর ড্রপ খেল সেগুলো, চারদিকে গড়াল। খুড়ির ভিতর ফল ছাড়া আর কিছু নেই।

অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করায় আপন মনে হাসছে রানা। তবে শেষ একটা সম্ভাবনা যাচাই করে দেখার কথা ভুলল না। কার্পেট থেকে একটা পিচ তুলে নিল ও। যে-কোন লোভী লোক এটাই প্রথমে মুখে পুরবে। বাথরুমে চলে এল ও, ওটাকে ওয়াশবেসিনে ফেলে ফিরে এল বেডরুমে।

তালাটা পরীক্ষা করে নিয়ে ওয়ার্দ্‌রুম খুলল রানা। অত্যন্ত সাবধানে ভিতর থেকে তুলে নিল সুটকেসটা, ধীরে ধীরে পিছিয়ে এসে কামরার মাঝখানে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে কার্পেটে হাঁটু গাড়ল। তালা দুটোর চারপাশে চোখ বুলাল, দেখল ওর রেখে যাওয়া ট্যালকম পাউডার প্লেস্টে গেছে, কি হোলের চারপাশে সূক্ষ্ম আঁচড়ও চোখে পড়ল।

থমথমে চেহারা নিয়ে দাগগুলো পরীক্ষা করল রানা। দেখা যাচ্ছে শত্রুরা যথেষ্ট সাবধান নয়। তালা খুলল ও, তবে ঢাকনি না খুলে কার্পেটে দাঁড় করাল সুটকেসটাকে। ঢাকনির প্রতিটি প্রান্তে অলঙ্করণ হিসাবে নিরীহদর্শন চারটে করে তামার ঘুন্টি রয়েছে। ডানদিকের একটা ঘুন্টি নখ দিয়ে খুঁটে খুলে আনল রানা। বেরিয়ে এল তিন ফুট লম্বা একটা ইস্পাতের তার। ওটা পাশেই কার্পেটের উপর রাখল ও। বাড়তি সাবধানতা হিসাবে ঢাকনির ভিতর ছোট ছোট ধাতব লুপ তৈরি করা আছে, এই ইস্পাতের তার সেগুলোর ভিতর দিয়ে যাওয়ায় তালা খোলার পরেও কৌশলটা জানা না থাকলে কারও পক্ষে ঢাকনি খোলা সম্ভব নয়।

ঢাকনি তুলে সুটকেসের ভিতরটা পরীক্ষা করল রানা।

প্রতিটি ভিনিস যেমন রোশে গিড়েছিল তেমনি আছে, কোনটাকে
কাঠও হাত পড়েনি।

ওর 'টুল-কেন্স' থেকে একটি জুয়েলার'স গ্রাস বের করে
আবার বাথকমে ফিরে এল রানা। শেডিং মিররের উপরের
আলোটা জ্বলে গ্রাসটা অটিকাল চোখে, তারপর বেসিন থেকে
পিচটা তুলল। সেটাকে দু'আঙুলে ধরে গ্রাসের সামনে ধীরে ধীরে
ঘোরায়েছে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানার আঙুল দুটো। সূক্ষ্ম একটি ফুটো
দেখতে পেয়েছে ও, সেটার কিনারা অস্পষ্ট বাদামী। ফুটোটা
ফলের খায়ে খীণ একটি ফটিলে রয়েছে, ম্যাগনিফাইং গ্রাস ছাড়া
কেউ দেখতে পাবে না। পিচটা সাবধানে ওয়াশবেসিনে নামিয়ে
রাখল রানা। এখানে দাঁড়িয়ে চিন্তিত ভাবে এক মুহূর্ত তাকিয়ে
থাকল আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চোখ দুটোর দিকে।

তারমানে এটা একটি যুদ্ধ। বেশ, বেশ। ইন্টারেস্টিং
ব্যাপার। তলশেটের চামড়ার সামান্য টান অনুভব করল রানা।
আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে খীণ একটু হাসল
ও। তারমানে ওর ইপটিঙ্কট আর বিশ্লেষণ সঠিক ছিল। সূর্য আর
রচনাকে খুন করা হয়েছে, তাদের রেকর্ড নষ্ট করে ফেলা হয়েছে,
কারণ পিছু নিয়ে কাউকে ধরে ফেলতে যাচ্ছিল তারা।

তারপর মঞ্চে আগমন ঘটল ওর; ওর জন্য অপেক্ষা করছিল
শত্রুর অনুচররা। তাদের একজন সম্ভবত ট্যাক্সি ড্রাইভার।
আরেকজন তামান্না রিটিন ডলি।

ও যে সানড্রাগুয়ার হোটেলে উঠেছে, শেরাটনে নয়,
এ-খবরও তারা জানে। প্রথম গুলিটা করা হয়ে গেছে। আরও
হবে। প্রশ্ন হলো, ট্রিগারে কার আঙুল? এত নিষ্ঠুরভাবে কে ওকে
সাইটে ধরে রেখেছে?

তার পরিচয় সম্পর্কে রানার মনে কোন ধিধা নেই। সাক্ষী-
প্রমাণ শূন্য। তবু রানা নিশ্চিত। এটা লং রেঞ্জ ফায়ার, সেই

অয়েস্টার আইল্যান্ড থেকে। অয়েস্টার পিছনের পোকটা হঠাৎ
পজমবি না হয়েই যায় না।

বেডরুমে ফিরল রানা। ফলগুলো একটি একটি করে কুড়িয়ে
বাথকমে এনে ম্যাগনিফাইং গ্রাসের নীচে রোশে পরীক্ষা করল
ও। সূক্ষ্ম একটি করে ফুটো প্রতিটি কমেই আছে, বেসিনের পাঠে
বা কোন ফটিল কিংবা ডিউ-এর ভিতর লুকানো।

কম সার্ভিসকে ডেকে একটি কার্ডবোর্ড বক্স, কাপড় আর
সুতো চাইল রানা। ফলগুলো সাবধানে ভরল বাক্সটায়। তারপর
ফোন করল বন্ধুবর ডাঃ পারাডাকে। 'একটা বাক্স পাঠাচ্ছি,
বিশ্বস্ত আর মজ্ঞ একজন পাবলিক অ্যানালিস্টকে দিয়ে কিছু ভাল
পরীক্ষা করাতে হবে। এখন কিছু বলছি না, পরে সব ব্যাখ্যা
করব। সম্ভব।'

'একশোবার সম্ভব, রানা।'

'রিপোর্ট পেলে নিজের কাছে রোশে দিয়ে, আমি আমার
সমস্ত মত লোক পাঠিয়ে আনিতে নের, ঠিক আছে?'

'ভাল।'

'আরেকটা কথা। অ্যানালিস্ট হুদুলেকে বলাতে হবে,
নমুনাগুলো যেন সাবধানে নাড়াচাড়া করেন। ভুলেও যেন একটি
ফলে কামড় না দেন। দেখে যা মনে হয়, ওগুলো আসলে তা
নয়। ভেরি মেনি ব্যাঙ্কস, নোথ। আমি ভাণ্ডারান, এত বছর পর
আজ সকালে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। শুভবাই।'

পার্সেলে টিকানা লিখে নীচে নামল রানা। একটি ট্যাক্সি
ভাড়া করে কর্নেল পারাডার অফিসে পাঠিয়ে দিল ওটা। বিকেল
ছটা। সাইটে ফিরে এসে শাওয়ার সাবল রানা, নতুন এক সেট
কাপড় পরে লম্বা একটি গ্রাসে খানিকটা হুইকি ঢেলে বেরিয়ে
এল কুল-বারান্দায়। ঠিক এই সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা।

ঘরে ফিরে রিসিভার তুলল রানা।

ইয়ে হোয়ে ফোন করেছে। 'সব ঠিক করে ফেলেছি, কর্নেল কপ।'

‘সব? ভেরি গুড। কটেজটা কেমন?’

‘এই কটেজে আগেও আপনি ছিলেন, কর্নেল বস,’ জানাল
হোয়ে। ‘বেশ ক’বছর আগে। আপনার সঙ্গে ঠিক সময়ে দেখা
করব, বস।’

‘ঠিক আছে।’

ঝুল-বারান্দায় বসে মনে মনে একটা প্ল্যান তৈরি করল রানা।
রাত আটটার দিকে নীচে নামল ডিনার খেতে। ডাইনিংরুম মাত্র
অর্ধেকটা ভরেছে।

ন’টায় সুইটে ফিরে কিছুক্ষণ টিভির খবর শুনল, তারপর
রুম-সার্ভিসকে ইন্টারকমে জানিয়ে রাখল ভোর সাড়ে পাঁচটায়
ঘুম থেকে তুলে দিতে হবে ওকে।

আগেই দরজায় তালা লাগিয়েছে, বোল্টগুলো জায়গামত
ঠেলে দিল রানা। প্রতিটি জানালাও বন্ধ করে বোল্ট লাগিয়ে
দিল। এয়ারকুলার অন করে বিছানায় উঠল ও। বিবস্ত্র শরীরের
উপর পাতলা একটা চাদর টেনে নিল। শুলো বাঁ দিকে কাত
হয়ে, ডান হাতটা বালিশের তলায় রাখা ওয়ালথারের বাঁটে। পাঁচ
মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

এরপর রানা বুঝল রাত এখন তিনটে। বুঝল, কারণ
হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালটা ওর মুখের কাছে রয়েছে। সম্পূর্ণ
স্থির হয়ে পড়ে থাকল ও। সুইটের ভিতর কোন শব্দ হচ্ছে না।
কান দুটোকে যথাসম্ভব খাড়া করল। বাইরেও মৃত্যুপুরীর মত
নিস্তব্ধতা। বহু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকতে শুরু করল।
দেখাদেখি আরও কয়েকটা কুকুর ডাকছে। কিছুক্ষণ এই কোরাস
চলার পর হঠাৎ সবগুলো একই সঙ্গে থেমে গেল।

আবার গা ছমছমে, ভৌতিক নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধছে।
ভেন্টিলেটর দিয়ে ভিতরে ঢুকে বেডরুমের এক কোণে সাদা-
কালো মোটা রেখা তৈরি করছে চাঁদের আলো। যেন একটা

খাঁচার ভিতর শুয়ে আছে ও।

কী কারণে ঘুমটা ভাঙল? ধীরে ধীরে নড়ল রানা, বিছানা
থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও, জ্যান্ত একটা মানুষ যতটা মড়ার
মত হতে পারে।

ওর ডান পায়ের গোড়ালিতে কিছু একটা নড়াচড়া করেছে।
এই মুহূর্তে সেটা পায়ের লম্বা হাড় বেয়ে হাঁটুর দিকে উঠে
আসছে। রানা অনুভব করছে ওর পায়ের লোমগুলো ফাঁক হয়ে
যাচ্ছে। জিনিসটা কোনও ধরনের পোকা হবে। কিন্তু পোকা কি
এত বড় হয়? এটাকে মনে হচ্ছে অনেক বড়—পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি
লম্বা, প্রায় ওর হাতের তালুর সমান। ওটার দশ-বারোটা খুঁদে পা
অনুভব করছে ও, হালকাভাবে স্পর্শ করছে ওর ত্বক। কী
জিনিসটা?

এরপর এমন একটা কিছু শুনল রানা, যা আগে কখনও
শোনেনি—মাথার চুল বালিশে ঘষা খাওয়ার শব্দ। আওয়াজটা
কীসের হতে পারে বোঝার চেষ্টা করছে রানা। এ স্রেফ সম্ভব
নয়। এ হতে পারে না! হ্যাঁ, ওর মাথার চুল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে
পড়ছে। রানা এমনকী চুলের ফাঁক গলে ঢুকে পড়া ঠাণ্ডা বাতাসও
অনুভব করছে। কী অবাক কাণ্ড! চিরকাল ভেবে এসেছে, এটা
একটা কথার কথা, মানুষের চুল সত্যি কী আর দাঁড়ায়!

কিন্তু কেন? এরকম কেন ঘটছে?

পা বেয়ে উঠে আসছে জিনিসটা। হঠাৎ করে রানা উপলব্ধি
করল ভয় পেয়েছে ও, আতঙ্কিত বোধ করছে। মস্তিষ্কের সঙ্গে
যোগাযোগ করার আগেই ওর ইন্সটিন্কটগুলো শরীরকে জানিয়ে
দিয়েছে গায়ে একটা বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে উঠেছে।

কাঠ হয়ে পড়ে আছে রানা। একবার একটা মিউজিয়ামে
এটার চেয়ে অনেক ছোট কাঁকড়া বিছে দেখেছিল ও স্পিরিট
ভর্তি বোতলের ভিতর। ভোঁতা মাথার দু’দিকে বাঁকা হয়ে আছে
শয়তানের দ্বীপ

ঠিক যেন মোটা একজোড়া সাঁড়াশি। কাকড়ার লেজটা খাড়া, পিঠের দিকে বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকে, ওই লেজের ডগাতেই আছে মারাত্মক বিষ। অত্যন্ত স্পর্শকাতর সরীসৃপ, সামান্যতম বিরক্ত করা হলেও বিষাক্ত হল ঢুকিয়ে দেয়। বোতলের গায়ে সাঁটা লেবেলের লেখাটা এখনও মনে আছে—ধমনীতে বিধলে এই বিষে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বিছেটা ওর হাঁটুতে পৌছেছে। উরুর উপর দিয়ে আরও উপরে উঠছে। যাই ঘটুক না কেন, নড়াচড়া করা চলবে না, এমনকী কাঁপাও নিষেধ। সমস্ত সচেতনতা এখন নরম দু'সারি সচল পায়ের উপর ঢেলে দিয়েছে রানা।

এবার ওর শরীরের মাঝখানে পৌছেছে ওটা। খোদা, ঘুরে ওর নাকের নীচে নেমে যাচ্ছে! দাঁতে দাঁত পিষল রানা। এই জায়গার গরম ভাবটুকু ওটার যদি পছন্দ হয়ে যায়! কিংবা ক্রল করে যদি কোন চিপার মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর আর বেরুতে না চায়! সহ্য করতে পারবে ও? কিংবা যদি হল ফোটাবার জন্য ওই জায়গাটাকেই ওটার খুব পছন্দ হয়? রানা অনুভব করল প্রথম কয়েকটা লোমের গোড়ায় পৌছে ইতস্তত করছে ওটা। সুড়সুড়ি লাগছে ওর। পেটের চামড়ায় আপনা থেকেই ঢেউ উঠছে। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন উপায় জানা নেই ওর। তবে জিনিসটা আবার ঘুরে তলপেটে ফিরে এসেছে। পা দিয়ে আঁকড়ে ধরছে চামড়া, ভয় পাচ্ছে পড়ে না যায়।

তারপর ধীরেস্থে হার্ট-এর উপর উঠে এল। ওখানে যদি হল ফোটার, নির্ঘাত মারা যাবে ও। তবে থামল না, বুকের চুলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে সোজা উঠে এল কলার বোনে।

এবার থামল ওটা। কী করছে ওখানে? রানা অনুভব করল ভোঁতা মাথা আর সাঁড়াশি দুটো খোঁজাখুঁজির ভঙ্গিতে অন্ধের মত আগুপিছু করছে। খোঁজার কী আছে ওখানে? ওর জাগিউলার

ভেইনের গোড়ায় পৌছেছে বিছেটা। হয়তো পালস টের পেয়ে সন্দেহ জেগেছে বা ভয় পেয়েছে। খোদা, খুব ভাল হত রক্ত পাম্প করাটা যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকত। মর শালা! বিছেটার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের চেষ্টা করল রানা। ও কিছু না, হে। বিপজ্জনক ভেবো না, স্রেফ পালস। তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি বরং চেষ্টা করে দেখো, তাজা বাতাসের সন্ধানে বেরুতে পারো কিনা।

যেন রানার কথা শুনতে পেয়েছে, গলা বেয়ে চিবুকে উঠে এল বিছেটা। গতি ধীর হয়ে গেছে। উঠে এল মুখের কোণে, কী কারণে যেন অস্থির। উঠছে এখনও। নাক বরাবর পথ করে নিচ্ছে। এখন ওটার পুরোটা ওজন আর দৈর্ঘ্য অনুভব করতে পারছে রানা। আলতোভাবে চোখ দুটো বন্ধ করল ও।

ওর বন্ধ ডান চোখের পাতায় উঠে এল। চোখ থেকে নামলে ঝুঁকি নিয়ে ওটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করবে? ওর ঘামে যখন পিছলাবার উপক্রম করবে ওটার পা? না, দোহাই লাগে আল্লাহ! পা তো অনেকগুলো, ঝাড়া দিলে হয়তো কয়েকটা স্থানচ্যুত হবে, বাকিগুলো আরও জোরে চামড়া আঁকড়ে ধরতে পারে।

নির্ভয়ে, স্বাধীন ভঙ্গিতে, বিষাক্ত কাকড়া বিছেটা রানার কপালে উঠে এল। চুল যেখান থেকে শুরু হয়েছে তার ঠিক নীচে থামল। ওই শালা, ওখানে কী? মুখ বা মাথা চামড়ায় ঘষছে। ও, খোদা! কী ঘটছে বুঝতে পারল রানা। শালার বিছে গলা ভেজাচ্ছে! ওর কপালে ফোঁটা হয়ে থাকা লোনা ঘাম পান করছে। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত রানা। কয়েক মিনিট পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ প্রায় নড়ছেই না। প্রবল উত্তেজনায় দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। অনুভব করল শরীরের বাকি অংশ থেকে স্রোতের মত ঘাম বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বিছানার চাদর। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওর হাত-পা কাঁপতে শুরু করবে। ব্যাপারটা যে শুরু হবে, বুঝতে পারছে পরিষ্কার। নিদারুণ ভয়ে কাঁপুনি ধরতে

१. संस्कृत भाषा : इस विषय में आपका विचारण बहुत महत्वपूर्ण है।
 २. संस्कृत भाषा : इस विषय में आपका विचारण बहुत महत्वपूर्ण है।
 ३. संस्कृत भाषा : इस विषय में आपका विचारण बहुत महत्वपूर्ण है।
 ४. संस्कृत भाषा : इस विषय में आपका विचारण बहुत महत्वपूर्ण है।
 ५. संस्कृत भाषा : इस विषय में आपका विचारण बहुत महत्वपूर्ण है।

[illegible][illegible][illegible]

କାଳୀନ ସିଂହ କବିତା, କୁଳଦେବ ମାତା, ଶକତି, କୋଳ, ଶାନ୍ତି
 ଶାନ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶେଷ ହୁଏନ । ଶେଷ ଏକ କାଳକାଳ ସାଧନା
 ଶେଷର ଶେଷର ଶାନ୍ତିର । ଶେଷର ଶେଷର ଶାନ୍ତିର ଏକ
 ଶାନ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଶେଷର ଶାନ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁଳ କାଳକାଳ
 କଳା କୁଳକାଳ କାଳ କାଳ । ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତିର କିନ୍ତୁ କୁଳକାଳ
 କାଳ, ଶାନ୍ତିର କିନ୍ତୁ କାଳ କାଳ ଶାନ୍ତିର । ଶେଷ କାଳେ ଶେଷ ଏକ

[illegible][illegible]

কিন্তু এভাবে পেলো হলে : হোমোকে কলকাতার কল্যাণ
হলেনি : শব্দ হালুয় হোমো, কিন্তু কলকাতা হলে কলকাতা হোমো

কোন যুক্তি নেই। 'আচ্ছা, নতুন বা আধুনিক কোন দালানে ওগুলো থাকতে পারে? তোমার জুতোয়, কিংবা দেরাজে বা বিছানায়?'

'না, কর্নেল বস্।' হোয়ের গলার সুরে নিশ্চয়তা। 'যদি না কেউ রাখে ওখানে। ওগুলো গর্ত আর নোংরা পরিবেশ পছন্দ করে। পরিষ্কার জায়গা পছন্দ করে না। আপনি হয়তো ঝোপের ভেতর, পাথরের নীচে বা মাটিতে পড়ে থাকা গাছের ডালের তলায় পাবেন। পরিষ্কার জায়গায় কখনোই দেখবেন না।'

'আচ্ছা।' প্রসঙ্গ বদল করল রানা। 'ভাল কথা, সে-ই দুই লোককে সূর্যের গাড়ি গছিয়ে দিয়ে মোয়ে-মায়ে শহরে পাঠিয়েছ?'

'ইয়েস, কর্নেল বস্। কাজটা পেয়ে ভারি খুশি তারা। দেখতেও দু'জন আমার আর আপনার মত।' আবার একবার আড়চোখে রানার দিকে তাকাল হোয়ে। তারপর খানিক ইতস্তত করে বলল, 'না বলে পারছি না, কর্নেল বস্, খুব একটা ভাল মানুষ নয় তারা। আমার জায়গায় একজন ভিখারিকে যোগাড় করেছি। আর আপনার জন্যে মিসেস লক্ষ্মীবাই-এর কাছ থেকে এক ভদ্রলোককে ধার করে এনেছি।'

'লক্ষ্মীবাইটা কে?'

'ভারতীয় মহিলা, কর্নেল বস্, বহু বছর ধরে আকিয়াবে আছে। শহরতলীর সবচেয়ে বড় বেশ্যাপাড়াটা চালায় সে। ওই ভদ্রলোক লক্ষ্মীবাইয়ের খাতা লেখে, মানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট।'

হেসে উঠল রানা। 'তাতে কী, গাড়ি চালাতে জানলেই হলো। আমি শুধু চাই মোয়ে-মায়েতে ঠিকমত যাতে পৌছাতে পারে ওরা।'

'সে ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না, কর্নেল বস্,' রানার কথার ডুল অর্ধ করল হোয়ে। 'আমি ওদেরকে বলেছি জায়গা মত পৌছে আপাই-এর গ্যারেজে মার্সিডিজ ডেলিভারি না

দিলে পুলিশকে রিপোর্ট করব আমি-গাড়ি চুরির কেস করব।'

ভোরবেলার রাস্তা প্রায় নির্জন। ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে ওদের গাড়ি।

হঠাৎ ক্ষমা-প্রার্থনার সুরে হোয়ে বলল, 'মাফ করবেন, কর্নেল বস্, দয়া করে বলবেন, আমাদের জন্যে ঠিক কী প্ল্যান তৈরি করলেন? অনেক ভাবছি, কিন্তু আপনার খেলাটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।'

'কীভাবে খেলব সেটা আমি নিজেও এখন পর্যন্ত ঠিক করতে পারিনি, হোয়ে,' বলল রানা। 'তোমাকে আমি বলেছি, এখানে আমার আসার কারণ হলো সূর্য আর রচনা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। আমার ধারণা খুন হয়েছে তারা।'

'আপনি আমাকে এ-ও বলেছেন যে এশিয়ার দেশে দেশে হঠাৎ যে স্যাবটাজ শুরু হয়েছে সেজন্যে দায়ী নকল পুলিশ।'

'বলেছি।'

'কিন্তু, কর্নেল বস্, খেয়াল করেছেন-নকল পুলিশদের হামলা হঠাৎ করে একদম বন্ধ হয়ে গেছে?'

'আমার ধারণা, কেউ একজন দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্যে ওগুলোকে মাঠে নামিয়েছিল,' বলল রানা। 'ক্রটিগুলো জেনেছে, সেগুলো সারিয়ে নিশ্চয় আবার মাঠে নামাবে। আমাদেরকে তার আগেই কিছু একটা করতে হবে, হোয়ে।'

'হুম।' গম্ভীর হয়ে গেল হোয়ে। খানিক পর জিজ্ঞেস করল, 'ওঁরা দু'জন যে খুন হয়ে গেছেন; কার কাজ বলে মনে করছেন, কর্নেল বস্?'

'আমার বিশ্বাস, অয়েস্টার আইল্যান্ডের ডক্টর গজনবির কাজ এটা। সূর্য বা রচনা তার ব্যাপারে নাক গলাবার মত কিছু পেয়ে যায়-সম্ভবত, পাখিদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে একটা কেসে কাজ করার সময়। তুমিও আমাকে বলেছ, প্রাইভেসি প্রকার ব্যাপারে লোকটা রীতিমত ম্যানিয়াক।'

শয়তানের দ্বীপ

‘তাতে কোন সন্দেহ নেই, কর্নেল বস্।’

‘দেখা যাচ্ছে তার পাঁচিল টপকানো বন্ধ করতে মানুষকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করছে না লোকটা। তবে কি জানো, ডক্টর গজনবি সম্পর্কে এটা স্রেফ আমার বিশ্বাস বা সন্দেহ মাত্র। তার বিরুদ্ধে নিরেট কোন প্রমাণ নেই আমার হাতে।’

মুন দিয়ে শুনছে হোয়ে।

‘গত চব্বিশ ঘণ্টায় আশ্চর্য কিছু ব্যাপার ঘটেছে। সেজন্যেই মার্সিডিজটাকে মোয়ে-মায়েতে পাঠিয়েছি-একটা ফলস সেন্ট ছড়াবার জন্যে। একই কারণে পানসিতে যাচ্ছি কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে।’

‘তারপর কী, কর্নেল বস্?’

‘তারপর কিছু কেনাকাটা আর প্রস্তুতি, হোয়ে,’ বলল রানা।

‘প্রস্তুতি?’

‘আমরা অয়েস্টার আইল্যান্ডে যাব, তারই প্রস্তুতি। জায়গাটা একবার ভাল করে দেখা দরকার।’

উল্লাসে শিস দিল হোয়ে। তবে শেষের দিকটায় ম্লান হয়ে এল সুর।

‘স্রেফ একটু বেড়িয়ে আসা আর কী। ডক্টর গজনবির ওদিকটায় হয়তো যাবার দরকারই পড়বে না আমাদের। পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়টা দেখব। দেখব এইচআরবি সোসাইটির ক্যাম্পটর কী পরিণতি হয়েছে। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে পরের বার সদর দরজা দিয়ে যাওয়া যাবে-প্রয়োজনে পুলিশ বা সেনাবাহিনী নিয়ে।’

‘ওয়াভারফুল, ওয়াভারফুল আইডিয়া, কর্নেল বস্!’ হোয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

‘কীভাবে যাব বলো তো?’ জানতে চাইল রানা। ‘ইঞ্জিন বোটে করে?’ পরীক্ষা করছে হোয়েকে।

‘নাহ্!’ মাথা নাড়ল হোয়ে। ‘প্রথম কথা, ছোট কিছু হওয়া

চাই, যেটাকে সহজেই লুকিয়ে রাখা যায়। কোন শব্দ করলে চলবে না।’

‘ঠিক ধরেছ। তা হলে একটা ডিঙ্গি নৌকা?’

‘ইয়েস, কর্নেল বস্। শান্ত সাগর আর হালকা বাতাস দরকার হবে আমাদের। রাত দরকার হবে, রাতের অন্ধকার। দিন কয়েকের মধ্যে কাস্তে আকৃতির চাঁদ পেয়ে যাব। কোথায় ল্যান্ড করার কথা ভাবছেন?’

‘দক্ষিণ তীরে, নদীটার মুখের কাছাকাছি। তা হলে নদী ধরে লেকের দিকে যাওয়া সহজ হবে। আমার ধারণা এইচআরবি সোসাইটির ক্যাম্পটা ওদিকেই ফেলা হয়-হাতের কাছে মিষ্টি পানি আছে।’

‘ক’দিন থাকব ওখানে, কর্নেল বস্?’ জানতে চাইল হোয়ে। ‘খুব বেশি খাবারদাবার সঙ্গে নেয়া যাবে না। পাউরুটি, পনির, কলা আর কোক। ধূমপান নিষেধ-ধোঁয়া বা আগুন বিপদ ডেকে আনতে পারে। দ্বীপটা দুর্গম, কর্নেল বস্। শুধু জল আর ম্যানগ্রোভ।’

‘তিনদিনের প্ল্যান করো। আবহাওয়া খারাপ হয়ে উঠলে রওনা হতে দেরি হবে। একজোড়া হান্টিং নাইফ নিতে ভুলো না। আমি একটা রিভলভার সঙ্গে রাখব। বলা তো যায় না।’

স্টারলেট নিয়ে পানসি বে-র এক প্রান্তে চলে এল ওরা, পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে এক সারিতে বিশ-পঁচিশটা কটেজ তিন মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

ওদের কটেজ থেকে সৈকতে নামার জন্য পাহাড়ের ঢাল কেটে ধাপ তৈরি করা আছে।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে কটেজের গেট খুলল হোয়ে। একতলা ছোট একটা বাড়ি, ওটার সামনের উঠানে গাড়ি থামাল রানা। শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশ।

সাড়ে আটটা বাজে। সুটকেস খুলে দু’একটা জিনিস বের

শয়তানের দ্বীপ

করল রানা, কুস্তার বদলে স্যাভেল পরল, কাশড় ছেড়ে পল
খটল। খটল পরেই কিস্তনের দিক থেকে সুখানু কড়ি,
ডিমছাকা আর সেধ মটবর্তীর সুগন্ধ কেলে এল।

ব্রেকফাস্ট খেতে রাস নিজেদের জন্য একটা ট্রেনিং কুটিন
তৈরি করল রানা-সকাল সাতটার ঘুম থেকে ওঠা, সাপারে আধ
মাইল সীতার, ব্রেকফাস্ট, দু'মাইল নৌড়, আবার এক মাইল
সীতার, লঞ্চ, সিবানিডা, দু'মাইল সীতার, হট বাথ, ম্যাসাজ,
ডিনার, হাত নটার মধ্যে ঘুম।

ব্রেকফাস্টের পর কুটিন ধরে কাজ শুরু হলো।

ওইকর সাতটা দিন পার হয়ে গেল, মাকখানে শুধু দুটো
ব্যাপার কিছু সময়ের জন্য রানার কুটিনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।
প্রথমটা মর্নিং শোস্টে ছাপা একটা খবর। দ্বিতীয়টা কর্নেল ডাও
পারায়ার পরানো অ্যানালিস্ট রিপোর্টের রিপোর্ট।

মর্নিং শোস্টে মারাত্মক দুর্ঘটনার খবর ছেপেছে। মোয়ে-মারে
শহরে যাওয়ার সময় আকারীকা পাহাড়ী পথে একটা মাসিডিজ
কারকে থাকা মারে পাঁচ টনী ট্রাক। দুটো পাড়িই রাস্তা থেকে
হীড়ের গভীর খানে ঝটকে পড়ে। মাসিডিজের দু'জন আরোহীই
মারা গেছে। ট্রাক ড্রাইভারকে অকুহলে পাওয়া যায়নি, ধারণা
করা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের পরপরই পালিয়ে গেছে সে।

মর্নিং শোস্টের কপিটা পুড়িয়ে ফেলল রানা। হোয়েকে
বিচলিত করতে চায় না ও। ওদের বদলে লোক দু'জন মারা
যাওয়ার দুঃখ হচ্ছে ওর। ও ভেবেছিল ওরা শহর ছেড়ে চলে
যাচ্ছে সেবে প্রতিশঙ্করা তাদের বস্কে শুধু রিপোর্ট করবে;
এ-কথা একবারও ভাবেনি যে ট্রাকের ধাক্কার মেরে ফেলার
ব্যবস্থা করবে। তা যদি ভাবত, এরকম একটা কাজ কখনোই
করত না ও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

রওনা হতে আর মাত্র একদিন বাকি, এই সময় কুরিয়ার
সার্ভিস একটা এনভেলোপ দিয়ে গেল। প্রেরকের জায়গায় লেখা

হয়েছে কর্নেল ডাও পারায়ার। এনভেলোপের ভিতর একটা ডিরকুট
গেল রানা। তাতে লেখা-‘প্রতিটি কলের ভিতর এক বেশি
সাহায্যইড আছে যে একটা বোতাকে খুল করার জন্য ঘষেই।
নোকানমারের বিকল্পে ব্যবস্থা নাও। তত্ত্বজ্ঞা বইল। পারায়ার।’

ডিরকুটটাও পুড়িয়ে ফেলল রানা।

হোয়ে একটা ডিসি ডাড়া করেছে, দু'দিন ধরে সেটার পাল
লাপাল ওরা। মাকখানা থেকে অরেস্টার আইল্যান্ড অটোরো-বিশ
মাইল হলেও, ওরা সেখান থেকে রওনা হবে সেখান থেকে
দু'বুটা বিশ মাইলের কম হবে না।

হোয়ে বলল, ‘সাত-আট ঘণ্টা পালে লাগা ব্যতনই টেনে
নিরে যাবে আমাদেরকে। তারপর পাল ওটিয়ে বৈঠা চালাতে
হবে।’

আবহাওয়া শান্তই থাকছে। আকিয়ার রেডিও থেকে প্রচারিত
খবরেও বলা হলো আবহাওয়া ভাল থাকবে। রাতগুলো যেন
জন্মাস্থের জগৎ, এত কালো। রাস ইত্যাদি কিনে নৌকার তুলে
ফেলল ওরা। সন্ধ্যারের কালো ক্যানভাস জিন আর মীল শার্ট
পরবে রানা। পাতে সেবে রোপ-সোল আ।

শেষ সন্ধ্যাটা হালিহর হলো। রওনা হতে যাচ্ছে, কাজেই
একাধারে খুশি আর উত্তেজিত রানা। এটা একটা অভিজ্ঞান, ভাল
লাগার সেটাই কারণ। ব্যাপারটার মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের সময়
উপাদান আছে-শারীরিক খাটনি, রহস্য, একজন পাহাণহমর
শত্রু। ওর সঙ্গে রয়েছে আদর্শ একজন সঙ্গী। ওর উদ্দেশ্য মহৎ।

ঠিক সময়ে হোয়ে এসে জানাল, ‘সময় হয়েছে, কর্নেল বস।’

ওইকির গ্রাসে শেষ একটা চুমুক দিয়ে গ্রাসটা নামিয়ে রাখল
রানা, তারপর হোয়ের পিছু নিয়ে ধাপ বেয়ে পাহাড় থেকে নেমে
এল। ওদের নৌকা শান্তভাবে মোল যাচ্ছে পানিতে, বো বালির
উপর তোলা। কী কঠি দিয়ে রানানো কে জানে, ওদের এই
নৌকা অসম্ভব ভারি। যারা বৈঠা চালাবে তাদের জন্য বসার দুটো

আসন আছে দু'পাশে।

নৌকার পিছন দিকে চলে গেল হোয়ে। সামনের আসন আর
বো-র মাঝখানে উঠল রানা।

হাতুলাটা পিছনদিকে, পাশটা তাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।
নিজের বৈঠা তুলে নিয়ে বসিতে বাধিয়ে ঠেলল রানা। ধীরে
ধীরে নৌকাটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অগতীর পানির উপর দিয়ে খোলা
সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

অন্যাসে বৈঠা চালাচ্ছে দু'জন একযোগে। ছোট আকৃতির
ডেউ বোতে নরম চাপড় মারছে। তা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।
রাতটা গাঢ়। কেউ ওদেরকে রওনা হতে দেখেনি।

রানার একমাত্র কাজ বৈঠা চালানো। হাল ধরে আছে হোয়ে।
ঘন্টা দুয়েক বৈঠা চালাবার পর গতীর পানিতে চলে এল
নৌকা।

‘ওকে, কর্নেল বস,’ মৃদুকণ্ঠে বলল হোয়ে।

বৈঠা নামিয়ে রেখে তার দিকে পিছন ফিরে বসল রানা।
হোয়ে পাল বুলছে, কানভাসে তার নখ ঘষা খাওয়ার আওয়াজ
পাচ্ছে ও। পরমুহূর্তে এবল বাতাস পেয়ে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে
বুলে গেল পালটা। সোজা হলো নৌকা, তারপর ছুটল। ধীরে,
অলস একটা তঙ্গিতে এদিক ওদিক কাত হচ্ছে ওটা। বো-র তলা
থেকে নরম একটা হিসহিস আওয়াজ উঠছে। এক আঁজলার মত
পানি সরাসরি রানার মুখে ঝুড়ে মারল সাগর। খোলা সাগরের
টানা বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে, হাঁটু জোড়া বুকের কাছে তুলে দু'হাত
দিয়ে জড়িয়ে ধরল রানা। শক্ত কাঠ এরই মধ্যে নিতম্বে আর
পিঠে কানড় বসাতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে
ব্যাপারটা, রাতটা হতে চলেছে লম্বা আর কষ্টকর।

সামনের অন্ধকারে রানা শুধু কোন রকমে দুনিয়ার কিনারা
দেখতে পাচ্ছে। তারপর কালো ধোয়ার মত ব্যাপসা একটা জর,
সেটার উপর থেকে ওর হসেছে রক্তের জগর, প্রথমে ছাড়া

ছাড়া ভাবে, তারপর একসঙ্গে মিশে গায় উজ্জ্বল একটা কার্গেটে
পরিণত হয়েছে। মাথার উপর ভেসে আছে মিষ্টিওয়ে। কত
তারা? আতুল সমান দৈর্ঘ্যে নেওলো রয়েছে, তপতে ওর করে
একটু পরই একশো ছাড়িয়ে গেল।

পিছন দিকে তাকাল রানা। কুঁজো হরে কসে খাকা হোয়ের
মূর্তির পিছনে আকিয়ার হারবারের আলো দেখা যাচ্ছে।

মাকরাভের দিকে হাল ধরবে রানা। হাঁটুর উপর মাথা রেখে
চোখ বুজল ও।

নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ নৌকার পাশে বৈঠার বাড়ি
লাগায় জেগে উঠল রানা। একটা হাত সামান্য উঁচু করে আশঙ্ক
করল-ওনেছে। হাতঘড়ির ডায়ালের দিকে তাকাল। ব্যারোটা
পনেরো। আড়ষ্ট তঙ্গিতে ঠাঁজ বুলল পায়ের, ধীরে ধীরে ঘুরল,
তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আসন টপকে এগোল।

‘দুঃখিত, হোয়ে,’ বলল রানা। ‘তোমার উচিত ছিল আরও
আগে আমার ঘুম ভাঙানো।’

‘লাভের কথা যদি বলেন, কর্নেল বস, সেটা ঘুমেই বেশি।’
অন্ধকারে হোয়ের দু'সারি দাঁত মুক্তোর মত সাদা উজ্জ্বলতা
ছড়াচ্ছে।

সন্তর্কতার সঙ্গে পরস্পরকে পাশ কাটাল ওরা। নৌকার
পিছনে বসে বৈঠাটা তুলে নিল রানা। ওর পাশে বাঁকা একটা
পেরেকের সঙ্গে ভালভাবে বাঁধা রয়েছে ফুলে ওঠা পাল,
কিনারাগুলো পতপত আওয়াজ করছে বাতাসে।

রাতের সাগরে কোন পরিবর্তন নেই। চারদিক শুধু অন্ধকার
আর খালি। ঘুমিয়ে পড়া সাগরে পালস কোন রকমে টের
পাওয়া যায়। ভারী ডেউগুলো বিখাল, অথচ কোন আওয়াজ
করছে না। প্রতিটি ডেউয়ের দাবের নীচেটা গতীর আর গাঢ়
অন্ধকার, ডেউয়ের মাথা থেকে আকালে যা শিরশির করে ওঠে।

কী হবে, এখন যদি বড় একটা ডেউ নৌকার চড়াটা দিকটায়

আঘাত করে? নৌকা উল্টে যাবে, পানিতে পড়ে যাবে ওরা।
কতক্ষণ টিকবে?

একটা বাজল। দুটো বাজল। তিনটে। চারটে। ঘুম থেকে
জেগে আড়মোড়া ভাঙছে হোয়ে। নরম গলায় রানাকে ডাকল
সে। 'আমি মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কর্নেল বস।'

খানিক পরই সামনের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল।
নিচু ছায়া ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড একটা সাঁতারু ইঁদুরের আকৃতি
নিচ্ছে। ওদের পিছনে কাস্তে আকৃতির শ্রান একটা চাঁদ উঠছে।
দ্বীপটা এবার ভালই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মাত্র মাইল দুই
দূরে। তীর আর পাহাড়-প্রাচীরে আছড়ে পড়া সাগর গজরাচ্ছে
এদিকে।

জায়গা বদল করল ওরা। পাল খুলে ফেলল হোয়ে।
দু'জনের হাতেই এখন বৈঠা। আরও অন্তত এক মাইল, ভাবল
রানা, চেউয়ের পাঁচিল আড়াল করে রাখবে ওদেরকে-দ্বীপ থেকে
কেউ নজর রাখলেও দেখতে পাবে না। এমনকী কোন রাডারেও
ধরা পড়বে না নৌকাটা। শেষ এক মাইল খুব দ্রুত পার হতে
হবে ওদেরকে, বিশেষ করে যেহেতু ভোর হতে আর বেশি দেরি
নেই।

এবার রানাও ভূমির গন্ধ পাচ্ছে। বিশেষ কোন সুবাস,
ব্যাপারটা তা নয়। কয়েক ঘণ্টা পরিচ্ছন্ন সাগরের পর নাকে
শ্রেক নতুন কিছু পাওয়ায়। স্রোতের শক্তি কমে আসছে,
চেউগুলো হয়ে উঠছে ছোট আর চঞ্চল।

'এইবার, কর্নেল বস!' চেঁচিয়ে উঠল হোয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পানির আরও গভীরে বৈঠা ডোবাল রানা, আগের
চেয়ে ঘন-ঘন তুলছে আর নামাচ্ছে। ঘাম ঝরছে ওর চিবুক
থেকে। বোদা, এ তো অমানুষিক পরিশ্রম! ভারী নৌকাটা নড়ছে
বলেই মনে হচ্ছে না। বো-র দু'পাশে নগণ্য চেউ উঠছে। রানার
কাঁধ দুটোর যেন আঙন ধরে গেল। হাঁটুর উপর বৈঠা ঘষা

খাওয়ায় চামড়া উঠে যাচ্ছে।

ডুবো প্রবাল প্রাচীরকে পাশ কাটাচ্ছে ওরা। বৈঠার ডগায়
নরম বালি ঠেকছে। তীরে সাগর আছড়ে পড়ার আওয়াজ এখন
রীতিমত একটানা গর্জন। পানির উপর মাথাচাড়া দিয়ে থাকা
প্রবাল প্রাচীরের পাশ ঘেঁষে এগোবার সময় ভিতরে ঢোকান জন্য
ফাঁক খুঁজছে রানা। প্রাচীরগুলোর একশো গজ ভিতরে বালুরেখা,
ইনল্যান্ড থেকে সাগরে নামছে পানি। নদীটা! ফেনার পাহাড়
ওখানে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। জলমগ্ন পাথরের উপর ফুলে-
ফেঁপে উঠছে তেল চকচকে স্রোত। নৌকার মুখ সেদিকে ঘুরে
গেল, ঢুকে পড়ল স্রোতের মধ্যে। এদিকে পানিতে প্রবল
আলোড়ন উঠছে। নৌকার তলা ঘষা খেল ডুবো পাথরে।
তারপর হঠাৎ শান্ত হলো নৌকা। আয়নার মত পানির উপর
দিয়ে ধীর গতিতে তীরের দিকে এগোচ্ছে।

পানিতে নেমে আসা পাথরের একটা উঁচু মঞ্চের দিকে নৌকা
চালাচ্ছে হোয়ে, মঞ্চটার পাশেই শেষ হয়েছে সৈকত। রানা
অবাক হয়ে ভাবল চাঁদের আলোয় সৈকতটাকে সাদা দেখাচ্ছে না
কেন! নৌকা তীরে ভেড়ার পর নীচে নেমে কারণটা বুঝতে
পারল।

সৈকতটা কালো। বালি নরম, পায়ের তলায় আরাম লাগছে,
তবে সন্দেহ নেই তৈরি হয়েছে আগ্নেয় পাথর থেকে।

দ্রুত কাজ করছে ওরা। নৌকা থেকে ছোট আকৃতির তিনটে
বাঁশ নামিয়ে সমতল সৈকতে রাখল হোয়ে। নৌকাটাকে টেনে
প্রথম বাঁশটার উপর তুলল ওরা, তারপর ঠেলা দিতে সহজেই
সামনে এগোল ওটা। প্রতি গজ এগোবার পর পিছনের বাঁশটা
কুড়িয়ে এনে নৌকার সামনে ফেলল রানা। ধীরে ধীরে পানির
রেখা ছাড়িয়ে নৌকা নিয়ে বোস্তারের রাজ্যে ঢুকে পড়ল ওরা।
বোস্তারগুলোর মাঝখানে প্রচুর ঘাস আর ঝোপ দেখা গেল।
সেগুলোর ভিতর দিয়ে আরও বিশ গজ এগোবার পর সামনে

তরু হলো ম্যানগ্রোভ। সামুদ্রিক আগাছা, তীরে ভেসে আসা
গাছের ডাল ইত্যাদি কুড়িয়ে এনে নৌকাটাকে প্রায় ঢেকে ফেলল
ওরা। প্রচুর পাতা আছে, গাছ থেকে এরকম একটা ডাল ভেঙে
এনে নিজেদের পায়ের চিহ্ন নিখুঁতভাবে মুছে ফেলল হোয়ে।

চারদিক এখনও অন্ধকার, তবে পূর্ব আকাশ ফর্সা হতে শুরু
করেছে। পাঁচটা বাজে। দু'জনেই ওরা ভয়ানক ক্লান্ত। দু'একটা
কথা হলো, তারপর পাথরের তৈরি প্র্যাটফর্মটার দিকে এগোল
হোয়ে।

একটা ঘন ঝোপের নীচে শুকনো বালি সরিয়ে লম্বা একটা
অগভীর গর্ত তৈরি করল রানা। ওর এই বিছানার পাশে কয়েকটা
কাঁকড়াকে চরতে দেখা গেল। নাগালের মধ্যে যতগুলো পাওয়া
গেল এক এক করে কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ম্যানগ্রোভের দিকে।
তারপর লম্বা ওই গর্তের ভিতর ওয়ে পড়ল ও, হাতের উপর মাথা
রেখে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সাত

রানার ঘুমটাকে আলসেমিতে পেয়েছে। বালির স্পর্শ মনে করিয়ে
দিল কোথায় রয়েছে ও। চোখ খুলে হাতঘড়ি দেখল। দশটা। ঘন
ঝোপের ফাঁক গলে নেমে আসা রোদ এরইমধ্যে গরম হয়ে
উঠেছে। ওর মুখের উপর দিয়ে বড় একটা ছায়া সরে গেল।
হোয়ে? মাথাটা ঘোরাল রানা, ঝোপের ডালপালা আর ঘাসের ফাঁক
দিয়ে তাকাল-এগুলোই সৈকত থেকে আড়াল করে রেখেছে ওকে।

রানা-৩৫৫

তাকাতাই আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। একটা বিট মিস করে
নুনো ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল হার্টটা, ওটাকে শান্ত করার
জন্য গভীর শ্বাস টানতে হলো ওকে।

ঘাসের পাতার ফাঁকে ওর চোখ সরু একজোড়া ফাটল।

সামনে বিবস্ত্র একটা মেয়ে, ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে।
না, পুরোপুরি নগ্ন নয়। আড়াই ইঞ্চি চওড়া একটা লেনার বেল্ট
পরে আছে কোমরে, ডান নিতম্বের কাছে ঝুলছে চামড়ার খাপে
পোরা হান্টিং নাইফ। বেল্টটা তার নগ্নতাকে অস্বাভাবিক
উত্তেজক করে তুলেছে। সৈকতের ভেজা দাগ থেকে খুব বেশি
হলে পাঁচ ফুট এপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাতের কোনও একটা
জিনিসের দিকে তাকিয়ে। বিবস্ত্র হয়ে পোজ দেওয়ার শিথিল
ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, শরীরের সমস্ত ভার ডান
পায়ে চাপিয়ে দিয়ে, বাম হাঁটু একটু বাঁকা করে সামান্য ভিতর
দিকে ঘোরানো, মাথাটা একদিকে কাত করে হাতের কী যেন
পরীক্ষা করছে।

তারি সুন্দর একটা পিছন। তুক স্নান সাটিনের মত মসৃণ।
মৃদু বাঁকা শিরদাঁড়া গভীরে ডুবে আছে, ইঙ্গিত দিচ্ছে শক্তিশালী
পেশির। নিতম্ব জোড়া এমন দৃঢ় আর গোল, প্রায় ছেলেদের
মত। পা দুটো সোজা, নিখুঁত, সামান্য উঁচু হয়ে থাকা বা পায়ের
তলায় লালচে কোন আভা নেই। মেয়েটি ফর্সা, তবে বিদেশী
ট্যুরিস্ট বা শ্বেতাঙ্গিনী নয়।

তার চুলের রঙ পেঁয়াজের মত লালচে, ছোট করে কাটার
ফলে কাঁধের কাছে থেমে আছে। সবুজ একটা ডাইভিং মাস্ক
দেখা যাচ্ছে, ঠেলে কপালের উপর তোলা। সবুজ রাবারের
একটা ব্যান্ড চুলগুলোকে ঘাড়ের পিছনে আটকে রেখেছে।

গোটা দৃশ্যটা-খালি সৈকত, নীলাভ-সবুজ সাগর, মাথায়
লালচে চুল সহ নগ্ন ারী-অবাস্তব, একটা ফ্যান্টাসি বলে মনে
হলো রানার কাছে।

শয়তানের দ্বীপ

৭৯

আশ্চর্য, মেয়েটা এখানে এল কীভাবে? ওখানে দাঁড়িয়ে
করছেটা কী? সৈকতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চোখ
বুলাল রানা। এখন বুঝতে পারছে সৈকতটা ঠিক কালো নয়,
আসলে গাঢ় চকলেট-ব্রাউন। ডানদিকে সেই নদীর মুখ পর্যন্ত
দেখতে পাচ্ছে ও, সম্ভবত শ'পাঁচেক গজ দূরে। খালি সৈকত,
ছোট আকৃতির লালচে-বেগুনি কিছু জিনিস ছাড়া কোথাও কিছু
নেই। সংখ্যায় ওগুলো প্রচুর, এক ধরনের ঝিনুক হবে, গাঢ়
খয়েরি পটভূমির উপর অলঙ্কারের মত লাগছে।

বাঁ দিকে তাকাল রানা। পাথরের লম্বা প্র্যাটফর্ম বা
হেডল্যান্ডটা বিশ গজ দূরে শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, কয়েক গজ
বালিতে দাগ পড়েছে, সন্দেহ নেই ছোট একটা নৌকা টেনে
এনে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নিশ্চয়ই খুব
হালকা হবে, তা না হলে একা টেনে তুলতে পারত না। কিংবা
হয়তো মেয়েটি একা নয়।

তবে সৈকতে মাত্র একজোড়া পায়ের ছাপই দেখা যাচ্ছে।
মেয়েটি কি এই দ্বীপে বাস করে, নাকি রাতের অন্ধকারে
আকিয়াব থেকে নৌকা চালিয়ে এখানে পৌঁছেছে? একটা
মেয়ের পক্ষে অসম্ভব না? সে যাই হোক, এখানে সে করছেটা
কী?

যেন রানার প্রশ্নের উত্তরেই ডান হাতটা কিছু ছোঁড়ার
ভঙ্গিতে একবার ঝাপটাল মেয়েটি, দেখা গেল তার পাশে দশ-
পনেরোটা ঝিনুক ছড়িয়ে পড়ল। ওগুলো বেগুনি-লালচে রঙের,
রানা যেমন সৈকত জুড়ে ছড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

নিজের বাঁ হাতের দিকে তাকাল মেয়েটি, তারপর আপন
খোঁলে মৃদু শব্দে শিস দিল। নরম, মিষ্টি আওয়াজটায়
আনন্দ-ঘন একটা সুখী ভাব আছে, আছে খানিকটা বিজয়ের
উল্লাসও। তারপর খোঁয়াল করল রানা, মায়ানমারের একটা
জনপ্রিয় গানের সুর ভাঁজছে মেয়েটি। গানটির দু'একটা লাইন

জানা আছে ওর, অনুবাদটাও—

'তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই পৃথিবীর শুরু...

সেখানেই সুখ, সেখানেই প্রেম, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে...

বড় করে হাই তোলার জন্য একবার থামল মেয়েটি, মুখের
কাছে হাত তুলল। আপনমনে হাসল রানা। ঠোট জোড়া ভিজিয়ে
নিয়ে পরবর্তী দুটো লাইন স্মরণ করে শিস দিল:

'তোমার সূর্যকে মায়ানমারেই পাবে তুমি, হে সখী,

সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ ছড়িয়ে আছে এখানেই,

তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে।'

হাতটা মুখ থেকে ঝট করে বুকে নেমে এল। তার পিঠের
পেশি উত্তেজনায় নড়ে উঠল। কান পেতে শুনছে। মাথাটা,
এখনও চুলের পরদায় ঢাকা, একদিকে কাত করা।

ইতস্তত একটা ভঙ্গিতে আবার শুরু করল মেয়েটি। শিসটা
কোঁপে গেল, তারপর একেবারে বন্ধ। তার সঙ্গেই শুরু করেছিল
রানা, সেটা শুনতে পেয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি।
একজোড়া ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে নিজের শরীরটা ঢাকল না সে।
একটা হাত স্যাঁৎ করে নীচে নেমে গেল, আরেকটা বুক না ঢেকে
উঠে পড়ল মুখে-ঢেকে দিল চোখের নীচটা, এই মুহূর্তে ভয়ে
বিস্ফারিত হয়ে আছে ওগুলো। 'কে ওখানে?' আতঙ্কে অস্ফুট
কণ্ঠস্বর।

সিঁধে হলো রানা, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।
ঘাসের কিনারায় থামল ও। পাশের ঝুলে থাকা হাত দুটো ঝুলে
রেখেছে, মেয়েটি যাতে দেখতে পায় ওগুলো খালি। মন
ভোলানো হাসি দিয়ে বলল, 'কেউ না, আমি। তোমার মত
আমিও চুপিচুপি এসেছি এ-দ্বীপে। ভয় পেয়ো না।'

মুখ থেকে হাতটা নামাল মেয়েটি। বেল্টের সঙ্গে আটকানো
ছুরির খাপে পৌঁছাল ওটা। রানা দেখল ছুরির হাতলে পেঁচিয়ে
যাচ্ছে আঙুলগুলো। তার মুখের দিকে তাকাল ও। পরিষ্কার হয়ে

শেল কী কারণে হাতটা বুক না ঢেকে বাট করে মুখে উঠে গিয়েছিল।

আশ্চর্য সুন্দর একটি মুখ। কালো চোখ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। সর, ভরাট ঠোঁট। চোয়ালের রেখার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সিরিয়াস টাইপের একটি মেয়ে, নিজেকে খুব ভালভাবে রক্ষা করতে জানে। তবে অন্তত একবার, রানা ধারণা করল, নিজেকে রক্ষা করতে আংশিক ব্যর্থ হয়েছিল সে।

তার নাকটা খুব বিচ্ছিন্নভাবে ভাঙা, একজন বজ্রাঘাতের মত কাত হয়ে আছে। রাগ হলো রানার, এত সুন্দর একটা মুখ কী কারণে এভাবে নষ্ট করা হবে! আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে উন্নত স্তন জোড়া নয়, বরং এই খুঁতটাই তার লজ্জা-এখনও ওগুলো নিরাবরণ, ওর দিকে তাক করা।

কালো চোখ দুটো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে ওকে। 'কে তুমি? বিদেশী লোক, এখানে কী করছ?' ঝরঝরে ইংরেজিতে প্রশ্ন করল মেয়েটি, তবে বার্মিজ টান পরিষ্কার। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, যথেষ্ট ঝাঁঝ আছে।

'আমি একজন বাংলাদেশী। আমাকে তুমি পাখি পাগল বলতে পার।'

'ও, আচ্ছা,' মেয়েটির কথার মধ্যে সন্দেহের ভাব। হাতটা এখনও ছুরির হাতলে। 'কতক্ষণ ধরে আমাকে দেখছিলে তুমি? এখানে এলে কীভাবে?'

'মিনিট দশেক। তবে তোমার পরিচয় না জেনে আর কোন প্রশ্নের জবাব দেব না।'

'আমি বিশেষ কেউ নই। থানথামা দ্বীপ থেকে এসেছি। এটাই আমার কাজ-ঝিনুক সংগ্রহ করা।'

'আমি এখানে একটা নৌকা নিয়ে এসেছি। তুমিও?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার নৌকাটা দেখছি না কেন?'

'আমার সঙ্গে একজন বন্ধু আছে। নৌকাটাকে আমরা মানগ্রোভে লুকিয়ে রেখেছি।'

'বালিতে কোন দাগ নেই কেন?'

'আমরা সাবধানী। দাগ মুছে ফেলেছি। তোমারও মোজা উচিত ছিল।' ইঙ্গিতে পাথরের ওদিকটা দেখাল রানা। 'একটু কষ্ট করলে বিপদের আশঙ্কা কমে। তুমি কি পাল তুলে এসেছ? দুবো পাথরগুলো পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সব সময় তাই করি আমি। কেন?'

'তা হলে ওরা জানে তুমি এসেছ। ওদের রাডার আছে।'

'আমাকে কখনও ধরতে পারেনি ওরা।' ছুরির হাতল থেকে আঙুলগুলো খুলে নিল মেয়েটি। হাত তুলে ডাইভিং মাস্ক বুলল, দোলাচ্ছে সেটা। ভাবটা যেন, রানাকে তার মাপা হয়ে গেছে। গলায় আগের সেই ঝাঁঝ নেই। বলল, 'তোমার নাম কী?'

'রানা। মাসুদ রানা। তোমার?'

'টায়রা।'

'টায়রা কী?'

'ললিতা।'

হাসল রানা।

'এর মধ্যে হাসার কী আছে?'

'কিছু না। টায়রা ললিতা। সুন্দর একটা নাম।'

মেয়েটি হাসল না। 'লোকে আমাকে লোলি বলে।'

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে।'

গৎ বাঁধা বুলি শুনে এতক্ষণে যেন নিজের নগ্নতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ললিতা। লাল হয়ে উঠে অনিশ্চিত সুরে বলল, 'আমাকে কাপড় পরতে হবে।' পায়ের চারধারে ছড়িয়ে থাকা ঝিনুকের দিকে তাকাল। সন্দেহ নেই এগুলো তার তুলতে ইচ্ছে করছে। তবে হয়তো বুঝতে পেরেছে নড়াচড়া করলে শরীরের গোপনীয়তা আরও বেশি প্রকাশ হয়ে পড়বে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে

বলল, 'আমি এখনই ফিরে আসছি—ওগুলো একটাও ছোঁবে না।
মেয়েটির ছেলেমানুষি ভয় দেখে হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো
না। আমি ওগুলো পাহারা দিয়ে রাখব।'

সেইসঙ্গে নিয়ে রানার দিকে তাকাল ললিতা, তারপর
খুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল পাথরগুলোর আড়ালে।

সেইকালের উপর দিয়ে কয়েক পা এগোল রানা। ঝুঁকে একটা
ঝিনুক তুলল ও। এটা জ্যান্ত, শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছে সস্ত
মুখ। সাহসে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল ওটাকে।
জানতে পারছে, আসলেই কি এই অতি সাধারণ ঝিনুক
কুড়ানোর জন্য এখানে আসে মেয়েটি? এত ঝুঁকি নিয়ে এই কাজ
করবে কেউ? যদি থানথামা থেকেই এসে থাকে, যেতে-আসতে
প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল সাগর পাড়ি দিতে হয় তাকে। একা
একটা মেয়ের পক্ষে কাজটা অসম্ভব বলে মনে হয়।

মেয়েটির আচরণে আত্মপ্রত্যয়ী একটা ভাব আছে, সেটা
পরিষ্কার টের পাওয়া যায়: কিন্তু এ-ও বোধহয় সত্যি যে সে
অসহন বা নির্যাতনের শিকার, অন্তত ভাঙা নাকটা সেরকম
ইঙ্গিতই দেয়।

কে মেয়েটি?

বলিতে পারেন আওয়াজ। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটিকে ফিরে
আসতে দেখল রানা। পরিত্যক্ত ন্যাকড়ার মত কাপড় পরেছে
সে। অস্ত্রিন হেঁড়া, রঙবিহীন একটা শার্ট, সঙ্গে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা
দুটি স্ফটিক, ওটাকে জায়গা মত ধরে রেখেছে লেদার বেল্টটা।
কিছু থেকে ক্যানভাসের একটা ন্যাপস্যাক ঝুলতে দেখা গেল।

সেই রানার কাছাকাছি পৌঁছে বালিতে একটা হাঁটু গেড়ে
জান্না ঝিনুক কুড়াতে শুরু করল ললিতা, ন্যাপস্যাকে ভরে
রাখেছে।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কি খুব দামি?'

বালিতে বসে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল ললিতা। কী

দেখল বা বুঝল সে-ই জানে, চেহারা সস্ত্রটির ছাপ ফুটল।
'কথা দাও কাউকে বলবে না? ঈশ্বরের দিব্যি?'

'কথা দিলাম।'

'তা হলে বলা যায়—হ্যাঁ, দুর্লভ ঝিনুক এগুলো, খুব দামি।
নিখুঁত একটা মুক্তার জন্যে দশ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পেতে
পারো। এ-সব ইউরোপ-আমেরিকায় চলে যায়, বুঝলে?'

'ও।'

'আমি একজন এক্সপোর্টারকে সাপ্লাই দিই,' বলল ললিতা।
'আমার মত এত ভাল ঝিনুক তাকে আর কেউ দিতে পারে না।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'তা হলে তোমাকে আরও একটা খবর দিই।' উৎসাহে
চকচক করে উঠল ললিতার চোখ দুটো। 'এতদিন ধরে যা
খুঁজছিলাম আজ সকালে সেটা পেয়েছি আমি।'

'কী খুঁজছিলে?'

'ঝিনুকরা যেখানে থাকে, ওদের আন্তানা,' হাত তুলে
সাগরের দিকটা দেখাল ললিতা। 'তবে তুমি কিন্তু শত খুঁজলেও
দেখতে পাবে না।' হঠাৎ সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠল চোখে-
মুখে। 'শুধু যে অসম্ভব গভীরে ওটা, তা নয়, এমনভাবে লুকানো
আছে যে ভাগ্য সাহায্য না করলে আমিও দেখতে পেতাম না।
যাই হোক, আজই আমি গোটা আন্তানাটা খালি করে ফেলব।
তুমি যদি ফিরে আসো, নিখুঁত ঝিনুক একটাও পাবে না।'

হেসে ফেলল রানা। 'কথা দিচ্ছি তোমার একটা ঝিনুকও
আমি চুরি করব না। ঝিনুক সম্পর্কে আমি কিছু বুঝিও না। সত্যি
বলছি।'

সিঁধে হলো ললিতা, এখানে তার কাজ শেষ হয়ে গেছে।
'তোমার পাখির ব্যাপারটা কী? কী জাতের পাখি ওগুলো? খুব
দামি বুঝি? তুমি আমাকে জানালে আমিও কাউকে বলব না।
কথা দিচ্ছি। আমি শুধু ঝিনুক তুলি।'

শয়তানের দ্বীপ

৮৫

রানা-৩৫৫

‘ওগুলোকে রোজিয়েট স্পুনবিল বলে,’ জানাল রানা।
‘হালকা দাল রঙের এক ধরনের বক। দেখেছ কখনও?’

‘ও, ওইগুলো!’ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ললিতা। ‘এক সময়
হাজার হাজার ছিল এখানে। এখন খুব একটা দেখতে পাবে না।
ওগুলোকে ওরা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।’ সুখাসনে বসে
হাত দুটো হাঁটুর উপর রাখল সে, বিষয়টা সম্পর্কে রানার চেয়ে
বেশি জানে ধরে নিয়ে গর্বিত। এ-ও বুঝতে পারছে যে এই
লোককে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

তার কাছ থেকে এক গজ দূরে বসল রানা। তারপর ধীরে
ধীরে লম্বা করল শরীরটা, ললিতার দিকে মুখ করে কাত হয়ে
শুলো, বালিতে কনুই গোঁথে মাথাটা রাখল হাতের তালুতে।
পিকনিকের একটা পরিবেশ তৈরি করে আশ্চর্য এই সুন্দরী
মেয়েটি সম্পর্কে আরও কিছু জানার চেষ্টা করছে। ‘আচ্ছা, তাই?
কী ঘটেছিল বলো তো? কে তাড়াল?’

অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ললিতা। ‘কে আবার,
এখানকার লোকজনরা তাড়িয়েছে। তাদের পরিচয় আমার জানা
নেই। একজন রোহিঙ্গা কর্তা আছে। সে বোধহয় পাখি-টাখি
পছন্দ করে না। তার একটা ড্রাগন আছে। খেলনা নয়,
সত্যিকারের ড্রাগন। পাখিদের পেছনে ওই ড্রাগনকে লেলিয়ে
দেয়া হয়। ড্রাগনটা পাখিদের বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে। পাখিদের
দেখাশোনা করার জন্যে দু’জন লোক থাকত এখানে। তারাও
নিশ্চয়ই ওই ড্রাগনের ভয়ে ভেগেছে। কিংবা হয়তো খুনই হয়ে
গেছে।’

গোটা ব্যাপারটাই খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে ললিতা।
তথ্যগুলো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে জানাচ্ছে সে, তাকিয়ে আছে সাগরের
দিকে।

রানা বলল, ‘এই ড্রাগনটা। কী ধরনের ড্রাগন ওটা? ওটাকে
তুমি দেখেছ?’

‘হ্যাঁ, দেখেছি।’ চোখ কুঁচকে সরু করল ললিতা, মুখটা
এমনভাবে বিকৃত করল যেন তেতো ওষুধ গিলছেন। ‘এখানে
আমি বছরখানেক হলো আসছি-ঝিনুকের আশায়, জায়গাটা ঘুরে
ফিরে দেখার জন্যেও। এগুলো,’ হাত তুলে সৈকতে ছড়িয়ে থাকা
ঝিনুক দেখাল, ‘আমি মাসখানেক আগে পেয়েছি, শেষবার
এসে। তবে অন্য জায়গাতেও ভাল ঝিনুক পেয়েছি। বুদ্ধ
পূর্ণিমার দিন ভাবলাম নদীর ওদিকটায় একবার যাওয়া দরকার।
তো গেলাম। একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত। ওখানেই ছিল লোক
দু’জনের ক্যাম্প, যারা পাখিদের দেখাশোনা করত। পেলাম
সেটা, তবে দেখলাম পুড়িয়ে সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা
হয়েছে।’

‘অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, ভাবলাম ভোর পর্যন্ত এখানেই
থাকি। গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ড্রাগনটা
আসছে। আমার কাছ থেকে মাত্র ষাট-সত্তর গজ দূরে পৌঁছে
গেছে ততক্ষণে। ওটার প্রকাণ্ড চোখ দুটো জ্বলছিল, নাকের
জায়গায় লম্বা একটা শুঁড়। ডানা দুটো খাটো, লেজটা ক্রমশ
সরু। ওটার রঙ কালো আর সোনালি।’ রানার মুখের ভাব লক্ষ
করে ভুরু কঁচকাল সে। ‘আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। ওটাকে
আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল।
গর্জনের মত আওয়াজ করছিল ওটা। জলায় নেমে যেতে
দেখলাম। সামনে গড়ল ঘন ম্যানগ্রোভ-এর পাঁচিল। সেই
ঝোপের ওপর দিয়ে অনায়াসে এগোল। এক ঝাঁক পাখি পড়ল
সামনে।’

‘হঠাৎ দেখি কী, ওটার মুখ থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে
এল। অসংখ্য পাখি পুড়ে মরল। শুধু তাই নয়, ওদিকের
যতগুলো গাছে ওই পাখি ছিল, এক এক করে সবগুলো গাছে
আগুন ছুঁড়ল ড্রাগনটা। সমস্ত পাখির বাসা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এমন সাংঘাতিক ব্যাপার আগে কখনও

দেখিনি আমি।

বসার ভঙ্গিটা আবার বদল করল ললিতা; হাঁটু দুটো ভাঁজ করে বালিতে ঠেকাল, পায়ের পাতায় নিতম্ব রেখে বসল, তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। 'বুঝতে পারছি, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না,' রেগে উঠে বলল সে, কণ্ঠস্বরে উদ্বেজনা। 'শহরের লোকেরা এমনই হয়। তোমরা সবকিছুই অবিশ্বাস করো। ধাত!' মুখ বাঁকাল।

রানা তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল। 'দেখো, লোলি, ড্রাগন বলে আসলে কোথাও কিছু নেই। তুমি যেটা দেখেছ সেটা ড্রাগনের মত দেখতে অন্য কিছু। আমি ভাবছি কী হতে পারে জিনিসটা।'

'তুমি কী করে জানলে ড্রাগন বলে কিছু নেই?' এবার রানা ললিতাকে সত্যি খেপিয়ে দিয়েছে। 'দ্বীপের এদিকটায় কেউ বসবাস করে না। অথচ অনায়াসে তা সম্ভব ছিল। বসবাস করে না, তার কারণ ওই ড্রাগন! সে যাই হোক, প্রাণী আর ওই সব সম্পর্কে কী ছাই জানো তুমি, গুনি?

'আমি সেই ছোটবেলা থেকে সাপ আর ব্যাঙদের সঙ্গে বাস করছি। একা। কখনও দেখেছ প্রেইং ম্যানটিস নামে একধরনের স্ত্রী-পোকা প্রেম করার পর তার স্বামীকে খেয়ে ফেলে? কিংবা নাচতে দেখেছ কোন বেজি বা অক্টোপাসকে? বলতে পারবে একটা হামিং বার্ডের জিভ কতটুকু লম্বা? তোমার কাছে পোষা কোন সাপ আছে, গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজিয়ে ঘুম ভাঙায়? এমন কাঁকড়া বিছে দেখেছ, রোদের প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে না পেরে নিজের হুল নিজেকে বিধিয়ে আত্মহত্যা করে? সাগরের তলায়, রাতে, ফুলের কার্পেট দেখেছ?' প্রতিটি প্রশ্ন কাঁঝের সঙ্গে করা হলো। দম ফুরিয়ে যাওয়ায় থামল সে। তারপর হতাশ একটা ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে খেদ প্রকাশ করল। 'দূর, আমিও যেমন! এ-সব আমি কাকে জিজ্ঞেস করছি? না, একজন শহুরে বাবুকে!'

রানা বলল, 'স্বীকার করছি, অনেক কিছু জানো তুমি। আমি শহুরে বাস করি, এটা তো আমার দোষ নয়। তোমার এ-সব ব্যাপার আমিও জানতে চাই। এতদিন জানিনি...সুযোগ ছিল না। তার বদলে অন্য অনেক কিছু জানি আমি। যেমন...' মনে মনে খুঁজছে রানা। কিন্তু ললিতার আগ্রহ জন্মাবে এমন কিছুই কথা এই মুহূর্তে ওর মাথায় আসছে না। অগত্যা এভাবে কথাটা শেষ করতে চেষ্টা করল, 'যেমন ধরো, ওই রোহিঙ্গা লোকটা এবার তোমার ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখাবে। এবার সে চেষ্টা করবে তুমি যাতে দ্বীপ ছেড়ে ফিরে যেতে না পার। একা শুধু তোমাকে নয়, আমাদেরকেও আটকে রাখতে চাইবে।'

চোখে কৌতূহল নিয়ে ঘাড় ফেরাল ললিতা। 'ওহ, তাই? তবে এটা কোন ব্যাপার নয়। দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে যায়, রাতের অন্ধকারে ফিরে যাওয়াও কোন সমস্যা নয়। আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল সে, এমনকী একটা প্রেনও পাঠিয়েছিল। কিন্তু নাগাল পায়নি।' রানার দিকে নতুন আগ্রহ নিয়ে তাকাল সে। 'তুমি কি...মানে, তার পিছনে লেগেছ?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পার,' বলল রানা। 'আমরা প্রায় দু'মাইল দূরে থাকতেই পালটা নামিয়ে নিয়েছিলাম, কাজেই ওদের রাডারে ধরা পড়িনি। তবে ওই রোহিঙ্গা লোকটা সন্দেহ করছে আমি আসতে পারি। তোমার পাল তার রাডারে ধরা পড়েছে, ফলে তোমার নৌকাটাকে আমার নৌকা বলে ধরে নেবে সে।'

'এখন তা হলে কী হবে?' জানতে চাইল ললিতা।

'আমি বরং আমার বন্ধুর ঘুম ভাঙিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করি। তাকে তোমার খারাপ লাগবে না। চেনুবা দ্বীপের লোক সে, নাম হলো ইয়ে হোয়ে।'

'আমি যদি বিপদ ডেকে এনে থাকি, দুঃখিত,' খানিক ইতস্তত করার পর বলল ললিতা। 'কী করে জানব বলো...' রানার মুখে তন্ময়তা চালাচ্ছে।

অভয় দিয়ে হাসল রানা। 'এটা শ্রেয় দুর্ভাগ্য, আর কিছু না। নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে ঝিনুক কুড়াতে আসে, এতে কিছু মনে করে না সে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার বালিতে তোমার পায়ের ছাপ বা এই ধরনের আরও অনেক কু দেখেছে সে। গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আমার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।'

'তোমার কী করবে সে?'

'সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরার চেষ্টা করবে আমাদের। ভয় হচ্ছে, আমার সঙ্গে তুমিও না তার জালে আটকা পড়ে যাও। তবে দেখা যাক,' অভয় দিয়ে হাসল রানা, 'ইয়ে হোয়ের কী বলার আছে। এখান থেকে নোড়ো না তুমি।'

সিধে হলো রানা। হেঁটে পাথরের লম্বা প্র্যাটফর্ম, অর্থাৎ হেডল্যান্ডের কাছে চলে এসে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে। নিজেকে ভালভাবেই লুকিয়ে রেখেছে হোয়ে। রানার তাকে খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল। বড় আকারের একজোড়া বোন্ডারের মাঝখানে ঘাসে ছাওয়া একটা অগভীর গর্তে শুয়ে ঘুমাচ্ছে সে, শরীরের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছে সৈকতে ভেসে আসা চওড়া একটা কাঠের টুকরো দিয়ে।

একবার ডাকতেই ঘুম থেকে জেগে উঠল হোয়ে। রানাকে দেখে উঠে বসল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। 'মর্নিং, কর্নেল বস্,' বলল সে। 'দুঃখিত, ঘুমটা অনেক বেশি লম্বা হয়ে গেল।'

তার পাশে বসে ললিতার কথাটা জানাল রানা। সবশেষে বলল, 'এগারোটা বাজে। নতুন একটা প্ল্যান দরকার আমাদের।'

মাথা চুলকাল হোয়ে। রানার দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'আপনি কর্নেল বস্ মেয়েটার দায়িত্ব নেয়ার কথা ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল, একটু যেন অবাক হয়েছে। 'ভেবে দেখুন, আমাদের কেউ নয় সে...' হঠাৎ থেমে গেল। মাথাটা ঘুরে গেল, কুকুরের মত লম্বা করল গলা। একটা হাত শূন্যে তুলে নিষেধ

করল শব্দ করতে।

দম আটকাল রানা। দূরে, পূর্বদিকে, যেন অস্পষ্ট একটা শুভ্র তৈরি হচ্ছে।

লাফ দিয়ে দাঁড়াল হোয়ে। 'জলদি, কর্নেল বস্!' তাগাদার সুরে বলল সে। 'ওরা আসছে!'

আট

দশ মিনিট পর সৈকতটা খালি আর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাতিল করে দেওয়া ঝিনুকের স্তূপ বা পায়ের ছাপ অদৃশ্য হয়ে গেছে। ম্যানগ্রোভের শাখা কেটে বালির উপরটা ঝাঁট দিয়েছে হোয়ে পিছু হটে। কাজটা খুব সাবধানে করতে হয়েছে তাকে, তা না হলে পায়ের দাগ মুছলেও, ঝাঁটার দাগ থেকে যেত। ললিতার নৌকাটা আরও খানিক উপরে তুলে পাথরের মাঝখানে লুকিয়ে রাখা হলো, ঢাকা হয়েছে সামুদ্রিক আগাছা আর ভেসে আসা ডালপালা দিয়ে।

হেডল্যান্ডে ফিরে গেছে হোয়ে। কয়েক ফুট ব্যবধান রেখে শুয়ে আছে রানা আর ললিতা, রাতে যেখানে ঘুমিয়েছিল রানা। দু'জনেই হেডল্যান্ডের বাঁকটার দিকে তাকিয়ে আছে, বোটটা যেদিক থেকে আসবে।

এখনও সম্ভবত সিকি মাইল দূরে বোটটা। জোড়া ডিজেল ইঞ্জিনের ধীরগতি পালস অনুভব করে রানা আন্দাজ করল ওদের খোঁজে উপকূল রেখার প্রতিটি গলি-ঘাঁজিতে তন্নাশী চালানো হচ্ছে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল অত্যন্ত শক্তিশালী একটা বোট

ওটা। বোধহয় বড় আকৃতির একটা কেবিন ক্রুজার। ক'জন ক্রু হবে? তল্লাশীর নেতৃত্বে কে থাকবে? ডক্টর গজনবি? মনে হয় না। এ-ধরনের পুলিশী কাজে নিজেকে সে জড়াবে না।

পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাঁক করমরান্টকে আসতে দেখা গেল, প্রবাল প্রাচীরের ওদিক থেকে প্রায় সাগর ছুঁয়ে উড়ে আসছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। দ্বীপের আরেক প্রান্তের গোয়ানো কলোনির এটাই প্রথম প্রমাণ দেখতে পেল ও। কর্নেল চাও পারায়ার বর্ণনা অনুসারে এগুলো স্কাউট, পানির সারফেসের কাছে অ্যানচাভি মাছের রূপালি ঝলক খুঁজতে এসেছে।

ঠিক তাই, রানার চোখের সামনেই পাখিগুলো শূন্যে স্থির হলো, কয়েকটা পিছিয়েও গেল, তারপর ডাইভ দিল পানিতে, শ্র্যাপনেল-এর মত ছিন্নভিন্ন করছে পানির সারফেস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় একটা ঝাঁক উদয় হলো পশ্চিমের আকাশে, তারপর আরেকটা, তারপর একের পর এক অসংখ্য। ঝাঁকগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যাওয়ায় দীর্ঘ একটা মোটা রেখা তৈরি হলো আকাশের গায়ে। সেই মোটা রেখা চওড়া হতে হতে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কাইলাইন ঢেকে ফেলার উপক্রম করল। এক সময় অন্ধকার হয়ে গেল ওদিকের আকাশটা।

তারপর পানিতে নামল ওগুলো। গলা ফাটাচ্ছে, মাথা ডোবাচ্ছে সারফেসের নীচে, ঠোঁট দিয়ে অ্যানচাভির তৈরি নিরেট ময়দান থেকে ফসল তুলছে, যেন ডুবন্ত একটা ঘোড়াকে সাবাড় করছে এক ঝাঁক পিরানহা মাছ।

রানার গায়ে নরম একটা খোঁচা দিল মেয়েটি। রানা তাকাতে মাথা তাক করে সাগরের দিকটা দেখাল। 'রোহিঙ্গা লোকটার মুরগীগুলো মাছ গিলছে।'

সুখী, সুন্দর মুখটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। সার্চ পার্টি আসছে, অথচ মেয়েটির মধ্যে কোন উদ্বেগ আছে বলে মনে হলো না।

তার কাছে এটা একটা লুকোচুরি খেলা, আগে যেমন খেলেছে। রানা আশা করল বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে ললিতা না অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ডিজেলের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, আঘাত করছে স্নায়ুতে। বোটটা নিশ্চয়ই হেডল্যান্ডের ঠিক পিছনে পৌঁছে গেছে। শেষ একবার শান্ত বে-র চারদিকটা দেখে নিল রানা, তারপর ঘাসের ফাঁক দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল প্রবাল প্রাচীরের ভিতর হেডল্যান্ডের বাকি।

সাদা বো-র চোখা নাকটা দেখা দিল। তার পিছু নিয়ে পালিশ করা দশ গজ খালি ডেক, কাঁচ ঢাকা উইন্ডশিল্ড, নিচু একটা কেবিন-সাইরেন আর ভোঁতা রেডিও মাস্টসহ-ভিতরে হুইলে দাঁড়ানো ঝাপসা এক লোক, সবশেষে লম্বা সমতল স্টার্ন আর নেতিয়ে পড়া লাল একটা পতাকা।

স্টার্নে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোকের দিকে ছুটে গেল রানার দৃষ্টি। দু'জনেরই অল্প অল্প ছাগলদাড়ি রয়েছে, মাথায় খুলি কামড়ানো টুপি। দেখেই বোঝা যায় বার্মিজ রোহিঙ্গা। খাকি হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরে আছে। কোমরে চওড়া বেল্ট দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা, ঢেউগুলো ছোট হওয়ায় ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু ধরতে হয়নি।

ওদের একজনের হাতে কালো লম্বা একটা লাউড-হেইলার দেখা যাচ্ছে, জোড়া লাগানো তারসহ। অপর লোকটা তেপায়ায় বসানো একটা মেশিনগানে ডিউটি দিচ্ছে।

প্রথম লোকটা হাতের লাউড-হেইলার ছেড়ে দিল, ফলে গলায় পরা স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলতে থাকল ওটা। একটা বিনকিউলার তুলে নিয়ে চোখে ঠেকাল সে, ভাব দেখে মনে হলো ইঞ্চি ইঞ্চি করে তল্লাশী চালাচ্ছে সৈকতে।

লোকটা হেডল্যান্ডের উপর তাক করল বিনকিউলার। তারপর সরিয়ে নিল। ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে নিজেদের

মধ্যে দ্রুত কথা বলছে তারা। এক সময় প্রথম লোকটা তার বিনকিউলার ধরিয়ে দিল গানারের হাতে। সৈকত আর হেতল্যাভে একবার চোখ বুলিয়েই ওটা ফিরিয়ে দিল গানার।

এরপর প্রথম লোকটা চিৎকার করে হেলমসম্যানকে কী যেন বলল। খেমে গেল কেবিন ক্রুজার, তারপর পিছু হটতে শুরু করল।

এরপর ওটা প্রবল প্রাচীরের বাইরে, ঠিক রানা আর ললিতার সামনে স্থির হলো। প্রথম লোকটা, সে-ই বোধহয় সার্চ পার্টির লিডার, আবার বিনকিউলার তুলল চোখে। কয়েকটা পাখরের দিকে তাক করল ওটা, যেখানে ললিতার নৌকাটা লুকানো আছে। উত্তেজিত চেষ্টামেচির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল। আবার বিনকিউলারটা ধরিয়ে দেওয়া হলো গানারের হাতে। এবার চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল দ্বিতীয় লোকটা।

রানা ভাবল, অবস্থা বেগতিক! লোকগুলোকে যতই আনাড়ী দেখাক, নিজেদের কাজে অত্যন্ত দক্ষ তারা।

মেশিন গান লোভ করার জন্য বোল্ট টেনে পিছিয়ে আনল গানার। ভিজেলের আওয়াজকে ছাপিয়ে একজোড়া ক্লিক শব্দ পরিষ্কার ভেসে এল রানার কানে।

লাউড-হেইলার উঁচু করে সুইচ অন করল লিডার। মাউথপিসে টোকা মারায় যান্ত্রিক কর্কশ আওয়াজটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠল কানে। লিডারের কর্ণস্বর গর্জন হয়ে বেরিয়ে এল লাউড-হেইলার থেকে।

‘ঠিক আছে, ভায়েরা! বেরিয়ে এসো তোমরা। কাউকে জখম করা হবে না।’

একজন শিক্ষিত লোকের মার্জিত কর্ণস্বর। ভাষাটা ইংরেজি, তবে বার্মিজ টান আছে। একটু পর বার্মিজ ভাষায় একই নির্দেশ দেওয়া হলো।

এক মিনিট বিরতি। তারপর আবার মুখ খুলল লিডার। ‘কী

হলো, ভায়েরা?’ প্রতিটি শব্দ বজ্রপাতের মত ধাক্কা দিচ্ছে কানে। ‘তাড়াতাড়ি করো! আমরা দেখেছি কোথায় তোমরা তীরে উঠেছ। ডালপালার নীচে লুকানো নৌকাটাও কোথায় রয়েছে জানি। আমরা বোকা নই, তোমাদেরকেও বোকা বানাচ্ছি না। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও। স্রেফ মাথার ওপর হাত তুলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো। তোমাদের কোন ক্ষতি করা হবে না।’

নীরবতা নেমে এল। ঢেউগুলো শান্ত একটা নরম ভঙ্গিতে সৈকতে ভেঙে পড়ছে। মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনে পাচ্ছে রানা। করমরান্ট পাখিদের কর্কশ কোলাহল মাইলখানেক দূরের সাগর থেকে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে ওদের কানে।

হাত বাড়িয়ে ললিতার আঙ্গিন ধরে টান দিল রানা। ‘কাছে এসো,’ ফিসফিস করল ও। ‘ওদের টার্গেট ছোট করে দিই।’ কাছে সরে আসতে ললিতার শরীরের উষ্ণতা অনুভব করল। তার মুখ ঘষা খেল ওর হাতে। ফিসফিস করল ও, ‘যতটা পার বালিতে সঁধিয়ে যাও। নড়াচড়া করো।’ ভেবে থাকা জায়গাটার মাঝখানে গর্ত করে যতটা পারা যায় নিজেও সঁধিয়ে যাচ্ছে। অনুভব করল দেখাদেখি ললিতাও তাই করছে।

শ্বাসের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। এই মুহূর্তে ওর চোখ সৈকতের সঙ্গে প্রায় একই লেভেলে।

লিডার লোকটা আবার তার লাউড-হেইলার তুলছে। কান ফাটানো আওয়াজ ভেসে এল। ‘ঠিক আছে! এবার প্রমাণ দিই এটা কোনও ছেলেখেলা নয়।’ বুড়ো আঙুলটা খাড়া করল সে।

মেশিন গানার তার অস্ত্র ঘোরাল সৈকতের পিছনে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানগ্রোভ ঝোপের মাথা লক্ষ্য করে। দ্রুতগতি কর্কশ আওয়াজ হলো, যেন টিনের বাজের শব্দ কিছু ভরে প্রবল বেগে ঝাঁকানো হচ্ছে। কয়েক ঝাঁক বুলেট ছুটল, তারপর আবার নীরব হয়ে গেল পরিবেশ।

শয়তানের দ্বীপ

দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। কন্ঠের ঝাঁক পানি ছেড়ে উঠে পড়ছে। বোধহয় লাখ ছাড়িয়ে যাবে। ওদিকের গোটা আকাশ কালো হয়ে গেল। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বোটের দিকে তাকাল রানা। অজ্ঞের গা গরম হয়ে উঠেছে কিনা দেখার জন্য হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছে গানার। দু'জনে কিছুক্ষণ আলাপ করল তারা। তারপর আবার মুখের সামনে লাউড-হেইলার তুলল লিডার।

'ঠিক আছে!' কর্কশ কণ্ঠে হুমকি দিল সে। 'তোমাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে। এবার সামলাও।'

মেশিন গানের লম্বা নল ঘুরতে আর নিচু হতে দেখল রানা। পাথরের মাঝখানে লুকানো নৌকাটাকে প্রথমে টার্গেট করতে যাচ্ছে গানার।

ললিতার কানের কাছে ফিসফিস করল রানা, 'ঠিক আছে, লোলি। ভয় পেয়ো না। নিচু হয়ে থাকো। শুরু হতে না হতে থেমে যাবে।' অনুভব করল ওর বাহু ধরে মৃদু চাপ দিল মেয়েটি। রানা ভাবল, বেচারির কপাল খারাপ, আমার কারণে বিপদে পড়েছে। ডান দিকে কাত হলো ললিতার মাথাটাকে আড়াল দেওয়ার জন্য। তারপর নিজের মুখ বালিতে নামিয়ে আনল।

এবার মেশিন গানের একটানা বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিল ওদেরকে। বুলেটগুলো হেডল্যান্ডের এক কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাথরের ভাঙা টুকরো ঝাঁক ঝাঁক মৌমাছির মত চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করল।

তারপর বিরতি। নতুন ম্যাগাজিন, ভাবল রানা। এবার আমাদেরকে। অনুভব করল মেয়েটি ওকে দু'হাত দিয়ে যতটা পারা যায় শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে। ওর পাঁজরের সঙ্গে সঁটে থাকা নরম শরীর থরথর করে কাঁপছে। একটা হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের আরও কাছে টেনে নিল রানা।

আবার গর্জে উঠল মেশিন গান। বুলেটের প্রথম ঝাঁকটা পড়ল সৈকতে, পানির দাগে। তারপর একটা পথ ধরে উঠে আসছে ওদের দিকে। রানা টের পেল মাথার উপর ঝোপের শাখাগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে মনে হলো ইলেকট্রিক করাত দিয়ে ঝোপগুলোকে কেটে সহস্র টুকরো করা হচ্ছে। টুকরোগুলো নেমে এসে ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলেছে ওদেরকে।

খানিক পর আগের চেয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাস নিল রানা। এর মানে, খোলা জায়গায় শুয়ে রয়েছে ওরা। ওদের চারপাশে একটা ঝোপও দাঁড়িয়ে নেই। পাতা আর ভাঙা ডালপালা ওদেরকে কি পুরোপুরি ঢাকতে পেরেছে? বুলেটগুলো তটরেখা ধরে মার্চ করেছে, দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে আওয়াজটা থেমে গেল।

নীরবতা যেন বাদ্য বাজাচ্ছে। নরম সুরে ফোঁপাচ্ছে মেয়েটি। আশ্বাস দিয়ে তাকে আরও শক্ত করে ধরে রাখল রানা। লাউড-হেইলার আবার বিস্ফোরিত হলো। 'এখনও যদি তোমাদের কান বলে কিছু থেকে থাকে তা হলে শোনো। তোমাদের হাড়-মাংসের টুকরো কুড়োবার জন্যে আসছি আমরা। দুঃসংবাদ হলো, সঙ্গে কুকুর থাকবে। আপাতত বিদায়।'

ডিজেলের অলস আওয়াজ দ্রুত হলো। শরীরের উপর খসে পড়া পাতার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রানা দেখল ঘুরে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে কেবিন ক্রুজার। কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

সাবধানে মাথা তুলল রানা। বে সম্পূর্ণ খালি, সৈকতে কোন দাগ পড়েনি। সব আগের মতই আছে, বাতাসে শুধু বারুদ আর বিস্ফোরিত পাথরের কটু গন্ধ ভেসে আছে।

ললিতাকে টেনে দাঁড় করাল রানা। চোখের পানি দাগ ফেলেছে তার গালে। রানার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে

সে, ফল, 'কী সাংঘাতিক! এ-ধরনের একটা কাজ কেন করা
হবে? আমরা মারা যেতে পারতাম!'

রানা ভাবল, নিজেকে ললিতা সব সময় রক্ষা করে এসেছে
বাঁটে, তবে সেটা প্রকৃতির হাত থেকে। 'ওরা লোক ভাল নয়,
লোলি' বলল ও। 'চিন্তা করো না, কেউ আমাদের কোন ক্ষতি
করতে পারবে না। এসো, হোয়ের সঙ্গে বসে একটা গ্যান তৈরি
করি। তা ছাড়া, বাওয়ারও সময় হয়েছে। এখানে এক
সংস্কৃত কী বাও তুমি?'

সৈকত ধরে হেডল্যান্ডের দিকে এগোল ওরা। প্রায় মিনিট
খানেক পর ললিতা বলল, 'ওহ, বাবার এখানে প্রচুর। বিশেষ
করত সি আর্টিন-এর কোন অভাব নেই। বুনো কলা, পেয়ারা আর
জাম পাবে। এখানে আসার আগে দুই দিন কেবল খেয়েছি আর
কুমিরেরি আমি, কাজেই আমার কিছু দরকার নেই।'

কাজে আরও কাছে টেনে নিল রানা। তবে স্টাইলাইনে
সেয়ারের সেবা যেতে হাতটা নামিয়ে নিল ও। হামাগুড়ি দিয়ে
পায়ের উপর থেকে নেমে এল হোয়ে। থেমে নীচের দিকে
জানাল সে। ওরা দু'জন তার কাছে এসে দাঁড়াল।

ললিতার নৌকাটা ভেঙে প্রায় দুটুকরো হয়ে গেছে। দেখে
সৈকতের উদ্ভাস সে। ঝট করে রানার দিকে ফিরল। 'আমার
নৌকা! আমি ফিরব কীভাবে?'

'চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম,' বলল হোয়ে, আন্দাজ করছে
এই নৌকাটার তার একমাত্র সম্বল বা পুঁজি ছিল। 'আমার কর্নেল
বস আপনাকে আরেকটির ব্যবস্থা করে দেবেন।' রানার দিকে
জানাল সে। 'আমাদের নৌকা-ঠিক আছে, কর্নেল বস। কিন্তু
লোকগুলো সত্যিকারের দিগম। ওরা ভোবারমান পিনশার নিয়ে
আসছে। বিদ্রোহী আকারের বাস্‌টার্ড। বিশটার মতো। জরুরি গ্যান
সংস্কৃত, কর্নেল বস।'

'ইয়া, গ্যান সংস্কৃত। তবে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি না। দীপটা
রানা-৩৫৫

দেখতে এসেছি, না দেখে ফিরব না। ললিতা আমাদের সঙ্গেই
থাকবে।' তার দিকে তাকাল রানা। 'কী বলো, লোলি? আমাদের
সঙ্গে নিরাপদে থাকবে তুমি। তারপর একসঙ্গে ফিরব আমরা।'

চোখে সংশয় নিয়ে রানার দিকে তাকাল ললিতা। 'আর তো
কোন উপায়ও নেই। কিন্তু লোকগুলো ভাল নয়। পাখি দেখতে
কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'বেশিক্ষণ না। আমাকে শুধু জানতে হবে কী হয়েছিল
ওদের, কেন।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বারোটা বাজে। তুমি
এখানে অপেক্ষা করো। গোসল বা যা খুশি করো। শুধু হাঁটাইটি
করে চারদিকে পায়ের ছাপ ফেলো না। এসো, হোয়ে,
নৌকাটাকে লুকিয়ে ফেলি।'

তৈরি হতে একটা বেজে গেল। ম্যানগ্রোভের ঝোপের
ভিতর ছোট একটা ডোবা দেখতে পেয়ে নৌকাটাকে তাতে
নামাল ওরা, তারপর পাথর ভরে ডুবিয়ে দিল। চারদিকে এত
বেশি পাতা পড়ে আছে, পায়ের ছাপ খুব কমই পড়ল, সেগুলোও
যত্ন করে মুছে ফেলা হলো। তারপর যেতে বসল ওরা। ললিতাও
খেল, তবে অনিচ্ছাসঙ্কেত।

খাওয়া শেষ হতে হেডল্যান্ড টপকে জলার অগভীর পানিতে
নামল ওরা, ওখান থেকে হেঁটে রওনা হলো, গম্ভাব্য নদীটার মুখ,
সৈকত থেকে তিনশো গজ দূরে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত পরিবেশ। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হঠাৎ
রীতিমত কর্কশ বাতাস ছেড়েছে। হোয়ের কথা অনুসারে এদিকে
এই বাতাস নাকি প্রতিদিন সারা বছরই বয়। গোয়ানো শুকাতে
কাজে লাগে। সাগরে রোদের প্রতিফলন আর ম্যানগ্রোভের
চকচকে সবুজ পাতা ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

নদীর মুখের কাছে বালির একটা দেয়াল আছে, ওপারে স্থির
পানি। একটা পুকুরই বলা যায়। তাতে নামল ওরা-সামনে
থাকল হোয়ে, তারপর রানা, সবশেষে ললিতা। রানার কোমর

শয়তানের দীপ

করত হবে গেল। দু'হাত দূরে বড় একটা রূপালি মাছ লাগ
করে শূন্য উঠল, তারপর পানি ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'হাতী ক্রমশ সরু হয়ে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলকে ছুঁয়েছে।
কেন কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা একটা টানেলের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা।
তারপর দেখা গেল টানেলটা নদীর সঙ্গে মিশেছে। সামনে চওড়া
হয়ে গেছে নদী, মাঝখানের স্রোতটা বেশ দ্রুতই বইছে।
সরসিকে ম্যানগ্রোভ ঝোপের কাণ্ড দেখা যাচ্ছে, মাকড়সার
পায়ের মত।

ওদের পায়ের তলায় নরম কাদা। পলিতে কয়েক ইঞ্চি ডুবে
যাচ্ছে পা। দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে চিংড়ি আর ছোট
ছোট মাছেরা। খানিক পর পর ঝুঁকে জোঁক ছাড়াতে হচ্ছে,
ভালভাবে কামড়ে ধরার আগেই। তবে গায়ে এতটুকু রোদ
লাগছে না।

সাগর থেকে দূরে সরে আসায়, একটু পরেই, জলাভূমিতে
জমে থাকা গ্যাসের উৎকট গন্ধ পেল ওরা। রাজ্যের মশা আর
মাছিও এবার খুঁজে নিচ্ছে ওদেরকে।

ম্যানগ্রোভ জঙ্গল হালকা হয়ে এল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে
খুলে যাচ্ছে নদীটা। পানির গভীরতা বাড়ছে, তলা হয়ে উঠছে
ক্রমশ শক্ত। খানিক পর একটা বাঁকের কাছে পৌঁছাল ওরা।
রানাকে সাবধান করে দিয়ে ললিতা বলল, 'সামনেটা একদম
ফাঁকা, অনেক দূর থেকে আমাদেরকে দেখতে পাওয়া যাবে-প্রায়
এক মাইল। তারপর নদী সরু হয়ে লেকে মিশেছে। এরপর
একটা স্যান্ডপিট আছে, ওখানেই পাখির পাহারাদার দুজন।'

ম্যানগ্রোভের তৈরি টানেলের ছায়ায় থেমে দূরে তাকাল
ওরা। নদীটা ধীরগতিতে দ্বীপের ভিতর দিকে এগিয়েছে। দুই
তীরে বাঁশ ঝাড় আর ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল থাকলেও তাতে
হয়তো আংশিক আড়াল পাওয়া যাবে। নদীর পশ্চিম তীর ক্রমশ
উঁচু হয়ে উঠে গেছে, মাইল দুয়েক দূরে একটা চূড়া দেখা

যাচ্ছে। ওটাই গোয়ানো খনি।

পাহাড়টার গোড়া ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু পাকা-আধপাকা
ঘর-বাড়ি। বিশাল হ্যাঙ্গার আকৃতির একটা কাঠামো রয়েছে এক
পাশে, ওটার ডান দিকে মুখ ব্যাদান করে আছে প্রকাণ্ড একটা
গুহামুখ-প্রাকৃতিক বলে মনে হলো না রানার। সরু একটা
আঁকাবাঁকা রূপালি রেখা পাহাড়ের গা থেকে ঘর-বাড়িগুলোর
দিকে নেমে এসেছে-একটা রেলওয়ে ট্র্যাক, আন্দাজ করল
রানা-খনন করা জায়গা থেকে ক্র্যাশার আর সেপারেটরে
গোয়ানো নিয়ে আসার জন্য। পাহাড়ের চূড়া সাদা, যেন বরফ
জমেছে। চূড়া থেকে ধোঁয়াটে পতাকার মত মিহি গোয়ানো ধুলো
উড়ছে। সাদার গায়ে কালো বিন্দুর মত করমরান্ট পাখিগুলোকে
দেখতে, পাচ্ছে রানা। ওগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নীচে নামছে আর
শূন্যে উঠছে, ঠিক একটা মৌচাকের মৌমাছিদের মত।

পাখির বিষ্ঠা দিয়ে তৈরি পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থাকল
ওরা। রানা ভাবল, ওটাই তা হলে ডক্টর থাকিন গজনবির রাজ্য।
ওর মনে হলো, এরকম জঘন্য একটা জায়গা জীবনে দেখেনি
কখনও।

নদী আর পাহাড়ের মাঝখানের জমিনটা পরীক্ষা করল রানা।
প্রবাল দিয়েই তৈরি দ্বীপটা। ঝোপগুলো এদিকে নিচু। কিছু
নারকেল গাছ আছে। সন্দেহ নেই পাহাড়ের ওদিক থেকে একটা
রাস্তা নেমে এসেছে, দ্বীপের মাঝখানের লেক আর জলাভূমির
নাগাল পাওয়ার জন্য। তা না হলে জায়গাটা পেরিয়ে পাহাড়ের
ওদিকে আসা-যাওয়া করা ভারি কষ্টকর হয়ে উঠবে। রানা লক্ষ
করল সমস্ত ঝোপ আর গাছপালা পশ্চিম দিকে নুয়ে বা বেঁকে
আছে। ও কল্পনা করতে চেষ্টা করল, বছর জুড়ে সারাক্ষণ প্রচণ্ড
বাতাস, জলাভূমি থেকে উঠে আসা গ্যাস আর গোয়ানোর উৎকট
দুর্গন্ধ সহ্য করে এখানে বাস করতে কেমন লেগেছে ওদের।

পূর্ব দিকে তাকাল রানা। জলাভূমিতে ঘন হয়ে জন্মানো

ম্যানগ্রোভের জঙ্গলটা পরিবেশ হিসাবে যেন অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। নিরেট সবুজ কার্পেটের মত, যতদূর দৃষ্টি যায়। শেষ মাথায় ঝাঁক ঝাঁক পাখি লাফিয়ে উঠছে আকাশে, নামছে আবার লাফিয়ে উঠছে। ওগুলোর একটানা চিৎকার এত দূরেও বয়ে আনছে জোরাল বাতাস।

হোয়ের কণ্ঠস্বর রানার চিন্তায় বাধা দিল। 'ওরা আসছে, কর্নেল বন্স।'

হোয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করল রানা। দুটো বাড়ির মাঝখান থেকে বড় একটা ট্রাক রওনা হয়েছে, গতি এত বেশি যে ওটার পিছনে আলোড়িত ধুলোর একটা মেঘ তৈরি হয়েছে। রানার দৃষ্টি দশ মিনিট অনুসরণ করল ওটাকে, তারপর নদীর মাথার কাছে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে হারিয়ে যেতে দেখল। কান পাতাল ও বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে একদল কুকুরের অনবরত ডাক।

'ওরা জানে, কর্নেল বন্স, নদী ছাড়া আমাদের লুকাবার জায়গা নেই,' বলল হোয়ে। 'মানে, যদি বেঁচে থাকি আর কী!'

'ওরা নদীতেও তল্লাশী চালাবে,' বলল ললিতা। 'আমার কেলারও চালিয়েছিল, তবে সেটা কোন সমস্যা নয়।'

'কেন সমস্যা নয়?' জানতে চাইল রানা।

'তুমি এক টুকরো বাঁশ কেটে হাতে রাখবে,' জবাব দিল ললিতা। 'ওদেরকে কাছাকাছি আসতে দেখলে পানির নীচে ডুব দেবে, শ্বাস নেবে ওই বাঁশ দিয়ে যতক্ষণ না ওরা চলে যায়।'

হোয়ের দিকে ফিরে হাসল রানা। 'তুমি বাঁশের ব্যবস্থা করো, আমি দেখি ম্যানগ্রোভের ভেতর কোথায় লুকানো যায়।'

হোয়েকে সন্দেহান মনে হলো। বাঁশ ঝাড়ের দিকে এগোল সে। ঘুরে ম্যানগ্রোভ টানেলের ভিতর ঢুকল রানা।

পানি কেটে ভাটির দিকে এগোচ্ছে রানা, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওর পিছু নিল ললিতা।

যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা-নিশ্চিন্দ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের গায়ে একটা ফাটল, বেশ গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ললিতাকে সাবধান করে দিল, 'ঝোপের একটা ডালও ভেঙো না।' মাথা নিচু করে ভিতরে ঢুকল ও। চ্যানেলটা দশ গজ এগিয়েছে। পায়ের নীচে কাদা এখানে একটু বেশি গভীর আর নরম। তারপর শিকড়ের নিরেট পাঁচিল, সামনে এগোবার কোন উপায় নেই। বাদামী পানি ধীর গতিতে পাশের একটা চওড়া আর স্থির পুকুরে গিয়ে মিশছে। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

ললিতা ওর পাশে চলে এল। 'সত্যিকার লুকোচুরি খেলা, না?' ভয় লাগছে, আবার উত্তেজনাও বোধ করছে।

'তা বটে।' স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভারটার কথা ভাবছে রানা। নদীতে গোসল হয়ে যাওয়ার পর ওটা দিয়ে কীভাবে গুলি করবে ও? ওদেরকে যদি খুঁজে বের করে ফেলে, ক'জন লোক আর ক'টা কুকুরকে মারতে হবে ওকে? মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা বিপদ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। যুদ্ধে একটা মেয়ে তোমার অতিরিক্ত বোঝা। তোমার টার্গেট একটা, কিন্তু তোমার শত্রুর টার্গেট দুটো।

তেষ্টার কথাটা মনে পড়ে গেল রানার। এক আঁজলা পানি তুলে চুমুক দিল। একটু মাটি মাটি গন্ধ। আরও কয়েক চুমুক খেল।

ওর হাত ধরে ফেলে বাধা দিল মেয়েটি। 'বেশি খেয়ো না। মুখে নিয়ে কুলি করো। তা না হলে তোমার জ্বর আসতে পারে।'

কিছু না বলে তার দিকে দীর্ঘ এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর করল কাজটা।

মূল স্রোতের কোথাও থেকে শিস দিল হোয়ে। সাড়া দিয়ে তার দিকে এগোল রানা। চ্যানেল ধরে ফিরে এল ওরা। ম্যানগ্রোভের শিকড়ে পানি ছিটাল হোয়ে, ওখানে হয়তো ওদের শরীর ঘষা খেয়ে থাকতে পারে। 'আমাদের গন্ধ মুছছি,'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। সন্ধ্যা একটা বাঁশ সেখান রান্নাঘরে
তিন টুকরো করে কাটতে হবে ওটা।

নিকের বিজ্ঞানবাব আর অ্যামিউনিশন পরীক্ষা করছে রান্না।

ছির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, পানি যাতে আরও ঘোলা না
হয়।

ঘন পাতার ফাঁক গলে রোদ নামছে কোথাও কোথাও। খুঁসে
চিৎপিঁ মাছেরা সোঁকর দিচ্ছে পায়ে। ভ্যাপসা গরম আর
নীলবস্তার ভিতর বাড়ছে উত্তেজনা।

কুকুরগুলোর খেউ খেউ প্রায় স্বপ্তি হয়ে কানে বাজল।

নয়

নদীর উপর দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছে সার্চ পার্টি। বেদিং ট্রাক আর
লম্বা ওয়াটারপ্রুফ বুট পরা দু'জন লোক কুকুরগুলোর সঙ্গে
থাকার জন্য রীতিমত ছুটছে। চ্যান্টামুখো রোহিঙ্গা তারা, লম্বা-
চওড়া কাঠামো। নগ্ন শরীরে শোভার হোলস্টার পরেছে, পিঠে
ঝুলছে রাইফেল। মাঝেমধ্যে চিৎকার করছে তারা, বেশিরভাগই
মুখ খারাপ করে খিঁচি আওড়াচ্ছে নয়তো কিরে-কসম কাটিছে।
তাদের সামনে ডোবারম্যান পিনশারের একটা পাল সাঁতরাচ্ছে,
যথেষ্ট পানি ছিটাচ্ছে আর অনবরত খেউ-খেউ করছে। সন্দেশ
নেই, গল্প পাওয়ার কারণেই এতটা উত্তেজিত ওগুলো। হীরক
আকৃতির কান খাড়া হয়ে আছে।

‘হয়তো কোন কুমির,’ কুকুরগুলোর হাঁক-ডাক ছাপিয়ে উঠল
সামনের লোকটার গলা। ছোট আকৃতির একটা চাবুক রয়েছে

তার হাতে, মাঝেমধ্যে বাতাসে সেটাকে ছাপটে সপায়-সপায়
আওয়াজ তুলছে সে।

অপর লোকটাও ঠেঁচিয়ে কথা বলছে। ‘অনি বাড়ি ধরে
বলতে পারি, কুমির-টুমির কিছু না, ওই শালা সেই বাঙ্গালী
বেজন্মটা না হয়ে যায় না। এ-ও জানি, শালা সামনের
মানদ্রোভের ভেতর পা ঢাকা দিয়ে আছে। মাঝলান-আমবুশ
পেতে রাখতে পারে।’ হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে কাম
বগলের তলার ওঁজল সে, ডান হাতে বাঁট ধরে আছে।

অগভীর খোলা নদী পেরিয়ে মানদ্রোভ টানেলে ঢুকতে
যাচ্ছে তারা। প্রথম লোকটার কাছে একটা হুইসেল দেখা
যাচ্ছে। চওড়া মুখ থেকে সিগারেটের মত বেরিয়ে আছে সেটা।
তীক্ষ্ণ শব্দে বাজাল একবার। তারপরও কুকুরগুলো ছুটতে দেখে
চাবুকটা বাতাসে সবেগে ছাপটাল। খামল ওগুলো, ফৌপানোর
মত আওয়াজ করছে। লোক দু'জন পিস্তল হাতে নিয়ে
মানদ্রোভের এলোমেলো শিকড়ের ফাঁকে পা ফেলে দীর্ঘশ্বাসে
এগোচ্ছে।

সামনের লোকটা রান্নার খুঁজে পাওয়া সন্ধ্যা ফটিলটার মুখে
পৌছাল। একটা কুকুরের কলার ধরে টান দিল সে, ওটাকে
ঘুরিয়ে ঢুকিয়ে দিল চ্যানেলটার। ব্যগ্র একটা ভজিতে নাক টানল
সেটা, তারপর সাঁতরে সামনে এগোল। লোকটা চ্যানেলের দুই
পাশে চোখ বুলিয়ে দেখছে মানদ্রোভের শিকড়ে তাজা কোন
দাগ পড়েছে কিনা।

আরও খানিক এগিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে ঘুরে গেল লোকটা।
ছোট, বক্ষ পুকুরটার ঢুকে পড়ল। চোখ-মুখ বিকৃত করে
চারদিকে তাকাচ্ছে সে। কুকুরটার কলার ধরে টেনে নিল
পিছনে। যদিও জায়গাটা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক ওটা। পানিতে
চাবুক কষে ভয় দেখাল লোকটা।

ছোট চ্যানেলের মুখে অপেক্ষা করছে দ্বিতীয় লোকটা। তার

সঙ্গী বাইরে বেরিয়ে এসে মাথা নাড়ল। আবার ভাটির দিকে এগোল তারা। কুকুরগুলো এখন আগের চেয়ে কম উত্তেজিত, গাদের সামনে ছুটছে।

ধীরে ধীরে সার্চ পার্টির শোরগোল মিলিয়ে গেল দূরে।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট ম্যানগ্রোভ পুকুরে কিছুই নড়ল না। তারপর শিকড়গুলোর এক কোণ থেকে, সরু একটা বাঁশের তৈরি পেরিস্কোপ ধীরে ধীরে উঠু হলো। ওটার পিছু নিয়ে উঠে এল বানার মুখ, কপালে ভিজে চুল সঁটে আছে। পানির তলায় ডান হাতে ধরা পিস্তলটা গুলি করার জন্য তৈরি।

গভীর একাত্তার সঙ্গে কান পাতল রানা। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সত্যি কি তাই? মূল স্রোতে নরম কলকল আওয়াজটা তা হলে কী? অত্যন্ত সাবধানে সার্চ পার্টির কেউ কি ফিরে আসছে আবার?

নিজের দু'দিকে হাত বাড়াল রানা, পুকুরের কিনারায় শিকড়গুলোর মাঝখানে শুয়ে থাকা সঙ্গী দু'জনকে স্পর্শ করল। মুখ দুটো পানির উপর উঠতে নিজের ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে শব্দ করতে নিষেধ করল ও।

তবে দেরি হয়ে গেছে। কেশে উঠে থুথু ফেলল হোয়ে। চেহারা গম্ভীর করল রানা, জরুরি ভিত্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে মূল স্রোতটা দেখাল।

সবাই ওরা কান পাতল। লোকটা যে-ই হোক, সাইড চ্যানেলে ফিরে আসছে সে। বাঁশের টিউব ফিরে গেল ওদের তিনজনের মুখে, মাথাগুলোও ডুব দিল আবার।

পানির তলায় কাদার উপর মাথা রাখল রানা, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে টিপে নাকের ফুটো বন্ধ করে রেখেছে, ঠোঁট জোড়া চেপে ধরেছে টিউবের চারদিকে। ও জানে পুকুরটা একবার পরীক্ষা করা হয়েছে। পানিতে সঁতারু কুকুরগুলোর লাফালাফি অনুভব করেছে ও। সেবার ওদেরকে খুঁজে পায়নি তারা।

এবারও কি তাদেরকে ফাঁকি দিতে পারবে ওরা? এবার ঘোলা পানি পুকুর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে না। পানির কোথাও যদি গাড়ি বাদামী রঙ একটু বেশি দেখে লোকটা, সেদিকে কি গুলি করবে সে? বা ছুরির কোপ মারবে? কে জানে কী অস্ত্র ব্যবহার করবে। রানা সিদ্ধান্ত নিল, ও কোন ঝুঁকি নেবে না। কাছাকাছি পানিতে কোন নড়াচড়া টের পেলেই সিধে হয়ে গুলি করবে ও। তারপর যা আছে কপালে।

কাদায় শুয়ে প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখেছে রানা। নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস কী যে কষ্টকর আর কুঁচো চিংড়ির নরম খোঁচা কতটা যে পাগল বানাতে পারে! ওদের নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে কারও শরীরে কোন ক্ষত নেই, থাকলে এতক্ষণে খেতে খেতে পথ করে নিয়ে শরীরের ভিতর ঢুকে পড়ত। তবে স্বীকার করতে হবে, ললিতার আইডিয়াটা দারুণ কাজে লেগেছে। এই কৌশল না করলে যেখানেই লুকাক না কেন, কুকুরগুলো ঠিকই ওদেরকে খুঁজে বের করে ফেলত।

অকস্মাৎ সিটকে গেল রানা। ওর হাঁটুর নীচের হাড়ে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেল রাবারের একটা জুতো। লোকটা কি গুটাকে ম্যানগ্রোভের শিকড় ধরে নেবে? ঝুঁকিটা ওর নেওয়া চলে না। ঝট করে পানির উপর মাথা তুলল ও, বাঁশের টুকরোটা মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে।

প্রকাণ্ড লোকটাকে একেবারে ওর গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা, হাতের রাইফেল সবেগে ঘোরাচ্ছে। খুলি বাঁচাবার জন্য বাঁ হাত তুলল ও। হাতের উল্টো পিঠে লাগল ব্যারেলটা। একই সঙ্গে অস্ত্র ধরা ডান হাতও সামনে বাড়িয়েছে ও। শ্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের মাজল ওর নগ্ন স্তনের বোঁটা স্পর্শ করা মাত্র ট্রিগার টেনে দিল।

বিস্ফোরণের ধাক্কা, লোকটার শরীরে বাধা পেয়ে, রানার কবজি প্রায় ভেঙে ফেলার উপক্রম করল। তবে গোড়া কাটা

গাছের মত উপড় হয়ে পানিতে পড়ল লোকটা। পলকের জন্য তার পিঠে বিরাট একটা লাল গর্ত দেখল রানা। রাবারের জুতো জোড়া পানির উপর ছুঁড়ল একবার। প্রকাণ্ডেহী রোহিঙ্গা তার মাথাটাও পানির উপর তুলল, হাঁ করা মুখ থেকে পানি বেরুচ্ছে। তারপর পা আর মাথা, দুটোই তলিয়ে গেল। ঘোলা পানিতে ছড়িয়ে পড়া লাল রক্ত ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। সেই পানি আর রক্ত ভাটির দিকে সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

নিজেকে একবার ঝাড়া দিল রানা। তারপর ঘুরল। ওর পিছনে হোয়ে আর ললিতা দাঁড়িয়ে রয়েছে, পানি ঝরছে ওদের শরীর থেকে। হোয়ের মুখের হাসিটা দুই কান ছুঁয়েছে। কিন্তু মেয়েটির ভাঁজ করা আঙুলগুলোর কয়েকটা গাঁট মুখের ভিতর, আর তার আতঙ্কে বিক্ষারিত চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠা পানির উপর স্থির হয়ে আছে।

একটু কর্কশ সুরে বলল রানা, 'দুঃখিত, লোলি। এ ছাড়া উপায় ছিল না। একেবারে আমাদের গায়ের ওপর উঠে এসেছিল। এসো, যাওয়া যাক।' খপ করে তার একটা হাত ধরল ও, টান দিলে ঘোরাল, তারপর ঠেলে বের করে আনল মূল ত্রোতে; থামল শুধু খোলা নদীতে এসে, যেখানে ম্যানগ্রোভ টানেলটা শুরু হয়েছে।

চারদিক এখন আরো খালি দেখাচ্ছে। হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। চারটে বাজতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। আর কতদূর যেতে হবে ওদেরকে? হঠাৎ করে ক্রান্তি বোধ করছে ও। প্রানটীর তো বারোটা বাজিয়েইছে। গুলির আগুয়াজ দূর থেকে যদি শোনা না-ও গিয়ে থাকে-লোকটার শরীর আর ম্যানগ্রোভে বাধা পেয়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল-সবাই যখন এক জায়গায় জড়ো হবে তখন একজনের অনুপস্থিতি ধরা পড়তে বাধ্য। হোয়ের আন্ডাজ যদি ঠিক হয়, তারা জড়ো হবে নদীর মুখে, ওখান থেকে তাদেরকে লঞ্চে তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

তারা কি মৃত লোকটার খোঁজে নদী ধরে ফিরে আসবে আরও? সম্ভাবনা কম। লোকটা যে নিখোঁজ, এটা নিশ্চিতভাবে জানতে সঙ্কে হয়ে আসবে। তারা কাল সকালে সার্ট পাঠি পাঠাবে। লাশটা পেতে কুকুরগুলোর কোন সমস্যা হবে না। তারপর কী?

মেয়েটি ওর অস্তিন ধরে টান দিল। কথা বলার সময় বাঁধ ফুটল তার গলার। 'এবার সময় হয়েছে, আমাদের জালাও ব্যাপারটা কী নিয়ে। কেন একদল আরেক দলকে মোরে ফেলার চেষ্টা করছে? তোমরা কে? পাবি ওই সব গল্প আমি বিশ্বাস করি না। পাবি দেখতে এলে কেউ অস্ত নিয়ে আসে না।'

ললিতার রাগী চেহারার দিকে তাকাল রানা। 'দুঃখিত, সব কথা বুঝিয়ে বলার সময় নয় এটা। সম্ভাব্য পর ফল, যেমন? শুধু এটুকু জেনে রাখো, এই লোকগুলো ভাল নয়, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। আর কেউ আহত হবার আগেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চাই আমি। পরের বার আসব সময় সময় দিয়ে।'

'তোমার কথা আমি বুঝলাম না। তুমি কি কোনও ধর্মের পুলিশ? এই রোহিঙ্গা লোকটাকে জেলে পাঠাতে চাও?'

'মোটামুটি ঠিকই ধরেছি।' হাসল রানা। 'অস্তর সেবদাসের দলে আছ তুমি। এবার আমার একটা প্রপুত্র জবাব দাও। ক্যাম্পটা আর কত দূরে?'

'ওহ, পৌছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে।'

'লুকানোর জন্যে জায়গাটা কি ভাল? ওখানে লুকানো সহজে খুঁজে পাবে না তো?'

'হয় লোক, নয়তো নদী পেরিয়ে আসতে হবে ওদেরকে। জাগান না পাঠালে ওই জায়গা আমাদের জন্যে নিরাপদ। পলিট ওপর দিয়ে চলতে তার কোন অসুবিধা হয় না। তারা আমি আসতে দেখেছি।'

'আচ্ছা,' বলল রানা। 'আশা করি বাকি, আর লঞ্চে যা

হয়েছে বা সর্দিতে ভুগছে।’

মেয়েটি ঠোট ফোলাল। ‘ঠিক আছে, মিস্টার সবজাত্তা!’
রেগেমেগে বলল সে। ‘একটু অপেক্ষা করো, তারপর নিজেই
দেখতে পারে।’

চারদিকে পানি ছিটিয়ে ম্যানগ্রোভের ঝোপ থেকে বেরিয়ে
এল হোয়ে। তার হাতে একটা রাইফেল দেখা যাচ্ছে। ক্ষমা
প্রার্থনার সুরে রানাকে বলল, ‘আরেকটা অস্ত্র থাকলে কোন ক্ষতি
নেই, কর্নেল বস্। বরং আমাদের দরকার হতে পারে।’

হাত বাড়িয়ে নিল ওটা রানা। রেমিংটন কারবাইন, .৩০০।
কাজের জিনিস, সন্দেহ নেই। হোয়েকে ফিরিয়ে দিল আবার।

রানার চিন্তারই প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল হোয়ের কথাগুলো।
‘এরা বিষাক্ত সাপ, কর্নেল বস্। এই লোকটা নিশ্চয়ই অন্য
দু’জনের পিছু পিছু নরম পায়ে আসছিল—কুকুর চলে গেলে
আমরা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব, তখন ধরবে, এই আশায়।
ওদের বস্ও নিশ্চয়ই হিংস্র বেজি হবে, ওই ব্যাটা ডক্টর!’

প্রসঙ্গ বদল করল রানা। ‘লোলি বলছে ক্যাম্প পৌছাতে
এক ঘন্টা লাগবে। আমরা বাঁ দিকের পার ধরে এগোই চলো, তা
হলে কিছুটা হলেও পাহাড়ের আড়াল পাব। জানা কথা নদীর
দিকে বিনকিউলার তাক করে তাকিয়ে আছে কেউ না কেউ।’
নিজের রিভলভারটা হোয়ের হাতে ধরিয়ে দিল ও। হোয়ে সেটা
ভেজা ন্যাপস্যাকে ভরে রাখল আবার।

পশ্চিম পার ধরে এগোবার সময় বাঁশ ঝাড় আর
কাঁটাকোপের কিছু ছায়া আর আড়াল পাওয়া গেল, তবে এবার
তীব্র বাতাসের সামনে পড়তে হলো ওদেরকে।

নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এক সময় বাঁশ ঝাড়ের ভিতর
দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু নালা হয়ে উঠল সেটা। এই নালা সমতল
জলাভূমিতে মিশেছে। তারপর একটা লেক, পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে
টলটলে গভীর পানি। লেকের শেষ মাথার কাছে অস্পষ্টভাবে

দেখা যাচ্ছে এয়ারস্ট্রিপটা। রোদ লাগায় নিঃসঙ্গ হ্যান্ডারটাও
চিনতে অসুবিধে হলো না। ললিতা ওদেরকে পুর দিক ধরে
এগোতে বলল, ঝোপের পাশ ঘেঁষে তাই এগোচ্ছে ওরা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল হোয়ে, সামনের জলার দিকে বাড়িয়ে
ধরেছে মুখটাকে। সমান্তরাল দুটো গভীর দাগ দেখা যাচ্ছে নরম
মাটিতে, দুটোর মাঝখানে তৃতীয় দাগটা একটু কম গভীর।
পাহাড় থেকে নেমে আসা কিছু ছাপ, জলার উপর দিয়ে লেকের
দিকে চলে গেছে।

মেয়েটি নির্লিপ্ত সুরে বলল, ‘ওটা ড্রাগনের পায়ের ছাপ।’

ঝট করে তার দিকে তাকাল হোয়ে।

দাগগুলোর পাশ দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটল রানা। দাগগুলোর
বাইরের দিক বেশ মসৃণ, একটু বাঁকা। আকারে বিরাট হলেও,
কোন চাকার দাগও হতে পারে—একেকটা দু’ফুট চওড়া।
মাঝখানের ট্র্যাকটা একই আকৃতির, তবে মাত্র তিন ইঞ্চি চওড়া।

দাগগুলো নতুন, গেছে মাত্র একদিকে। যাওয়ার পথটা
তীরের মত সোজা, ঝোপ-ঝাড় কিছু মানেনি, সব একেবারে
শুইয়ে দিয়ে গেছে—যেন ওগুলোর উপর দিয়ে একটা ট্যাঙ্ক
চালানো হয়েছে।

রানা ভেবে পাচ্ছে না কী ধরনের যানবাহন মাটিতে এরকম
দাগ ফেলতে পারে। ওর গায়ে মৃদু খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করল
ললিতা, ‘কী, বলিনি আমি?’

শ্রাগ করল রানা। ‘যাই বলো, এটা যদি ড্রাগন না-ও হয়, কী
জিনিস আমি জানি না।’

আরও খানিক দূর এগিয়ে আবার রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল
মেয়েটি। ‘দেখো!’ বড় কয়েকটা ঝোপের দিকে হাত তুলল,
যেগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়েছে দাগগুলো। ঝোপের একটাতেও
কোন পাতা নেই, প্রতিটি ডালের রঙ হয়ে গেছে কালো। কালো
শাখা-প্রশাখার ভিতর পাখির কয়েকটা বাসাও দেখা গেল, পুড়ে

গেছে। 'ওগুলোয় ওটা নিঃশ্বাস ফেলেছে!' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে।
ঝোপগুলোর কাছে হেঁটে এসে পরীক্ষা করল রানা। 'হ্যাঁ,
ঠিক বলেছ,' একমত হলো ও। বিশেষ করে এই ঝোপগুলোয়
পোড়ানো হয়েছে কেন? গোটা ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত।

দাগগুলো একটা তির্যক পথ ধরে লেকের দিকে এগিয়েছে,
তারপর পানিতে নেমে হারিয়ে গেছে। অনুসরণ করার ইচ্ছে
হলেও আড়াল থেকে বেরুবার ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না।
নিজেদের পথে এগিয়ে চলল ওরা, যে যার চিন্তায় মগ্ন।

ধীরে ধীরে পাহাড়ের সাদা চূড়ায় স্নান হয়ে যাচ্ছে দিনটা।
হাত তুলে সামনেটা দেখাল ললিতা। ঝোপের ভিতর থেকে রানা
দেখল বালির লম্বা একটা বিস্তৃতি লেকে গিয়ে মিশেছে। বিস্তৃতির
শিরদাঁড়ায় বুনো গাছপালা আর ঝোপঝাড় জন্মেছে। দৈর্ঘ্যের
মাঝামাঝি জায়গায়, তীর থেকে প্রায় একশো গজ দূরে, লোহার
রড দিয়ে তৈরি একটা কেবিনের অবশিষ্ট কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

রাত কাটানোর জন্য বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হলো
জায়গাটাকে, দু'দিকেই পানি থাকায় সুরক্ষিত। ইতিমধ্যে বাতাস
নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কাপড়চোপড় খুলে লেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার
একটা তীব্র ইচ্ছে ডানা মেলছে সবার মনে।

হলুদ হয়ে উঠে দিগন্ত থেকে নেমে গেল সূর্য। সেই সঙ্গে
শুরু হয়ে গেল ব্যাঙদের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ। তবে চারদিক অন্ধকার
হয়ে আসতে নীরবতা ফিরে এল আবার।

স্যান্ডসপিট-এ পৌছাল ওরা, সরু পায়ে চলা পথ ধরে এক
লাইনে এগোচ্ছে। একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এল, ভেঙে পড়া
কুঁড়েটা দেখছে। বড় আকৃতির রহস্যময় ছাপ দু'দিকের পানি
থেকেই উঠে এসেছে। ফাঁকা জায়গাসহ আশপাশের ঝোপ-ঝাড়
পুড়ে কালো হয়ে আছে। জিনিসটা যাই হোক, চারদিক পা দিয়ে
দলিতমথিত করে রেখে গেছে। পাথর দিয়ে বানানো একটা চুলো
দেখা গেল, আশপাশে হাঁড়ি-পাতিল আর খালি টিন ছড়িয়ে

রয়েছে। আবর্জনা খেঁটে খোলা হয়নি এমন কয়েকটা টিন পেল
হোয়ে, থাইল্যান্ডে প্যাক করা মুরগীর মাংস আছে ভিতরে।
একটা স্লিপিং ব্যাগ পেল ললিতা। পাঁচশো কিলোগ্রাম একটা
মানি ব্যাগ পেল রানা।

আরও সামনে চলে এল ওরা। এই জায়গাটাও ফাঁকা।
ঝোপের ভিতর দিয়ে তাকাতো পানির ওপারে পাহাড়ের গারে
বিন্দু বিন্দু আলো মিটমিট করতে দেখল ওরা, সম্ভবত মাইল
দুয়েক দূরে।

রানা বলল, 'আলো না জ্বালালে এখানে ভালই থাকব
আমরা। প্রথম কাজ পরিষ্কার হওয়া। লোলি, স্যান্ডসপিটের
একটা দিক তুমি নাও, আরেক দিক আমরা নিই। আধ ঘন্টা পর
ভিনারে দেখা হবে।'

হেসে ফেলল মেয়েটি। 'তুমি কি শুকনো কাপড় পরবে?'

'হ্যাঁ, ট্রাউজার।'

'কর্নেল বস,' বলল ইয়ে হোয়ে, 'এখনও একটু আলো
আছে, আমি টিন দুটো খুলে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করি।'
ন্যাপস্যাকে হাত ভরে হাতড়াচ্ছে। 'এই মিন, ট্রাউজার নিয়ে
আপনি যান। ভেজা রুটি খাওয়ার উপযুক্ত নেই, সকালে শুকালে
খাওয়া যেতে পারে। আজ শুধু মুরগী খেয়েই খিদে মেটাতে
হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রওনা হলো রানা, হাতে রিভলভার আর
ট্রাউজার।

অগভীর পানিতে নেমে ফেলে আসা পথ ধরল রানা। পঞ্চাশ
গজ এগোতেই উঁচু আর শুকনো একটা জায়গা পেল। শাট খুলে
পানিতে ডুবিয়ে দিল শরীরটা, শুধু মাথা উঁচু করে রেখেছে। এক
মুঠো বালি নিয়ে সাবানের মত করে গায়ে ঘষল। তারপর
নীরবতা আর নিঃশব্দতার মধ্যে শুয়ে আলস্যে গা ভাসাল।
তারাগুলো এক এক করে স্নান আলো নিয়ে জ্বলে উঠছে।

চিন্তা করছে রানা। যতই প্রাইভেসি পছন্দ করুক, ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কেউ অবাধিকার প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে মেশিনগান ব্যবহার করবে? কে এই ডক্টর গজনবি?

ডান দিকে পানি ছলকানোর আওয়াজ শেল রানা। মেয়েটির কথা ভাবল ও। সে-ই বা কে? শক্ত জায়গাটার উপর উঠে ট্রাউজার পরল ও, তারপর বালির উপর বসে বিজুলবার খুলল। কাজটা হাতের স্পর্শ দিয়ে করছে ও। প্রতিটি পার্ট আর কাটিজ শার্ট দিয়ে মুছে শুকাল। তারপর অস্ত্রটা জোড়া লাগিয়ে ট্রিগার টেনে প্রতিটি খালি সিলিভার পরীক্ষা করল। আওয়াজগুলো ঠিক আছে। লোড করে ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যাগে ভাঁজে রাখল অস্ত্রটা। তারপর সিঁথে হয়ে ফিরে এল ফাঁকা জায়গাটির।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ললিতা। ওর একটা হাত ধরল। 'বসো,' বলল সে। 'খিদেতে আমাদের জান বেরিয়ে যাচ্ছে। মটরভঁটির টিনও পাওয়া গেছে। একটা পাতিল পরিষ্কার করে ওগুলো সেফ করাও হয়ে গেছে। চুলোর চরপাশ আরও উঁচু করা হয়েছে, ফলে আগুনটা কেউ দেখেনি। আরেকটা পাতিলে মুরগীর মাংস রেখেছি। হাত বাড়ানো, ওটাই তোমার পেট।'

অকস্মাৎ মেয়েটির গায়ের গন্ধ রানাকে কেমন যেন পাগল করে তুলল। কোলে পড়ে থাকা তার একটা হাত ধরল ও। ওর আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল ললিতা, তারপর হাতটা তুলে তাকে মটরভঁটি ভরে দিল, 'খাও।'

রাত বোধহয় আটটার কাছাকাছি, ভাবল রানা। খানিক দূরে ব্যাঙের ডাক ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। ফাঁকা জায়গাটার এক কোণে হোয়ের গাঢ় কাঠামো দেখতে পাচ্ছে ও। মৃদু ধাতব শব্দ ভেসে আসছে ওদিক থেকে—রাইফেলটা খুলে মুছেছে সে।

পরিবেশটা ঠাণ্ডা। কাপড়চোপড় গায়েই শুকিয়ে গেছে

রানার। তিন ঘণ্টা মটরভঁটি আর তিন টুকরো মুরগীর মাংস মোটাখুটি পেটের জ্বালা মিটিয়েছে। খুম-খুম আশ্রয় উল্কাভাণ করছে ও। আগামীকাল এখনও অনেক দূর, কাজের সীমা সীমার পরে চিন্তা করলেও চলবে। জীবন হঠাৎ করে বেশ সুন্দর আর উপভোগ্য লাগছে।

ওর পাশে প্রিন্স ব্যাগে ভরে রয়েছে মেয়েটি। তিন ঘণ্টা রয়েছে সে, মাথাটা দুই হাতের উপর, তাকিয়ে আছে ছান ভাঁজ তারার দিকে। হঠাৎ বলল, 'রানা। কল্যাণ দিচ্ছে আমাকে তুমি বলবে ব্যাপারটা কী নিয়ে। না বলা পর্যন্ত আমার খুম আসবে না।'

হেসে উঠল রানা। 'তুমি বললে আমিও বলব। তোমার সব কথাও আমি শুনতে চাই।'

'আমার আপত্তি নেই। সোপানীয় কিছু থাকলে হ্যাঁ। তবে তুমি কিছ্র আনে।'

'বেশ।' হাঁটু দুটো চিবুকের কাছে তুলে আঁমল রানা, তারপর হাত দিয়ে আঙুল শুকলোকে। 'আমি একজন সরকারী গোয়েন্দা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোথাও কেউ সৌম্য চক্রান্ত করলে তার একটা বিহিত করার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়।'

'তিন-চার হক্টা আগে বাংলাদেশ সহ বেশ কয়েকটা দেশে রহস্যময় কিছু মানুষ পুলিশের ছদ্মবেশ নিয়ে সোমারাজি আর খুন-খারাবি শুরু করেছিল। বহুসংখ্যক বলছি এই কারণে যে ওগুলো সম্ভবত পুরোপুরি মানুষ ছিল না। ঠিক আমি না, তবে মানুষ আর মেশিন মিলিয়ে তৈরি করা 'আলাদা' একটা জিনিস হবে। লোলি, একটু চিন্তা করে অলবি দাও। তুমি কি এ ধরনের নকল মানুষ বা পুলিশ অয়েন্টার ধীপে লেবেল?'

'নাহ।' চিন্তা না করেই অলবি দিল ললিতা।

'নকল মানুষ দেখনি। কিছ্র নকল জন্তু?'

'তুমি ড্রাগনটার কথা বলছ? অজেন্স করল মেয়েটি।

ভারপর মাথা নাড়ল। 'ওটার সঙ্গে তবু ড্রাগনেরই মিল আছে।
কিন্তু তুমি বললে ড্রাগন বলে কিছু নাকি নেই।'

'আসলেই নেই,' বলল রানা। 'ওটাকে সেবার পর বললে
পারব কোনও জন্তকে মেশিনের সাহায্যে তোমার ড্রাগন বানালে
হতোই কিনা।'

'তো যা বলছিলাম। মাত্র কয়েক দিন আগে সূর্য নামে আমার
এক বন্ধু নিখোঁজ হয়েছে। তার সেক্রেটারি, সুন্দরী এক মেয়ে,
তাকেও বুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার খারশা ওদেরকে যা
অয়েন্টার ছীপে ধরে আনা হয়েছে, নড়াতো খুন করে লাশ লুকিয়ে
ফেলা হয়েছে। আমার সন্দেহ এ-সব কাজের জন্যে রোহিঙ্গা
লোকটা দারী-ওটর থাকিন পছন্দবি।'

'কেন এ-সব করবে সে? তার লাভ কী?'

'সেটা জানতেই তো এখানে আমার আসা।'

'ওই নকল মানুষ না কী যেন বলছ, তাদেরকে জেদা করা
হয়নি?' জানতে চাইল ললিতা।

'বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েকজনকেই ধরা হয়েছে,' বলল
রানা। 'কিন্তু হয় তারা যদি অবস্থার আবহাওয়া করেছে, আর
নড়াতো একটা প্রচেষ্টা করার দিকে পারেনি। ডাক্তাররা পরীক্ষা
করে জানিয়েছেন, ওই নকল মানুষদের 'কৃতিশক্তি' খুবই দুর্বল।
তারা কে, কোথেকে এসেছে, কেন এসেছে, কে পাঠাল, কী
করতে চেয়েছিল-কিছুই তাদের মনে নেই।'

তুচ্ছ ভেঁচকাল মেয়েটি। 'চিন্তার কথা। এর মধ্যে কী যেন
একটা চাপাকি আছে। আচ্ছা, এতলো তৈরি করে কার কী লাভ,
আন্দাজ করতে পার না তুমি?'

'তুমি পারা?'

'ওদেরকে নিয়ে দুখ করিয়ে ছোট একটা জাহাজা মঞ্চল করবে
লোকটা,' সরল মনে যা আসছে তাই বলে যাচ্ছে ললিতা।
'ভারপর একটা জেলা বা শহর। ভারপর একটা দেশ। কে

জানে, এভাবে হয়তো একের পর এক অনেকগুলো দেশ মঞ্চল
করতে চায় সে। নকল লোকগুলো এখন কী করেছে?'

'এই মুহুর্তে কোথাও ওদের কোন তথ্যসহতা নেই,' বলল
রানা। 'বেশিরভাগই ওলি খেয়ে মরেছে, নড়াতো আবহাওয়া
করেছে।'

'ভারমানে লোকটার কাজে বুঁজ আছে,' বলল ললিতা।
'ওগুলোকে নিখুঁত করে বানাতে পারেনি।'

মেয়েটির চিন্তাশক্তির খতীবত্ব আর স্বচ্ছতা লক্ষ্য করে
বিশ্মিতই হলো রানা। 'তো যা বলছিলাম, ললি। কাল রাত্রে
আমাদের তিনজনকে অকিছাবে ফিরে যেতে হবে। সাময়িক
প্রশাসক আমার বন্ধু মানুষ, এখানকার পরিস্থিতি তাকে ব্যাখ্যা
করে বললে রোহিঙ্গা লোকটাকে আরোন্ট করার জন্যে অবশ্যই
ফোর্স পাঠাবে সে। এর মানে হলো তার বিচার হবে, শাস্তিও
শেতে হবে। এটা সে জানে, সেজন্যেই আমাদেরকে বাধা দেয়ার
চেষ্টা করছে। আমার কথা শেষ। এবার তোমারটা বলো।'

মেয়েটি বলল, 'সেখা যাচ্ছে ভারী রোমাঞ্চকর জীবন
তোমার। তবে এত বেশি বাইরে বাইরে থাকো তুমি, তোমার
বউটা নিশ্চয়ই পছন্দ করে না সেটা। তোমারে বিপদ হবে এ-কথা
ভেবে ভয় পায় না সে?'

'আমি বিয়ে করিনি। আমি আহত বা নিহত হব এই ভয়ে
কাতর থাকে তবু ইউরোপ কোম্পানি। তবে, তা হলে একগাল
টাকা দিতে হবে তাদের বাংলাদেশের একটা হাসপাতালকে।'

তদ্ব্যপী চালাচ্ছে মেয়েটি। 'তবে অনেক মেয়ের সঙ্গে
তোমার ওটা-কথা।'

'ওরা কেউ আমাকে ধরে রাখে না।'

'ও। ভারমানে নিজের স্বাধীনতায় কাউকে তুমি হাত দিতে
পাও না।'

কিছুক্ষণের বিরতি। ওদের দিকে রেটে এল ইরে হোয়ে।

‘কর্নেল বস্, স্যান্ডসপিটের শেষ মাথার কাছে মাকরাঙ পর্যন্ত
পাহারায় থাকি আমি। তারপর আপনি পাঁচটা পর্যন্ত জাগবেন?’

‘ঠিক আছে। কিছু দেখলে আমাকে ডেকো। রাইফেলটা ঠিক
আছে?’

‘ইয়েস, কর্নেল বস্, ঠিক আছে। ভাল ঘুমান, ম্যাডাম,’ খাঁস
একটা ইঙ্গিত নিয়ে অস্বকারে মিলিয়ে গেল হোয়ে।

‘ইয়ে হোয়েকে আমি খুব পছন্দ করি,’ বলল মেয়েটি। ‘তুমি
কি সত্যিই আমার সম্পর্কে জানতে চাও? আমার জীবনী
তোমার মত ইন্টারেস্টিং কিছু নয় কিন্তু।’

‘তবু, জানতে চাই। কিছু বাদ দিছো না।’

‘বাদ দেয়ার কিছু নেই। খুব সোজা গল্প। যেমন-তখনতাই
হলে নিই, আমি আকিয়াবের বাইরে কোথাও যাইনি তখনও।
তবুই আমার মা-বাবা ইন্ডিয়া থেকে মায়ানমারে এসেছিল,
আমরা জনৈক আরোহী।’

‘খানখামায় বিরাট একটা আখ বেত ছিল আমাদের, বাড়িটা
ছিল তার মাঝখানে। তবে সেটার এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই,
আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তারপরও, ওই ছাইয়ের
মাঝেই থাকি আমি। সেই আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে, ওই
আগুনে পুড়ে আমার মা-বাবাও মারা যায়। ওদের কথা কিছুই
আমার মনে নেই, কাজেই তোমাকে “দুঃখিত” বলতে হবে না।’

‘কী ভয়ানক!’ রানা বিস্মিত। ‘তোমাকে দেখাশোনার কেউ
ছিল না? তোমার মা-বাবা টাকা-পয়সা কিছু রেখে যাননি?’

‘কী রেখে গিয়েছিল না গিয়েছিল পাঁচ বছরের একটা মেয়ে
কী করে জানবে, বলো,’ বলল ললিতা। ‘তবে এক বুড়ি খ্রিস্টান
আমাদের বাড়িতে কাজ করত, আমি দাদি বলতাম; তিন কুলে
তার কেউ ছিল না, মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেই আমাকে
আপলে রেখেছিল। এই ইংরেজি আর সামান্য কিছু লেখাপড়া
সেই বুড়িই তো আমাকে শিখিয়েছে।’

‘তিনি মারা গেলেন কবে?’

‘দাদি মারা গেল আমার বয়স পনেরো বছর বয়স। তবুলাম
আমিও এবার বাঁচব না। তারপর, আমাকে একা দেখে এলাকার
দুশ্চরিত্র লোকেরা হাত বাড়াল। বলল তারা যদি আমাকে
ভালবাসে। তখন আমি সুন্দর ছিলাম।’

‘এখনও তুমি খুব সুন্দর, লোলি।’

‘এই নাক নিয়ে? ঠাট্টা কোরো না, রানা।’

‘ওই নাক তোমার চেহারার সামান্যই অঙ্গি করেছে,’ বলল
রানা। ‘আমি তো বিশেষ করে ওটাকে আরও গুরুত্ব দিই না এই
জন্যে যে তোমাকে ইচ্ছাধূনে নিয়ে ছোট্ট একটা অপারেশন করতে
খরচ পড়বে মাত্র বিশ হাজার টাকা—সেই অপারেশন নাক ফিরে
পাবে তুমি আবার!’

‘রানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল ললিতা। ‘তুমি মিথ্যা
কথা বলছ।’

‘সত্যি কথাই বলছি, লোলি। ঠিক আছে, নিজের চোখে
দেখলে বিশ্বাস করবে তো? আমি নিজে তোমাকে ইচ্ছাধূনে নিয়ে
গিয়ে অপারেশন করাব। সব খরচ আমার।’

‘সব খরচ তোমার?’ তুচ্ছ কোঁচকাল মেয়েটি। ‘কেন, তোমার
কী স্বার্থ?’

‘মানুষের খুঁতখুঁতানি দূর করতে ভাল লাগে আমার,’ বলল
রানা। ‘এই ভাললাগাটাই আমার লাভ বা স্বার্থ।’

‘তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইবে না?’

‘নাহ। তবে কিছু দিলে না করব না।’

‘মুখে হাত চাপা দিবে হেনে কেমন মেয়েটি। ‘তুমি না...’
কথাটা শেষ করল না সে।

‘দাদি মারা যাওয়ার পর কী হলো সেটা বলো। তখন তোমার
পনেরো বছর বয়স। তারপর কী হলো?’

‘সব কথা বলতে হলে একটু অতীতে ফিরে যেতে হবে

আমাকে... শুক করল ললিতা।

বাড়ির চারপাশে বিশাল আখ খেতগুলো ললিতাদেরই ছিল। কিন্তু অতিষ্ঠাবক বা আত্মীয়স্বজন না থাকায় এলাকার প্রভাবশালী লোকজন সে-সব বিনা বাধায় দখল করে নেয়। তবে খেতগুলোর মাঝখানে পুরানো বাড়িটার বিক্ষত কাঠামো তারা সরায়নি, খ্রিস্টান বুড়ি আর ললিতাকেও সেখান থেকে তাড়ায়নি।

বহুরে দু'বার আখ কেটে চিনি কলে পাঠানো হত। আর খেত থেকে আখ কাটা আরম্ভ হলেই ওখানে বসবাসরত জীব-জন্তু আর পোকা-মাকড় আতঙ্কিত হয়ে ছুটোছুটি শুরু করত। ওগুলো বেশিরভাগই আশ্রয় হারিয়ে মারা যেত। এ-সময়ে ওগুলোর কিছু কিছু ভাঙাচোরা বাড়িটার ভিতর ঢুকে পড়ত আশ্রয়ের খোঁজে। বেজি, সাপ, কাকড়া বিছা ইত্যাদি দেখে ভয়ে মরে যেত দাদি। তবে ললিতা এক কোণের দুটো কামরায় তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। ওগুলোকে কখনোই ভয় পায়নি সে, ওগুলোও তাকে কখনও বাধা দেয়নি। এই সব জীব আর কীট-পতঙ্গ যেন জানত তাদের সেবা-যত্ন করছে সে। ললিতার ভাষায়-নিশ্চয় তাদের বন্ধুদেরও কথাটা জানায় তারা, কারণ দেখা গেল কয়েক দিন পরই মিছিলের মত নতুন নতুন মেহমান চলে আসছে। যতদিন না আবার নতুন আখ গাছ গজাতে শুরু করবে, নিরাপদ এই আশ্রয় ছেড়ে তারা কেউ নড়বে না।

নিজেদেরই অভাব, তারপরও যতটুকু সম্ভব ওগুলোকে খেতে দিত ললিতা। আখ কাটতে আসা শ্রমিকরা তাকে দেখলে ভয়ে ছিটকে দূরে সরে যেত, কারণ তার গলায় হারের মত পেঁচানো থাকত একাধিক বিষাক্ত সাপ।

যাই হোক, তারপর ললিতার জীবনে দুর্ভোগ নেমে এল। তার খ্রিস্টান দাদি মারা গেল। কৃষ্ণ কুমারা নামে এক হিন্দু লোক ছিল এলাকায়। যে লোকটা ওদের জমিজমা জবরদখল করে নেয় তার ম্যানেজার ছিল এই কৃষ্ণ কুমারা। ললিতার কাছে

ঘন ঘন আসত সে, মিষ্টি কথায় তার মন ছোলাতে চেষ্টা করত। লোকটাকে খুব ভয় পেত ললিতা, তার ঘোড়ার আগুয়াজ পেলে লুকিয়ে পড়ত।

একদিন পায়ে হেঁটে এল কুমারা। আগুয়াজ পায়নি ললিতা। মদ খেয়ে এসেছিল সে। একটু পরই ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, কারণ তার কুপ্রস্তাবে বাড়ি হয়নি ললিতা।

লোকটাকে ছুরি দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু একজন শক্তিশালী পুরুষ মানুষের সঙ্গে পারবে কেন। প্রচণ্ড জোরে তাকে ঘুসি মারে লোকটা, ফলে তার নাকটা ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। আর সেই অবস্থাতেই তার সর্বনাশ করে পালিয়ে যায় কুমারা।

ললিতা ভেবেছিল তার পেটে বাচ্চা আসবে। সিদ্ধান্ত নিল পেটে এরকম জঘন্য লোকের বাচ্চা এলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে। ভাগ্য ভাল, সেরকম কিছু ঘটেনি।

লোকটা, কুমারা, আর ফিরল না। আগামী আখ কাটার মরশুম পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকল ললিতা। মনে মনে একটা গ্লান তৈরি করে রাখল সে।

নতুন মরশুম শুরু হতে তার অপেক্ষার অবসান ঘটল। এক দল র্যাক উইডো স্পাইডার এল তার আশ্রয়ে থাকার জন্য। সবচেয়ে বড়টাকে ধরে বোতলে ভরে রাখল ললিতা। দিনের পর দিন কিছুই তাকে খেতে দিল না।

তারপর অমাবস্যার এক রাতে বোতল থেকে ছোট একটা কাঠের বাঁক্রে ভরল ললিতা মাকড়সাটাকে। বাঁক্রেটা নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটল সে। অবশেষে হাজির হলো কুমারার বাড়ির বাগানে। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকল সে, খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল বিছানায় ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে কুমারা।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা গাছে চড়ল ললিতা, সেখান থেকে দোতলার কুল-বারান্দায়। কুমারার নাক ডাকার শব্দ না

শাওরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে কামরার ভিতর ঢুকল।

মশারির ভিতর উলঙ্গ হয়ে ঘুমাচ্ছিল শয়তানটা। মশারির কিনারা তুলে বাজুটা খুলল ললিতা, তারপর ঝাঁকিয়ে মাকড়সাটাকে ফেলল ঠিক তার পেটে। এরপর বাড়ি ফিরে এল সে নিশ্চিন্ত মনে।

‘ইয়াত্না মাবুদ!’ নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠল রানা। ‘লোকটার কী হলো?’

ললিতার কণ্ঠস্বরে আনন্দের সুর। ‘মরতে পুরো এক হুজ্বা সময় নেয় লোকটা। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছে। ওঝারা তো বলে, এই মাকড়সার বিষের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই।’ চুপ করল সে। রানা কোন মন্তব্য করছে না দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না কাজুটা আমি অন্যায় করেছি?’

‘এ ধরনের কিছুতে অভ্যস্ত হওয়াটা উচিত নয়,’ মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। ‘তবে এরকম একটা পরিস্থিতিতে তোমাকে আমি দোষ দিতে পারছি না। তারপর কী হলো?’

‘তারপর আবার কী, আমি খ্রিস্টান দাদির রেখে যাওয়া এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে অনেক কিছু শিখলাম, জানতে পারলাম কী ধরনের ঝিনুক থেকে নুজো পাওয়া যায়, কোনটার দাম বেশি।’

‘তারপর আকিয়াব বাজারের একজন এক্সপোর্টারের সঙ্গে পরিচয় হলো। লোকটা আমাকে ঠকায় না। এখন আমি ভাল রোজগার করি। তবে আমার এই ব্যবসার কথা কাউকে জানাই না। কেউ জানলে সমস্যা। তোমাকে দেখে সেজন্যেই ভয় পেয়ে যাই—ভেবেছিলাম তুমি আমার ঝিনুক চুরি করতে এসেছ।’

‘ভয় আমিও পেয়েছিলাম,’ বলল রানা। ‘তোমাকে ডব্বর গজনবির গার্ল ফ্রেন্ড মনে করে।’

‘অসংখ্য ধন্যবাদ, জনাব! আমার বয়েই গেছে এর গার্ল ফ্রেন্ড হতে।’

‘আচ্ছা, নাকটা ঠিক হয়ে গেলে কী করবে তুমি? যেতের মাকড়সানে এরকম একটা বিশৃঙ্খলক জায়গায় কেউ ডিবকাল থাকতে পারে না।’

‘তাবছি আমি একটা কমপার্ল হব,’ নির্বিকার চিত্রে বলে ফেলল ললিতা।

‘ঠিক কী বলতে চাইছ?’ রানার ধারণা কমপার্ল বলতে কী বোঝায় তা ললিতা জানেই না।

‘কিছু মেয়ে আছে না, শহরের সুন্দর সুন্দর জ্যাটে থাকে, দামি কাপড় পরে আর লেটেস্ট মডেলের গাড়িতে চড়ে? আমি ওদের কথা বলছি। লোকে কোন করে তাদের কাছে আসে। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা। বিনিময়ে টাকা পায় মেয়েটা। শুনেছি এ ধরনের মেয়েরা থাইল্যান্ডে নাকি প্রতিদিন দুইশো মার্কিন ডলার পায়। তাবছি ব্যাঙ্ক থেকেই শুরু করব আমি। আচ্ছা, অনভিজ্ঞ মেয়েদের কত করে দাও তোমরা?’

হেসে ফেলল রানা। ‘আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।’

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ললিতা। তারপর জানতে চাইল, ‘আমার প্র্যানটা তোমার কেমন লাগল।’

‘ওটা কোন প্র্যানই নয়, স্বেফ-পাগলামি,’ বলল রানা, সিরিয়াস। ‘এ-ধরনের মেয়েদের সমাজে কোন সম্মান নেই।’

হঠাৎ প্রিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল ললিতা। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পর পর কয়েকটা চুমো খেল রানাকে। ‘তোমাকে আমি পরীক্ষা করলাম, বুঝলে! তুমি আমাকে উৎসাহ দিলে বুঝতাম, তোমার মতলব ভাল নয়।’ একটু হাঁপাচ্ছে সে। ‘ওড নাইট, ডার্লিং রানা।’ আবার প্রিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল সে।

‘ওড নাইট।’

দশ

জরুরি ভিত্তিতে কেউ একজন রানার কাঁধ আঁকড়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

ওর কানে হিসহিস করল হোয়ে, 'পানির ওপর দিয়ে কিছু একটা আসছে, কর্নেল বস। এ নিশ্চয় সে-ই ড্রাগনটা!'

ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। ঢোক গিলে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'এখানেই থাকো তুমি,' বলল রানা। 'নড়বে না। একটু পর ফিরছি আমি।' হোয়েইকে পাশে নিয়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটল ও, পাহাড়ের কাছ থেকে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

ফাঁকা জায়গাটা থেকে বিশ গজ দূরে, স্যান্ডসপিটের ডগায় পৌছে থামল ওরা। এদিকেও পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে এক সারি ঝোপ। ডালপালা ফাঁক করে তাকাল রানা।

কী জিনিসটা? আধ মাইল দূরে এখনও, লেকের উপর দিয়ে আসছে, কমলা রঙের একজোড়া চোখসহ আকৃতিবিহীন বা কিছুতকিমাকার কিছু। এত দূর থেকেও চোখের কালো পাতা দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর মাঝখানে, যেখানে মুখ থাকার কথা, লকলক করছে এক গজ লম্বা নীল একটা শিখা। নক্ষত্রের স্থান আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে গম্বুজ আকৃতির মাথাটা, মাথার নীচে বাদুড়ের মত একজোড়া খাটো ডানা। জিনিসটা প্রায় কাতর স্বরে চাপা গর্জন করছে, সেটাকে ছাপিয়ে উঠছে আরেকটা

জাওয়াজ, হৃদবদ্ধ গভীর শব্দ-খড়-খড়-খড়-খড়।

খন্টায় দশ মাইল গতিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ওটা, পিছনে রেখে আসছে খোলাটে পানি।

ফিসফিস করল হোয়ে, 'গড, কর্নেল বস, কী ওটা?'

শিরদাঁড়া ঝাড়া করল রানা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। এক ধরনের ট্র্যাঙ্কর হতে পারে, ভয় দেখানোর জন্যে এটা-সেটা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ওটা ডিজেল ইঞ্জিনে চলে, কাজেই ড্রাগনের কথা ভুলে যাও।'

'পালাবার উপায় কী, কর্নেল বস?' ওকনো গলায় জিজ্ঞেস করল হোয়ে।

'পালাবার পথ নেই। কারণ আমরা জানি জলা আর ম্যানগ্রোভের ওপর দিয়েও ছুটতে পারে ওটা।'

'তা হলে?'

'এখানে দাঁড়িয়েই লড়তে হবে, হোয়ে। এসো, একটা প্ল্যান করি। ওটার দুর্বল স্পট কী বলো তো?' নিজেই জবাব দিল রানা। 'ড্রাইভাররা। আমাদের জানা নেই কতটুকু প্রোটেকশন পাচ্ছে তারা। হোয়ে, দুশো গজের মধ্যে চলে এলে তুমি ওটার গম্বুজ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে...'

'আপনি কী করবেন, কর্নেল বস?'

'আমিও গুলি করব-হেডলাইটে, পঞ্চাশ গজের মধ্যে এলে। ওটা ট্র্যাক-এর সাহায্যে চলে না। নিশ্চয়ই বিরাট আকারের কোন টায়ার হবে। প্রেনের চাকাও হতে পারে। ওগুলোতেও গুলি করব আমি। দশ গজ সরে গিয়ে পজিশন নিচ্ছি। মনে রেখো, ওরাও পাল্টা গুলি করতে পারে।'

'ওকে, কর্নেল বস।'

বালির উপর দিয়ে ছুটল রানা। কয়েকটা ঝোপকে পাশ কাটিয়ে এসে থামল, এখান থেকে গুলি করলে বুলেটের সামনে কোন বাধা পড়বে না। নরম সুরে ডাকল ও, 'লোলি?'

উড়ান, হান / কাছাকাছি থেকে আসে আসা কইয়ার খুঁ
৪ পদ।

উড়ান থেকে উড়েছিলো, মালিকের একটি লম্বা পায় খুঁ
করে। মেটী শিকড়ের পিছনে। তারপর আর পড়ে আর
কিছু খোঁজারি আর পায়।

কু-
উড়ানকে নিয়ে যা পায় মকর নেই। কিন্তু না, আর
করে না আর একটি মেটীর গাড়ির সহ সাজিয়েছে, ফেরার
উড়ান গাড়ির লোকজন আর। তার পায়ের একমুখ কিছু নেই
আমি জানই আমি।

উড়ান আর হান। মাকরান থেকে, তার মালিকের গা
থেকে আগ্রহের ফেরার উড়ান না।

হালি আর আর পায়ের একটি ইট্ট গাড়ি হান, তারপর
আড়াল থেকে উড়ান নিয়ে উড়ান।

উড়ানটি একমুখ আর আর উড়ানো গা নুর, এটির হান
ফেরারটি শাওরলিটের উড়ানিত করে কুয়েত। নীল শিক
একমুখ লোকের করে মুখের বইয়ে। এটা ফেরার উড়ান
মত করে উড়ান সোনালি হানের মুখের হা করা ফেরার মাকরান
থেকে। কিন্তু না, এক ফেরার একটি হান গা। কোন এক
ফেরার আড়ালি বর্নীর থেকে ফেরার নীল শিকটি। সেটা
একমুখ উড়ান। লোকের ফেরার নিয়ে এটির রেঙ কত হান?

উড়ান গাড়ি উড়ান ইয়ে ফেরার উড়ান। বিকল্প কুয়েত থেকে
আড়ানের একটি কুয়েত উড়ান। আরেকটা শিকের শট ফেরার
করার ফেরার, তারপর এক পদ।

কুয়েতের উড়ান ফেরার আড়াল করলেও কোন কতি
করতে পারল না। একমুখ গাড়িও এতটুকু মকর হান। এগিয়ে
আসতে আসতে মকর, কুয়েত গাড়ি উড়ানের নিকে ফেরার হান ঘুরে
থেকে একটি।

উড়ানকে গা হানি আর আর ফেরার মাকরান লোকের
করার হান। উড়ানটির একটি হান ই-এ মাকরান ফেরার
হান শিক আর ফেরারের হানি হান। উড়ান থেকে একটি
ফেরার। ফেরার থেকে সেটা।

উড়ান ফেরার লোক আর আর আর আর আর আর
একটিও লোকের পায় না হান। উড়ানটির গা উড়ানি মকর
হান। আর আর ফেরার উড়ানি উড়ান আর আর না এটা
ফেরার এগিয়ে আসতে কুয়েত আর ফেরার উড়ান লোক
করে।

উড়ানকে উড়ান করার হান। আর উড়ান আর আর
আর সোনালি হানের মকর হান মুটির নীল, আর আর ফেরার
উড়ানকরার নিকে। আর একমুখ আর উড়ান গা, উড়ান আর
করতে পায়ের কাছাকাছি উড়ানটির মকরার উড়ান লোকের
থেকে। কুয়েত। উড়ানি হান। হানার হান আর আর আর আর
লোক।

আর আর উড়ানকে উড়ান করার হান। আর উড়ান উড়ান
শিকের মকর। আর উড়ান থেকে আর আর আর আর
উড়ান উড়ান শিকের ফেরার উড়ান থেকে আর গা আর আর হান
পায়ের পায়ের হান থেকে, মকর শিক নেই।

আর আর উড়ানটির হান থেকে গা আর আর উড়ান আর
আড়ানের নীল শিক আর আর গা হান উড়ান, তারপর ফেরার
পায়ের পায়ের গা আর আর আর আর আর আর আর আর
লোকের থেকে উড়ান, তারপর লোক হান শিক গা। হানার
আড়ানকের ফেরার আর আর আর আর শিক নেই আর
সেই সতে উড়ান একটি উড়ান থেকে এক-এক মুটির পায়
পায় উড়ান আর আর থেকে সেটা। আর আর আর আর আর
উড়ানকে মুখের উড়ান থেকে শিক গা। তারপর মুখের একটি
ঘুরে উড়ান হান থেকে। মুখের নীল গা একটি আর আর আর আর

দিকে তাক করা।

ওখানে দাঁড়িয়ে নির্ধাত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে রানা।
চোয়ালের ভিতর তাকিয়ে ফ্রেম প্রোয়ার-এর জুলজুলে লাল
ফিলামেন্ট দেখতে পেল বড়সড় টিউবের গভীরে। হোয়ের
লাশটার কথা ভাবল ও-কালো হয়ে ওঠা, ধূমায়িত মৃতদেহ
পোড়া বালিতে পড়ে আছে। একটু পর সে-ও পরিণত হবে
জুলন্ত একটা মশালে।

হঠাৎ লাউড-হেইলারের মাউথপিসে টোকা পড়ার শব্দ হলো
টং-টং। যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। 'বেরিয়ে এসো,
ভেতো বাঙ্গালী। ডেমনি মেয়ে, তুমিও। জলদি, তা না হলে
সহকারীর মত তোমাদেরও পুড়িয়ে মারা হবে।' ওরুত্ব বোঝাবার
জন্য মুহূর্তের জন্য নীল শিখাটা খানিক লম্বা হলো। আগুনের
প্রচণ্ড আঁচ অনুভব করে পিছিয়ে গেল রানা। পিঠে মেয়েটির
স্পর্শ অনুভব করল ও। নার্সাস ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল সে,
'আসতে বাধ্য হয়েছি। আসতে বাধ্য...'

'ঠিক আছে, লোলি,' বলল রানা। 'আমার পেছনে থাকো
তুমি।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। আর কোন বিকল্প নেই।
এমনকী পরে যদি মরতেও হয়, এ মুহূর্তে যে ধরনের মৃত্যুকে
সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছে তারচেয়ে খারাপ হবে না
সেটা।

ললিতার কবজি ধরার জন্য হাত বাড়াল রানা, তারপর তাকে
পিছনে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল।

কর্কশ কণ্ঠস্বর গম গম করে উঠল। 'থামো ওখানে। ওউ
বয়। হাতের ওই গুলতিটা ফেলে দাও। কোন রকম চালাকি
কোরো না, করলে কাকড়াগুলো রান্না করা ব্রেকফাস্ট খাবে।'

হাতের অস্ত্র ফেলে দিল রানা। মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠল। তার
হাতে চাপ দিল রানা। 'শুভ হও, লোলি,' বলল ও। 'আমার

ওপর ভরসা রাখো। নিজেনেরকে আমরা ঠিকই রক্ষা করব।'

ধাতব আওয়াজ তুলে লোহার একটা দরজা খুলে পেল।
গম্বুজের পিছন থেকে পানিতে পড়ল এক লোক, ওদের দিকে
হেঁটে আসছে, হাতে একটা পিস্তল।

ফ্রেম-প্রোয়ার, অর্থাৎ তথাকথিত ড্রাগনের অগ্নিনির্বাপকের
পথ থেকে সরে থাকছে সে। লকলকে নীল খাটো শিখাটা তার
ঘামে ভেজা মুখ উদ্ভাসিত করে বেগেছে। লোকটা লম্বা-চওড়া
এক রোহিঙ্গা, শুধু ট্রাউজার পরে আছে। তার বাম হাত থেকে কী
যেন একটা কুলছে।

আরও কাছে আসতে জিনিসটা চিনতে পারল রানা।
একজোড়া হ্যান্ডকাফ।

কয়েক গজ দূরে থামল লোকটা। বলল, 'হাত দুটো বাড়ান।
কবজি দুটো এক করে। তারপর আমার দিকে হেঁটে এস তুমি
আগে, বাঙ্গালী। ধীরে ধীরে, তা না হলে তোমার নাতীর সংখ্যা
দুই হয়ে যাবে।'

তার কথামত কাজ করল রানা। লোকটার ঘামের গন্ধ নাকে
নিয়ে থামল ও। পিস্তলটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে হাত
বাড়াল লোকটা, ওর কবজিতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল।
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'শালা বাঙ্গালী!' খেঁকিয়ে
উঠল লোকটা।

তার দিকে পিছন ফিরে হাঁটা ধরল রানা। ইয়ে হোয়ের
লাশটা দেখতে যাচ্ছে। বেঁচে যখন নেই, অগত্যা লাশের কাছ
থেকেই বিদায় নিতে হবে।

অকস্মাৎ একটা পিস্তল গর্জে উঠল। রানার পায়ের কাছে
বালি ওড়াল একটা বুলেট।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ধীরে ধীরে ঘুরল। 'নার্সাস হয়ো না,'
বলল ও। 'তোমরা এইমাত্র যাকে খুন করেছ তাকে দেখতে
যাচ্ছি আমি। এখনই ফিরছি।'

[illegible][illegible]

ହାତର ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ଗଲବଳେ ସାମନେ ଏକାଧାର ନିର୍ମଳ ଓ
ସାନ୍ଦ୍ରୀ । ଏହି ବୁଡ଼ ଦ୍ରାଘ୍ୟର ଲିଫ୍ଟ ନିକେ ତୁଳ ଏକ ପ୍ର
ଶ୍ୱାସକ୍ଷମ ହୋଇ ଆଗରେ ଶ୍ରୀକା ଏକା ନିଜର ରାଜ୍ୟ

সত্যতার ভিতর থেকে কথা বলে উঠে কেউ একজন
সত্যতার দিকে মোড়কে আসে। কিছু যোগ্যতা না থাকলে অল্প
কিছু আসে।

মাথা বুঁদিয়ে লোহার ব্যাকের ভিতর ঢুকল চরা। ভিতরে ঘন
অর ভেতলের গন্ধ। ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে ঢুলে কোন
ককমে বসল জায়গাটুকুই শুধু পাওয়া গেল। পিঙ্কলধারী লোকটি
ভিতরে ঢুকে খটখট করে বন্ধ করে দিল দরজা। একটি বোতাম
টিপে আলো জ্বলল সে, বসল দুইভারের পাশের লোহার সিটে
বলল, 'ছাড়ো, ইরশাইন্যা। আঙুনটা নিভিয়ে নিতে পর
চলার মত যথেষ্ট আলো আছে।'

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে কয়েক সারিতে ভায়াল, লিভার, সুইচ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে কয়েক দুটো সুইচ অন করল ড্রাইভার। মেশিনটার পিয়ার দিকে সামনের সব ফাটলে জোখ রাখল সে। রান্য অনুভব করল মেশিনটা ঘুরছে। ইঞ্জিনের

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

महाराष्ट्र राज्य सरकार
मुंबई, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार
मुंबई, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार
मुंबई, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार
मुंबई, महाराष्ट्र

[illegible]

କଟକ ନିକଟ ଲୋକମାନେ ଚିଲିକା ବା, ଏହି ଅବସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ-ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥିତିର ନିମ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୧

এখনও রান্না ছাড়া না বাদলটি জানালার খিঁচা দিয়ে আর
সেনারি রান্না, চোখ-কানসাৎ নকশার নীচে এটা সফরত কোন
ধরনের ট্রাউটার। অল্পত সইবার বদলানো কোনও জিন্স যে না
তাকে কোন সাক্ষর নেই। জানালের নিচের ট্রাউটারের ছায়া এটা
সমান উঁচু। ওজনের কোনও কোম্পানির নাম কিংবা ট্রাউটার
সেখানেও। বেডিয়েটারের সামনে কথা একটা মৌলিক ছায়া
হাথা বসানো হয়েছে। হেল্পারের মাঝখানে আঁকা হয়েছে
'চোখ'। তবে মেশিনটা এই অফিসের ছায়ায় খুব কাছে
লাগছে-পানি, ম্যানগ্রোভ কোণ, চাষ, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি কিছুই
এটার পাশে কথা হয়ে শাঁড়তে পারছে না।

গোটা ব্যাপারটার মধ্যে পেশাদারিত্বের ছাপ আছে, প্রশংসা না করে পারা যায় না। ডক্টর গজনিবি এমন একজন মানুষ, কিছু অর্জন করার জন্য অকাতরে মেধা আর শ্রম দিতে রাজি। শিগগির তার স্বপ্ন দেখা হবে রানার। আশা করা যায় তার গোপন কাজ-কারবার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপর?

রানার মুখে গম্ভীর একটু হাসি ফুটল। গোপন তথ্য নিয়ে অয়েস্টার দ্বীপ ছাড়তে দেওয়া হবে না ওকে। পালাতে না পারলে নির্বাসিত খুন করা হবে। আর মেয়েটিকে? রানা কি প্রমাণ করতে পারবে সে নির্দোষ? পারলেও কি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে? মনে হয় না।

লোক থেকে শক্ত জমিতে উঠে পড়ল ওদের বাহন। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ঘর-বাড়িগুলোর দিকে এগোচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওখানে।

কো-ড্রাইভার কাঁধের উপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল একবার। চোখাচোখি হতে হাসল রানা, বলল, 'এর জন্যে মেডেল আর নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে তোমাকে।'

'চোপ! শালা, বাঙ্গালী!' দাঁত-মুখ বিচাল লোকটা। ঘাড় সোজা করে নিল সে।

রানার গায়ে মৃদু খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করল ললিতা, 'এত কর্কশ কেন ওরা? আমাদেরকে এত ঘেন্না করার কী কারণ?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কারণটা বোধ হয় এই যে ওদেরকে আমরা ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আমরা ওদেরকে ভয় পাচ্ছি না, এটাই ওদের ভয় পাবার কারণ। এই ভাবটা ওদের সামনে ধরে রাখতে হবে।'

রানার গায়ের সঙ্গে আরও একটু সঁটে এল মেয়েটি। 'ঠেঁসে করব।'

চড়াইটা এখন খুব খাড়া। আর্মার-এর গায়ে সরু ফটল

হয়েছে, সেগুলো দিয়ে গ্রান আলো ঢুকছে ভিতরে। ভোর হচ্ছে দ্বীপটার। রানা ভাবল, নতুন এই ভোর সেখানে পারবে না সাহসী, সহ একজন মানুষ-ইতে হয়েছে। ওর উপর তার আস্থা ছিল। তাকে হত্যাশ করেছে ও। ও কি মেয়েটার মৃত্যুর জন্যও দায়ী হবে?

ড্যাশবোর্ডের দিকে হাত বাড়াল ড্রাইভার। মেশিনটার সামনে থেকে কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী পুলিশ সাইরেন বেজে উঠল। একটা সুইচ অন করে পাশের দরজা থেকে মাইক্রোস্কোপ তুলে নিল লোকটা। তার কথা ওনতে পাচ্ছে রানা।

'ওকে। বাঙ্গালী লোকটা আর মেয়েটাকে ধরেছি।' অপর লোকটা মারা গেছে। এটুকুই। বোলো।'

আয়রন রোলার-এর ঘড় ঘড় আওয়াজ শোনা গেল, রানা বুঝতে পারল ওটা একটা দরজা খোলার শব্দ। ক্রাচ দিল ড্রাইভার, কয়েক গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওদের বাহন। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। বাইরে থেকে হ্যাচটা খোলার সময় ঘটান করে আওয়াজ হলো। কেবিনের ভিতর তাজা বাতাসের ছাপটা আর উজ্জ্বল আলোর বন্যা ঢুকে পড়ল। একজোড়া হাত খামচে ধরল রানাকে, টেনে নামিয়ে আনল সিমেন্টের মেঝেতে। সিঁধে হলো রানা। কোমরের একটু উপরে পিষ্টলের খোঁচা অনুভব করল। কেউ একজন বলল, 'যেখানে আছ সেখানেই থাকো। কোন চালাকি নয়।'

ধীরে ধীরে ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল রানা। এ আরেকটা রোহিঙ্গা, চিবুকে ছাগলদাড়ি। ছোট আকৃতির চোখে উপচে পড়ছে কৌতূহল। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আরেক দিকে তাকাল রানা।

অন্য এক লোক পিষ্টল দিয়ে খোঁচা মারছে মেয়েটিকে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল রানা, 'খবরদার, ওকে বিরক্ত করবে না।' দৃঢ় পায়ে হেঁটে এসে ললিতার পাশে দাঁড়াল ও। লোক দু'জনের

বিস্মিত দেখাল। দাঁড়িয়ে থাকল তারা, যেন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। নদী থেকে দেখা লম্বা ঘরগুলোর একটায় রয়েছে ওরা। এটা একাধারে গ্যারেজ আর ওঅর্কশপ। কংক্রিটের মেঝের উপর তৈরি একটা এগজামিনেশন পিট-এ তোলা হয়েছে 'ড্রাগন'কে। সদ্য খোলা আউটবোর্ড মোটরটা বেঞ্চগুলোর একটায় রাখা হয়েছে। চওড়া ফিতের মত সারি সারি সোডিয়াম লাইট জ্বলছে সিলিঙে। বাতাসে ধোয়া আর তেলের গন্ধ। ড্রাইভার আর তার সহকারী পরীক্ষা করছিল মেশিনটা। এই মাত্র তাদের কাজ শেষ হলো।

গার্ডদের একজন বলল, 'কী মেসেজ দেব তাড়াতাড়ি বলো। নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পৌছানো মাত্র ওদেরকে পাঠিয়ে দিতে হবে। সব ঠিকঠাক ছিল তো?'

কো-ড্রাইভার, এদের মধ্যে সে-ই বোধ হয় সিনিয়র, বলল, 'শিওর। সামান্য গোলাগুলি হয়েছে। ল্যাম্প গুঁড়িয়ে গেছে। টায়ারে হয়তো কয়েকটা ফুটো পাওয়া যাবে। মেকানিকদের তাগাদা দাও-ফুল ওভারহল। এদের দু'জনকে পৌছে দিয়ে আমি ঘুমাতে চলে যাব।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ঠিক আছে, সামনে বাড়ো।' ইঙ্গিতে লম্বা ঘরের দূর প্রান্তটা দেখাল।

রানা বলল, 'সামনে তুমি বাড়ো। কথা বলার সময় ভদ্রতা বজায় রাখবে। আর ওই দুই বান্দরকে বলো পিস্তল ঘুরিয়ে নিক। ভয় পেয়ে গুলি ছুঁড়ে বসতে পারে। ওদেরকে আমার যথেষ্ট হাবা বলে মনে হচ্ছে।'

লোকটা রানার কাছে সরে এল। বাকি তিনজন ভিড় করল তার পিছনে। ঘৃণায় আর রাগে লাল হয়ে আছে তাদের চোখ। সামনের লোকটা ডান হাত মুঠো পাকিয়ে রানার নাকের নীচে তুলল। অনেক কষ্টে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখছে সে। হিসহিস করে বলল, 'শোনো, হে, বাঙ্গালী। শেষ দিকে মাঝে-

মধ্যে আমাদেরকেও মজা লোটোর সুযোগ দেয়া হয়। প্রার্থনা করছি এবার যেন সেই সুযোগ আসে। একবার আমরা পুরো এক হপ্তা চালিয়ে গেছি। আহ, শালা, তোমাকে যদি পাই, রে...' ধেমে গেল সে, নিষ্ঠুরতায় জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। রানাকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি ছুটে গেল মেয়েটির দিকে।

তার চোখ দুটো হয়ে উঠল মুখ, সেই মুখ থেকে লোলা ঝরছে। ট্রাউজারে হাত মুছল কো-ড্রাইভার। জিভের ডগা বের করে ঠোট চাটল। বাকি তিনজনের দিকে ফিরল সে। 'তোমরা কী বলো, ভায়েরা?'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল তারা।

হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যান্ডকাফ পরা হাত দিয়ে লোকগুলোর খুলি ফাটাবার প্রচণ্ড ইচ্ছেটাকে অতি কষ্টে দমন করল রানা। মেয়েটি না থাকলে হয়তো ঝুঁকিটা নিতে পারত। তার বদলে বলল ও, 'ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা তোমাদেরকে মারছি, না ধরছি? ভয় পেয়ে কিছু করে বোসো না। ডক্টর গজনবি ব্যাপারটাকে ভালভাবে না-ও নিতে পারেন।'

নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোর চেহারা বদলে গেল। তিন জোড়া চোখ বারবার পালা করে রানা আর লিডারকে দেখছে।

কয়েক সেকেন্ড চোখে তীব্র সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লিডার লোকটা, চিন্তা করছে, বুঝতে চাইছে তার বসের সঙ্গে রানার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে কিনা। কিছু বলার জন্য মুখ খুলল সে। সিদ্ধান্ত পাল্টে আবার সেটা বন্ধ করল। তারপর ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা এমনি ঠাট্টা করছিলাম।' লোকগুলোর দিকে আবার ফিরল সে। 'তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠাট্টা করছিলাম।' একযোগে বলল তারা, তারপর চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

লিডার লোকটা ভারী গলায় বলল, 'এদিকে, মিস্টার।' লম্বা ঘরের আরেক দিকে হাঁটা ধরল সে।

তার পিছু নিল রানা, মেয়েটি হাঁটছে রানার পাশাপাশি। ডক্টর গজনবি নামটার ওজন আর গুরুত্ব লক্ষ করে বিস্মিত হয়েছে ও।

কামরার শেষ মাথায় একটা কাঠের দরজা। কবাট দুটো সম্ভবত কখনোই পালিশ করা হয়নি। দরজার পাশে একটা বোতাম। সেটা দু'বার টিপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা।

দরজা খুলে গেল। দশ গজ পাথরের প্যাসেজ, তার উপর কার্পেট। সামনে আরেকটা দরজা-এটা সুন্দর, ক্রিম কালার দিয়ে পেইন্ট করা।

এক পাশে ঝরে দাঁড়াল লোকটা। 'সোজা চলে যাও, মিস্টার। দরজায় নক করো। রিসেপশনিস্ট সব ব্যবস্থা করবে।' গলার আওয়াজে বিদ্রূপ বা নিষ্ঠুরতার ছিটোফোঁটাও নেই। বরং চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন সমীহের ভাব লক্ষ করা গেল।

মেয়েটিকে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা। পিছনের দরজাটা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ওরা। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, মেয়েটির দিকে তাকাল। 'এরপর কী?'

ললিতার ঠোঁটে কাঁপা হাসি। বলল, 'পায়ের নীচে কার্পেট ভাল লাগছে।'

তার কবজিতে চাপ দিল রানা। ক্রিম কালারের দরজার দিকে এগোল ও। তারপর নক করল।

দরজা খুলে গেল। মেয়েটিকে পিছনে নিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ও, কিন্তু ওর পিঠে ধাক্কা খেল না ললিতা। ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা।

এগারো

ওরা যেন কোন দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর রিসেপশন হল-এ দাঁড়িয়ে আছে। কাশ্মীর থেকে আনা কার্পেটে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। দেয়ালের রঙ লালচে ওয়াইন। সিলিং কোমল বাদামী। ব্যালে শিল্পীদের আকর্ষণীয় নৃত্যভঙ্গিমা আর বার্মিজ নর্তকীদের বাঁশ নৃত্যের আশ্চর্য মুদ্রা সিল্কের উপর স্কেচ করে দেয়ালের নানা জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আলো আসছে সাতফুট উঁচু আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প থেকে, শেডগুলো সবুজ সিল্ক।

রানার ডান দিকে চওড়া একটা মেহগনি ডেস্ক, সবুজ লেদার টপ সহ। ফার্নিচারগুলো ডেস্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা। ইন্টারকম সেটটা অত্যন্ত দামী। ভিজিটরদের জন্য দুটো অ্যান্টিক চেয়ার দেখা যাচ্ছে।

রিসেপশনের আরেক দিকে একটা টেবিল, সঙ্গে দুটো চেয়ার। টেবিলের উপর কয়েকটা ম্যাগাজিন আর দৈনিক পত্রিকা। ডেস্ক আর টেবিল, দুটোতেই নানা জাতের তাজা ফুলসহ ফ্লাওয়ার ভাস দেখল রানা। বাতাস ঠাণ্ডা আর তাজা লাগল ওর কাছে, কীসের যেন হালকা সুবাস আছে।

এত বড় হলে শুধু দুটো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে মাথায় সাদা স্কার্ফ জড়ানো সুন্দরী এক তরুণী, একটা প্রিন্টেট ফর্ম-এ হাতের বল-পয়েন্ট তাক করা। তার চশমার ফ্রেম শিং দিয়ে তৈরি। অমায়িক হাসিতে শয়তানের দ্বীপ

উদ্ভাসিত হয়ে আরও জোরে, সসর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য
হঠাৎ।

সরাসরি করে মিলিয়ে রাস্তায় একটু ব্যস্তা এক মহিলা। এই
সরাসরি নিশ্চয়ই হল। ও বুকেরে বসে আর ললিতা। ওরা আত্মক
সামনে ব্যস্তা সরাসরি ভিতর থেকে বসে করতে পারে মহিলা।
এর অধ্যাক্ষেপ সাদা স্বাক্ষর। ওই স্বাক্ষর নর, দু'জনেই সাদা সাদা,
সাদা মোজা, সাদা সেন্সার ও, আর সাদা ট্রাউজ প্যারে আর।
দু'জনেই আরও জেঁকিল। পাতের ওই ফ্যাকটসে, তার ব্যস্ত
স্বাক্ষর বইয়ে বুর কম বেগেই তার।

স্বাক্ষর মহিলায় কষ্টের থেকে মাতৃসুলভ হের উৎসে উঠল।
'সেইটি লক্ষী সেন্সার।' অসলে জানতামই না ঠিক কখন আসে
তোমরা। সেই কখন থেকে ব্যস্তার ওই কলা হঠাৎ-বস্তু হয়ে
সেই তোমরা, প্যারে করেছ। এখন বসে এলো কাল বিকোলে,
ব্যস্তার ভিন্যারের সময়। আর আজ এই মাত্র আশে ফস্টা আসে
আমরা জানলাম প্রেক্ষাস্ট থেকে আসে তোমরা।

হাস্যের নিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ললিতা।

'আমি, খিনেতে কষ্ট পাচ্ছি তোমরা,' বানা জায়গা থেকে
নিয়ে সরাসরি বসে করল মহিলা, ওদেরকে নিয়ে ডেকের নিকে
এলো। 'এসো, সিস্টার শায়লা বাবুলাকে নিয়ে তোমাদের
ফর্মডলো পূরণ করাই। তারপর সোজা বিছানায় তুলে নিয়ে
আসব। নিশ্চয়ই খুব প্রাণি বোধ করছ।'

ওদেরকে ডেকার দুটোয় বসাল সে। কামাই না নিয়ে বকবক
করে চলছে। 'আমি সিস্টার কিতাই-কিতাই মুনিয়ে। সিস্টার
বাবুলা, তাড়াতাড়ি করো! এক কথা কতবার বলব
তোমাদেরকে, রোগীদের কোন অবস্থাতেই কষ্ট দেয়া যাবে না।
ফর্ম তুমি একটু পরে পূরণ করো, আগে চাবি দাও। বাইরের
ওই স্টাফ, উফ! হাজার বার নিষেধ করেছি, পেশেন্টদের এভাবে
এনো না!'

সিস্টার বাবুলার কল থেকে তারি নিজে বসে ব্যস্তার
কল সিস্টার মুনিয়ে। জোরে লিখতে লিখে ব্যস্তার
হাতের থেকে নিজে গেল।

'বাবুলাস,' হাত আর কিছু কল আর কল সেল না কল

'এবো, যদি কিছু হলে না কল,' সিস্টার বাবুলা সব
কল আর কল সব একটা জায়গায় নিয়ে কল পড়। 'সিস্টার
জায়গার নাম, মিস্টার...'

'মামুন বসি।'

সিস্টার লিখতে সিস্টার বাবুলা। 'হুই টিফনস'

'কেনো অত ব্যস্তার জলজল সেন্সারটি, কামে
আত্মক একমিটি, কামে, কাম, ব্যস্তার...'

'পেশা'

'অবিন্যাসিত।'

'সেইটি' হেসে উঠে গলে গেল জেল প্যারে বাবুলা।
'বানান করবেন, সিস্টার'

কল বানা।

'বানান। এবার-ভিজিটের কারণ।'

'পাখি,' কল বানা। 'আমি একই সঙ্গে এটা-আর
সেন্সারটিরও প্রতিনিধি করছি। এই হুইপের একটা অংশ
তাদের লিড নেয়া আছে।'

'আজ্ঞা, তাই নাকি?' বানা লক করল ও যা কল হেরিক তাই
লিখতে সিস্টার বাবুলা। ওর শেষ উত্তরটির দুই হাতে প্রাকট
আত্ম সে।

'আব,' মিটি করে হেসে ললিতার নিকে তাকাল বাবুলা,
'আপনার স্ট্রী? উনিও কি পাখি সম্পর্কে জানেই?'

'হ্যাঁ, খুবই।'

'তার নিজের নামটা?'

'টায়রা ললিতা।'

‘বাহ, কী সুন্দর নাম!’ মিষ্টি করে হাসল সিস্টার বান্দুলা। ‘এবার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নাম বলুন, ব্যাস, খামেলা শেষ।’

দু’জনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে বিসিআই চিফ রাহাত খানের নাম বলল রানা। ‘আমার আংকেল,’ বলে পরিচয় দিল, ঠিকানা বলল—‘গ্লোবাল ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।’

লেখা শেষ করে সিস্টার বান্দুলা বলল, ‘ধন্যবাদ, মিস্টার রাহি। আশা করি আমাদের এখানে আপনাদের সময় আনন্দ আর আরামে কাটবে।’

‘ধন্যবাদ,’ বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। ওর দেখাদেখি ললিতাও দাঁড়াল, চেহারায় কোন ভাব নেই।

সিস্টার মুনিয়া বলল, ‘এবার আমার সঙ্গে চলো, বেচারি লক্ষ্মীসোনারা।’ হেঁটে দূর প্রান্তের একটা দরজার সামনে এসে থামল সে, হাত রাখল কাট-গ্রাস ডোরনব-এ। ‘দেখো দেখি কাণ্ড! ওদের কামরার নম্বর ভুলে গেছি! ক্রিম স্যুইট, তাই না, সিস্টার বান্দুলা?’

‘হ্যাঁ, ক্রিম স্যুইট—বারো আর তেরো নম্বর।’

‘লক্ষ্মীসোনারা, এসো,’ দরজাটা খুলল সিস্টার মুনিয়া। ‘বেশ অনেকটা হাঁটতে হবে।’ ওদের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে পথ দেখাল সে। ‘ডক্টর প্রায়ই এক্সক্লেটর লাগাবার কথা বলেন, কিন্তু বোঝাই তো, ব্যস্ত একজন মানুষ কতদিক সামলাবেন!’ হেসে উঠল। ‘বিভিন্ন কাজে জীবনটা শুধু উৎসর্গই করে গেলেন। এর বুঝি কোন শেষ নেই।’

‘ঠিক বুঝলাম না,’ বলল রানা। ‘কী কী কাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন ভদ্রলোক?’

‘মানুষের সেবা করাটাকে জীবনের একটা ব্রত হিসেবে নিয়েছেন ডক্টর,’ বলল সিস্টার মুনিয়া, শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল

তার চোখ-মুখ। ‘তিনি একজন বিজ্ঞানী, অনেক বছর হলো বিজ্ঞানের চর্চায় উৎসর্গ করেছেন নিজেকে। তারপর ধরুন সম্পদ আহরণ। খালি হাতে তো মানুষের সেবা করা যায় না। তাই সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু করেছেন তিনি। এরকম ক’টার কথা বলব? মানব সভ্যতার কল্যাণ করতে চাইলে রাজনৈতিক ক্ষমতা একান্ত দরকার। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে হলে চাই সশস্ত্র সেনাবাহিনী। ডক্টর রক্তপাত পছন্দ করেন না, তাই মেকানিকাল সৈন্য তৈরির কাজেও উৎসর্গ করলেন নিজের জীবনটাকে...’

‘এতক্ষণে বুঝলাম,’ শ্রান সুরে বলল রানা। ‘ভাবল, তা হলে দেখা যাচ্ছে ঠিক জায়গাতেই টুঁ মারছে ও। ললিতার হাত ধরে জননীসুলভ স্থল কাঠামোটাকে অনুসরণ করছে রানা। নির্জন করিডরটা একশো গজের কম হবে না।’

মুনিয়া যতই বকবক করুক, তার সব কথা শুনছে না রানা। আশ্চর্য একটা পরিবেশে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে ওকে, বিষয়টা ভুলে থাকা যাচ্ছে না। তরুণী বান্দুলা আর বয়স্ক মুনিয়া যে নির্ভেজাল, এ-ব্যাপারে রানা প্রায় নিশ্চিত। তাদের আচরণে বা কথাবার্তায় বেমানান কিছু নেই। রিসেপশন হলে, করিডরেও, প্রতিধ্বনি বা অনুরণনের অভাব প্রমাণ করে লম্বা ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ভিতর ঢুকেছে ওরা, এই মুহূর্তে সম্ভবত হাঁটছে পাহাড়টার ভিত ধরে।

রানা আন্দাজ করল পশ্চিম দিকে এগাচ্ছে ওরা—পাহাড়-প্রাচীরের দিকে, দ্বীপটা যেখানে শেষ হয়েছে। দেয়ালে সঁাতসেঁতে কোন ভাব নেই, ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শই বলে দিচ্ছে কোথাও থেকে ছুটে আসছে ওদের দিকে। অটেল টাকা আর উচ্চ মানসম্মত ইঞ্জিনিয়ারিং অবদান রেখেছে কাজটায়। চামড়ার ফ্যাকাসে ভাব বলে দেয় সিস্টার দু’জন নিজেদের সবটুকু সময় পাহাড়ের ভিতরই কাটায়। সিস্টার মুনিয়ার কথা থেকে বোঝা

গোরে, ভিতরের আর বাইরের সীক আলানা-সিসটীর বোম্বার
জানের না কী ধরনের লোক তারা, "কী কাজই বা করানো যা
জানেনাকে নিয়ে।

নরজার সামনে পৌছে বেশ বাজাল সিসটীর মুনীয়া। জন্ম
ছিল ওরা আসছে, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা। কুলের নরশ
আঁকা পাটন পরা এক রোহিঙ্গা তরুণী দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে উঠ
অভ্যর্থনার হাসি হাসছে। এখানেও আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছু
দেখা যায় না।

সিসটীর মুনীয়া বলল, "অবশেষে ওরা পৌছোছে, মাউর
মোনা। সিসটীর আর মিসেস মামুন বাহি। এ হলো মোনা। ভাগি
লক্ষী মেয়ে। ও-ই তো তোমাদের দেখাশোনা করবে। রোগীর
সবাই ওকে শ্রদ্ধা করে।"

রোগীরা, চাকল বানা। শব্দটা আরও দু'একবার শুনেছে ও।
নতুন মেয়েটার দিকে ফিরে মনু হাসল ও। "হাট দু ইট দু।
আমরা কান্না, ফাটলো দেখিয়ে দিচ্ছি..."

"আপনারা আসছেন শুনেই ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়েছি
আমি," বলল মাউর মোনা। "আমরা কী..." করিডর চান-বাম
দু'দিকেই এগিয়েছে। মেঝেতে ছে বাজের কাপেট। দু'সারি
নরজার পায়ে নম্র রেখা। করিডরের শেষ মাথায় পাশাপাশি
দুটো কামরার নম্র বারো আর তেরো। বারো নম্রের নরজা
কুলল মোনা, তার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা।

আরামপ্রদ, আধুনিক চাকল বেডরুম, দেয়ালগুলো গাঢ়
সবুজ, টেক্সট পালিশ করা মেহগনি কাঠের মেঝের কোথাও
কোথাও কাশ্মীরী কাপেট ফেলা, সুদৃশ্য ডিজাইনের বাস
কানিচর, সেগুলো পায়ে সাদা রঙের টপার আঁকা হয়েছে বড়
আকৃতির লাল পোলাপ। সংলগ্ন দুটো নরজার একটোর ভিতর
পুরুষালী ট্রেনিংসে, আরেকটোর ভিতর টাইমসের বাঙালি অফ
হুদে সুইমিং পুস।

চোখে-মুখে প্রত্যাশা নিয়ে ওদের দিকে পলা করে তাকিয়ে
মোনা।

ললিতার দিকে ফিরল বানা, টোটো আদর করে হাসি, "খুব
আরামদায়ক মনে হচ্ছে, তাই না, ভাগি?"

ললিতা তার ছাট্টের কিনারা নড়াচড়া করছে। মধ্য বীজল
সে, রানার দিকে না তাকিয়ে।

মনু নর হাসো নরজার। মোনার হাতই সূক্ষ্ম একটা মেয়ে
চুকল ভিতরে, হাতের তালুতে ট্রে ভর্তি ব্রেকফাস্ট। মধ্যবনের
ট্রেবিলে ট্রে রোখে ওরার দুটো টিকতাবে বসল সে। ডিশগুলো
লিনেন দিয়ে ঢাকা, টান দিয়ে বেগলো সরিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে
গেল কামরা ছেড়ে। মখন, কুটি, সেহ, হটবকটি,
পোলমরিসের ওভেন ছড়ানে পোত করা দুপাখি ডিম, চিকেন
দুপ, জুস আর কফি।

চোখ বুলাতেই ওদের খেট মোড়ক নিয়ে উঠল।

"ক্যাবার্টে প্রচুর নতুন পোশাক আছে, আপনারা
সাইজেরই। ওয়ান্ড্রোর কম মাত্র কল সফার অর্ডার পেয়েছে
ওঁরা মাহেনর কটিন নির্দেশ নিয়ে ফেলছেন, আপনারাও
বিরক্ত করা যাবে না। তিনি টেক্সটুর বোঝ করবেন, আপনারা যদি
আজ সফার ডিনারে চীকে মক কেন। পরিবেশ পরিচিতির সঙ্গে
খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য আপনারাও সবারই দিন সময় দিতে
চান তিনি।" অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ওদের দু'জনকে দেখেই সে
"আমি কি..."

"হ্যাঁ, ফিজ," বলল বানা। "চীকে মক, খুশি মনে তাঁর
সঙ্গে ডিনারে বসব আমরা।"

"বনীবান," বলে মল্ল পেল মোনা।

ললিতার দিকে তাকাল বানা। বিকৃত বা অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে
তাকে। রানার কোথাক এড়িয়ে থাকছে। এ ধরনের বিলাসিতার
সঙ্গে পরিচিত নয় সে। তার মুখে তার মন কখনো তরুণ না

লেনে রয়েছে। কাপড়চোপড়ের অবস্থা সম্পর্কে কিছু না বলে ভাল।

এদিয়ে এসে তার হাত দুটো ধরল রানা। 'লোলি, এখানে আমরা হচ্ছি একজোড়া কাকতালুয়া। বলো তো আগে কী করব, কাপড় ছেড়ে শাওয়ার সারব, নাকি গরম থাকতে থাকতে ব্রেকফাস্ট করব?'

'শাওয়া আর আরামের কথা ভাবছ তুমি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ললিতা। 'আমাদের কপালে কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে কোনও চিন্তা নেই?' হাত তুলে কামরাটা দেখাল সে। 'তোমার মনে হচ্ছে না এ-সব আসলে একটা ফাঁদ?'

'এটা যদি ফাঁদ হয় তা হলে তাতে আমরা আটকা পড়ছি। পেট ভরে নাস্তা করা ছাড়া এই মুহূর্তে করার কিছু নেই আমাদের। আর চিন্তা বা দুশ্চিন্তার কথা যদি বলো, ও-সব তুমি নিশ্চিত মনে আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মুখ তার করে অন্যদিকে তাকাল ললিতা।

'এক ঘণ্টা আগের কথা চিন্তা করো, কোথায় ছিলাম আমরা। তারচেয়ে এটা ভাল নয়? গোসল নাকি নাস্তা?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ললিতা বলল, 'ইয়ে, মানে, ঠিক আছে...প্রথমে পরিষ্কারই হতে চাই।' তারপর দ্রুত বলল, 'কিছু আমাদের তোমার সাহায্য করতে হবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বাথরুমের দরজাটা দেখাল। 'এ-ধরনের সুযোগ-সুবিধা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা নেই আমার।'

'ঠিক আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি সব; পানির মত সোজা। তুমি গোসল করবে, আমি ব্রেকফাস্ট সারব।' একটা কাবার্ড খুলে ভিতরে তাকাল রানা। বেশিরভাগই বার্মিজ ড্রেস-সারং, ব্লাউজ, স্কার্ফ আর লুঙ্গি। তবে একজোড়া ট্রাউজার আর শার্টও আছে। 'তুমি তোমার কাপড় বাছাই করো, ততক্ষণ আমি তোমার বাথ রেডি করি।'

কৃতজ্ঞাচিত্তে হাসল ললিতা। 'তুমি যদি আমাকে দেখিয়ে দাও...' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল সে।

বাথরুমে ঢুকে পানির কলগুলো ছাড়ল রানা, মিনি সুইমিং পুলটা ভরছে। ভিতরে পা নিয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ললিতা। 'তখন তুমি ওসেবকে বলো আমরা বিবাহিত।'

খুরল রানা। ললিতা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের সঙ্গে কথা হচ্ছে রানার। নয় কেন? নয় কেন? বোকামি কোরো না। এটা একটা সময় হলো? তোমরা দু'জনেই মারাত্মক বিপদের মধ্যে রয়েছ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে বরফের মত ঠাণ্ডা থাকতে হবে তোমাকে। পরে, জাই, পরে। দুর্বল হয়ো না।

ললিতাকে একটা চুমো খেয়ে এক পা পিছিয়ে এসে হাত দুটো লম্বা করে দিল রানা, ললিতার কাঁধ দুটো ধরল। 'হাও, গোসলটা সেয়ে দাও।'

কথা না বলে খুঁদে পুলটায় নেমে গুবে পড়ল ললিতা পানিতে। মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। তার শরীরে সঁটে থাকা লাগছে চুল অলঙ্কারের মত লাগছে। প্ররোচিত করার চেষ্টা বলল সে, 'তুমি আমাকে ধুয়ে দাও। কী করতে হবে জানি না আমি। দেখিয়ে দাও, প্রিজ।'

'শার্ট আপ, লোলি। ন্যাকামি বন্ধ করো। সাবান আর স্পঞ্জ নিয়ে ঘষতে থাকো গায়ে, তা হলেই হবে। আরে বোকা, এটা প্রেম করার সময় নয়। আমি ব্রেকফাস্ট খেতে যাচ্ছি।'

হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল ধরতে গেল রানা, পিছন থেকে ললিতা নরম সুরে ডাকল, 'রানা।' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। মুখ ভেংচে জিভের ডগাটা রানার দিকে বের করে রেখেছে ললিতা। হাসি চাপতে ব্যর্থ হলো রানা, দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল।

ড্রেসিংরুমে ঢুকে মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল রানা,

হৃৎপিণ্ডটাকে শাওর হওয়ার সময় নিয়েছে। গালে হাত মাল, তারপর ললিতার চিহ্ন বেড়ে ফেলার জন্য মাথাটা বাঁকান একবার।

মনটা পরিষ্কার করার জন্য বাতাস হায়ে উঠল রানা—একে একে দুটো কামরাই পরীক্ষা করল। দেখাচ্ছে বেরবার পথ, সন্ধ্যা অথবা মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি কোথায় কী আছে না আছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

নেয়ালে একটা ইলেকট্রিক ঘড়ি রয়েছে, তাতে সাতটা আটটা বাজে। ডাকল বেডের পাশে একটা বোর্ডে কতকটা বোতাম দেখা যাচ্ছে, লেখা আছে কাকে ডাকার জন্য কোনটায় চাপ দিতে হবে—কুম সার্ভিস, হোয়ার ড্রেনার, ম্যানিকিউরিস্ট, মেইক ইত্যাদি। টেলিফোন নেই। দুটো কামরারই উপরের এক কোণে একটা করে ছোট ভেন্টিলেটর খুল রয়েছে, প্রতিটি দুই কর্ণকুট হবে। কোনও কাজে আসবে না।

দরজাগুলোকে এক ধরনের হালকা অ্যালুমিনিয়াম মানে হলো, নেয়ালের সঙ্গে মিল রেখে রঙ করা। ছুটে এসে একটা দরজার গায়ে থাকা মারল রানা। এক মিলিমিটারও নড়ানো গেল না।

কাঁধটা ঢলল রানা। এটা একটা কারাগার। কীসে ভরে সব দিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইন্দুরের এখন একটা কাজই করার আছে, পনিরটুকু খেয়ে ফেলা।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসল রানা। বরাকের কুচি মেশানো পাইন আপেল জুস নিয়ে শুরু করল ও। গরম একটা ডিশ খুলে দেখল সৈঁকা পাউরুটিতে পোচ করা ডিমের কুসুম মাখানো রয়েছে। কয়েক চামচ সেদ্ধ মটরশুঁটিও নিল। তারপর গ্রিল কিচনি, ন্যাপকিনে জড়ানো গরম রোল, মধু আর স্ট্রবেরি জ্যাম। সবশেষে বড় একটা থার্মোস ডিক্যান্টার থেকে আগুনের মত গরম কফি ঢালল।

পানোরো মিনিট পর বাথরুমের দরজা খোলার আগুয়

হলো। সঙ্গে সঙ্গে হাত বুসে নিজের চোখ দুটো ঢাকল রানা।

হেসে উঠল ললিতা। কাল, 'সে একটা কাপড়ের সে সাধারণ একটা মোড়কে ভর পায়।'

রানা অন্যতে পেল কার্ভার্ড খুসে ভিতরটা হাতড়িয়ে ললিতা। কথা বলছে, যেন নিজের সঙ্গেই। 'ভাবছি, এত কীসের ভর তার। জানা কথা আমি যদি তার সঙ্গে কুঁচি লড়ি, আমিই জিতব। হয়তো সেজনেই ভর পাচ্ছে। হয়তো গায়ে তার আদলে তেমন জোর নেই। হাত আর পা সেবে তো মনে হয় বাথট শক্তিশালী। কিন্তু বাকি সব আমার দেখা হয়নি। সেটা হয়তো দুর্বল। হ্যাঁ, তাই-ই হবে। সেজনেই আমার সামনে কাপড় খুলতে তার সাহস হয় না। হুম, আজ্ঞা, এটা পরলে কি খুশি হবে সে?' গলার আগুয়াজ চড়াল। 'ডার্লিং রানা, সেখা তো, এটা কি মানাবে আমাকে? সাদা জমিন, হালকা নীল রঙের পাখিরা উড়ছে সারা গায়ে?'

'মানাবে, পাঞ্জি মোরো!' হাতের পিছন থেকে বলল রানা। 'এবার মুখটা বন্ধ করে ব্রেকফাস্ট খেতে বসো। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

খমক খেয়ে ঠোট কোলাল ললিতা। এগিয়ে এসে চেয়ারটা টেনে ধপ করে বসল। 'তুমি একটা নীরস মানুষ! হেসে উঠল রানা।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। বাথরুমে ঢোকান পর থেকেই অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে ওর। দাঁত ব্রাশ করার সময় টলে পড়েই যাচ্ছিল। তারপর চিনতে পারল লক্ষণগুলো।

ওকে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে। কফিতে ছিল, নাকি জুসে? কিছু আসে যায় না। এখন টাইলসের মেঝেতে শুয়ে চোখ দুটো বুজতে পারলে আর কিছু চায় না ও।

মাতালের মত দরজার দিকে এগোল রানা। ভুলে গিয়েছিল শয়তানের দ্বীপ

বারো

পাহাড়ের গভীরে ঠাণ্ডা কামরার ভিতর ইলেকট্রিক ওয়াল ক্রুকে বিকেল সাড়ে চারটে বাজে।

পাহাড়ের বাইরে, অয়েস্টার দ্বীপ সারাটা দিন কড়া রোদে দগ্ধ হয়েছে আর উৎকট দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে।

দ্বীপটার পূর্ব দিকে অন্তত দশ জাতের পাখি, তাদের মধ্যে অল্প কিছু রোজিয়েট স্পুনবিলও আছে, নিজেদের জন্য বাসা বানাতে অথবা মাছ ধরতে ব্যস্ত। বেশিরভাগ পাখিকে অবশ্য সারা বছর ধরে এত বেশি বিরক্ত করা হয়েছে যে 'তাদের বাসা তৈরির ইচ্ছেটাই মরে গেছে। গত কয়েক মাস প্রায় প্রতি দুই রাতের বেলা 'ড্রাগন' পাঠিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাসাগুলো। এ বছর অনেক পাখিই ডিম পাড়বে না বা তাদের ডিম থেকে বাচ্চা কুটবে না। নার্সাস হিস্টরিয়ার আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেক পাখি। নুদু আভাস পাওয়া যাচ্ছে জনাভূমি ত্যাগ করে অভিবাসী হওয়ার।

দ্বীপের আরেক প্রান্তের কী অবস্থা? করমরান্ট পাখির শুকনো মল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা, সেজন্যই চূড়াটাকে সাদা সেবার। সারাটা দিন লাখ লাখ করমরান্ট রোজকার মত আজও নিরুপদ্রবে মাছ গিলে নিজেদের পেট ভরিয়েছে, বিনিময়ে এক আউল মল ফিরিয়ে দিয়েছে তাদের মালিক আর রক্ষককে।

বাসা তৈরির মরত্মে কেউ তাদেরকে বিরক্ত করে না। সব কাঠি দিয়ে তৈরি এলোমেলো স্থূপ বানাচ্ছে তারা, এটাই তাদের

বাসা। প্রতি জোড়া স্থূপের মাঝখানে ঠিক ষাট সেন্টিমিটার করে ব্যবধান, কারণ এই গোয়ানেই অত্যন্ত হিংসুটে পাখি; ষাট-সেন্টিমিটার জায়গা তাদের শান্তিপূর্ণ বগড়া-কাঁটি করতে লাগে। শিগগিরই তিনটে করে ডিম পাড়বে মেয়েরা। মনিবের কানকে গড়ে দুটো করে বাচ্চা করমরান্ট বাড়বে।

চূড়ার নীচে, যেখানে বনন কাজ চলছে, তিনশোর মত শ্রমিক ডে-শিকটের ডিউটি এইমাত্র শেষ করল। পাহাড়ের ঢাল থেকে আজ আরও পঞ্চাশ কিউবিক গজ গোয়ানো বোঁড়া হয়েছে, সেই সঙ্গে ওয়ার্কিং লেভেলের আকার আরও বেশ গজ বেড়েছে।

শেষ লোহার ট্রাকটা ন্যারো গেইজ রেললাইন ধরে পাহাড়ী ঢাল থেকে নেমে আসছে, গন্তব্য: জ্বালাদ আর সেপারেস্টার।

একটা হটসেল বাজল। কোদাল-শাবল নিয়ে রওনা হলো শ্রমিকরা, কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা সারি সারি টিনশেডের দিকে। কাল পাহাড়ের উল্টোদিকে, সাগরের দিকটার, জেটিতে ডিভার বড় একটা জাহাজ। রসদ, তাজা কলমুল, নীল ছবির ভিনিডি ইত্যাদি আরও কত কী নিয়ে আসবে। কিছু গোপন কার্গো আসে, কাউকে দেখতে দেওয়া হয় না। গোপন একটা টানেলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গভীরে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বনক শ্রমিকদের দু'জন ওই গোপন টানেল দেখছে। পার্ভদের চোখকে কঁকি দিয়ে হোক বা তাদের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে হোক, ভিতরে ঢুকছিল তারা। সেজন্য তাদেরকে খেসারতও দিতে হয়েছে।

না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না, এত বড় একটা কারখানা আছে টানেলের শেষ মাথায়-পাহাড়ের গভীর তলদেশে। ওই দুই বনকের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে ওজন ছড়িয়েছে পাঁচশো ইন্ডিয়ানের অধিনে পাঁচ হাজার সেকেন্ডিক কাজ করছে ওই কারখানায়।

প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল, মার্কিন পুতুল তৈরি করে দেবে।

কিন্তু পুতুলের আকার দেখে তাদের ভুল ধারণা ভাঙে, পরিষ্কার হয়ে যায় কারখানাটায় যান্ত্রিক মানুষ তৈরি করা হচ্ছে। এক সময় এ-ধারণাটাও পুরোপুরি সঠিক থাকল না।

খনক শ্রমিকদের মধ্যে গুজব ছড়াল, জাহাজ পাঠিয়ে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার ভিতর থেকে, বিশেষ করে নাফ নদীর মোহনা থেকে জেলে আর চোরাচালানীদের ধরে আনা হয় অয়েস্টার দ্বীপে। এদেরকে ওই টানেলের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গোপন কারখানায়। সেখানে প্রথমে তাদের মগজ ধোলাই করা হয়। খনকদের আরও একটা ভুল ধারণা ভাঙল। ওটা আসলে কোন কারখানাই নয়। কারখানার আদলে তৈরি ল্যাবরেটরি-বলা উচিত একই ছাদের নীচে অসংখ্য ল্যাবের সমষ্টি।

মগজ ধোলাই করার ফলে ধরে আনা চোরাচালানি আর জেলেরা তাদের প্রায় সবটুকু অতীত ভুলে যায়। লোকালয়ে ফিরে তারা নিজেদের পরিচিত জায়গা বা মানুষজনকে চিনতে পারে না।

এরপর অপারেশন করে প্রত্যেকের চোখ তুলে নিয়ে তার জায়গায় বসান হয় ডক্টর গজনবির আবিষ্কার করা কৃত্রিম চোখ। ওই কৃত্রিম চোখ যখন যেমন প্রয়োজন রঙ বদলাতে পারে। সেগুলো ব্যবহারও করা হয় বিভিন্ন লক্ষ্যে।

চোখ গাঢ় সবুজ হলে বহু দূরের জিনিস পরিষ্কার দেখতে পায় তারা। নীল হলে অদৃশ্য আলো, অর্থাৎ লেয়ার-রে বিকিরণ করে। সাদা হলে তাপ ছড়ায়, ত্রিশ-গজ দূরের একজন লোকের কাপড়চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, আর দূরত্ব দশগজ হলে ধাতব পদার্থ গলে যাবে।

খনকরা এ-ও জেনেছে যে এই অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক যন্ত্রকে 'সাইবর্গ' বলা হয়। সাইবর্গরা ডান হাত লম্বা করলে ইস্পাতের তৈরি আঙুলের ফাঁপা ডগা থেকে পিস্তলের বুলেট

বেরোয়। আর বাম হাত থেকে বেরোয় গ্রেনেড।

শ্রমিকদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফল অবশ্য ভাল হয়নি। যেভাবেই হোক ডক্টর গজনবির কানে কথাটা যায়। বিশ্বস্ত গার্ডদের পাঠিয়ে ওই দুই খনককে নিজের কোয়ার্টারে ডেকে নেয় সে। তারপর থেকে তাদেরকে কেউ কখনও দেখেনি আর। তবে ধারণা করা হয় শাস্তি হিসাবে তাদেরকেও সাইবর্গ বানানো হয়েছে।

পাহাড়ের গভীর তলদেশে, আরেক দিকে, নরম বিছানায় ঘুম ভাঙল রানার। চিনচিনে সামান্য একটু মাথাব্যথা ছাড়া শরীরটা সতেজ আর তাজা লাগছে। ললিতার কামরায় আলো জ্বলছে, তার হাঁটাচলার শব্দও পাচ্ছে ও।

বিছানা থেকে মেঝেতে পা নামাল রানা, ভাঙা ল্যাম্পের টুকরো কাঁচগুলোকে এড়িয়ে নরম পায়ে কাবার্ড-এর সামনে এসে থামল। একটা বার্মিজ লুঙ্গি বের করে দ্রুত পরে নিল। তারপর দুই কামরার মাঝখানের দরজায় এসে দাঁড়াল।

বিছানায় অনেকগুলো ড্রেস স্তুপ হয়ে রয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক এক করে সেগুলো গায়ে ঝুলিয়ে দেখছে ললিতা কেমন মানায়। অবশেষে আকাশী রঙের একটা সিল্ক কিমোনো পছন্দ করল সে। তার রোদে পোড়া সোনালি ত্বকের সঙ্গে দারুণ মানাল সেটা। 'বাহু, ভারি সুন্দর!'

আধ পাক ঘুরল ললিতা, হাত উঠে গেছে মুখে। 'ও, তুমি!' হাসল সে। 'ভাবছিলাম পঁচটার সময় তুলব তোমাকে। সাড়ে চারটে বাজে, কাজেই খিদে পেয়েছে আমার। কিছু ব্যবস্থা করতে পার?'

'পারি না মানে!' ললিতার বিছানার দিকে এগোল রানা। পাশ কাটাবার সময় তাঁর সরু কোমরটা পেঁচিয়ে ধরল, সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কলিং বেলের বোতামগুলো পরীক্ষা করল ও। তারপর চাপ দিল 'রুম সার্ভিস'-এ। বলল, 'তোমার

কি কিছু দরকার? দু'একটা বোতাম টিপতে চাও?

হি-হি করে হেসে উঠল ললিতা। তারপর জিজ্ঞেস করল,
'আজ্ঞা, ম্যানিকিউরিস্ট কী?'

'যে তোমার নখের যত্ন নেয়। ভট্টর গজনবির অতিথি, তার সামনে আমাদেরকে যেন নিখুঁত দেখায়।' রানার মাথায় অন্য চিন্তা কাজ করছে, একটা অস্ত্র দরকার ওর। যে-কোন অস্ত্র, একটা কাঁচি হলেও চলে।

আরও দুটো বোতামে চাপ দিল রানা। ললিতার কোমর ছেড়ে দিয়ে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল। ওরা যখন ঘুমাচ্ছিল কেউ একজন এসে ব্রেকফাস্টের ট্রে আর ডিশগুলো নিয়ে গেছে। দেয়াল ঘেঁষা সাইডবোর্ডে একটা ড্রিঙ্ক ট্রে দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে পরীক্ষা করল ও। সবই রয়েছে ওটায়। বোতলগুলোর মাঝখানে দুটো মেন্যু খাড়া করা। একটা তুলে নিয়ে ভিতরে চোখ বুলাল রানা। তালিকায় বিখ্যাত সব চাইনিজ আর থাই ছাড়াও ইংলিশ ডিশও রয়েছে।

দরজায় নক করে মাউই মোনা ঢুকল কামরার ভিতরে। তার পিছু নিয়ে এল আরও দুই রোহিঙ্গা মেয়ে। ললিতার জন্য মাখন, পাউরুটি আর চা চাইল রানা। তারপর তার চুল আর নখের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দিল।

বাথরুমে ঢুকে একজোড়া পেইনকিলার ট্যাবলেট খেয়ে ঠাণ্ডা পানিতে শাওয়ার সারল রানা। কাবার্ড থেকে কিমোনো এনেছে, পরার সময় ভাবল একেই বলে সঙ সাজা। বেডরুমে ফিরে এল ও। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মাউই মোনা জানতে চাইল ডিনারে কী খাবে ওরা। চেহারা নির্লিপ্ত করে রেখে অর্ডার দিল রানা-ক্যাভিয়ার, গ্রিলড ল্যাম কাটলেট, রোস্টেড চিকেন, সালাদ, তরমুজ, ভ্যানিলা আইসক্রিম আর হট চকলেট সস। মেন্যু ধরতে অস্বীকৃতি জানানোয় ললিতার জন্যও এ-সবই চাইল রানা।

হাসির উজ্জ্বলতা কিছুটা কমে মোনা জিজ্ঞেস করল, 'তাই জানতে চেয়েছেন সাতটা পরিত্যক্ত, নাকি আটটা, কোনটা আপনাদের জন্যে ভাল হয়?'

'একটা হলেই হয়,' রানা চেমেন উৎসাহ দেখাচ্ছে না।

'খন্যবাদ, মিস্টার মামুন রাহি। সাতটা পরিত্যক্ত মিনিট বোগাবোপ করব আমি।'

সরে ললিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল রানা, ড্রেসিং টেবিলের সামনে অপর দুই মেয়ে তার নখ আর চুলের যত্ন নিচ্ছে। আরনায় চোখাচোখি হতে হাসল ললিতা। রেবকা গেল উত্তেজনা ধরে রাখতে হিমশিম বেয়ে যাচ্ছে সে।

একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি আর বরফ মিশিয়ে নিজের কামরার ফিরে এল রানা। অস্ত্র সংগ্রহের যে সমস্যা ছিল তার কিছুটা সমাধান হতে গেছে। ম্যানিকিউরিস্টের কোমর থেকে একটা চেইনে ঝুলছিল খুদে কাঁচি, কাইল আর প্রোব। বড় করেকটা কাঁচি ছোয়ার ড্রেসারের কাছেও ছিল। আগেছান বিছানায় বসে গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা, গম্ভীর চেহারা, নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

মেয়েগুলো ফিরে গেল। রানার দিকে তাকাল ললিতা। মুখ তুলছে না দেখে ওকে আর বিরক্ত না করে নিজের কামরায় ফিরে গেল সে।

খানিক পর আরেকটু হুইস্কি নেওয়ার জন্য তার কামরায় ঢুকল রানা। 'লোলি, আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।' দেয়ালঘড়ির উপর চোখ বুলিয়ে গ্লাসটা শেষ করে আরেক সেট কিমোনো পরল। এটা কালো সিঁড়।

নির্দিষ্ট সময়ে নক হলো দরজায়। নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কার্পেট মোড়া বালি করিডর ধরে এগিয়েছে। এলিভেটরের সামনে থামল মোনা। দরজাটা খুলে পরল আরেকজন উৎসাহী রোহিঙ্গা তরুণী, মাথায় কার্ফাজানো। ওরা

ভিতরে ঢোকার পর বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হঠাৎ রানার কানের কাছে চোঁট তুলে ফিসফিস করল ললিতা। 'ডার্লিং, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?'

হাসল রানা, বলল, 'না। সমস্ত রাগ আমার নিজের ওপর। শোনো। ডিনারে কথা যা বলার একা আমি বলব। তুমি শুধু স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবে, আর কোন অবস্থাতেই ডক্টর গজনবিকে ভয় পাবে না। লোকটা একটু পাগলাটে হতে পারে।'

লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাল ললিতা। 'চেষ্টার ক্রটি করব না।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্থির হলো এলিভেটর। রানার কোন ধারণা নেই কতটা নীচে নামানো হয়েছে ওদেরকে—একশো ফুট, দুশো ফুট? হিসহিস শব্দ করে খুলে গেল দরজা। ললিতাকে নিয়ে বড়সড় একটা কামরায় বেরিয়ে এল রানা।

কামরাটা খালি। সিলিং অনেক উঁচুতে, লম্বায় প্রায় ষাট ফুট, তিনদিকের দেয়াল জোড়া বই-ভর্তি অসংখ্য শেলফ। প্রথমবার তাকাতে মনে হলো বাকি দেয়ালটা নিরেট ব্লু-ব্ল্যাক কাঁচ দিয়ে তৈরি। কামরাটা সম্ভবত একই সঙ্গে স্টাডি আর লাইব্রেরি।

এক কোণে কাগজ-পত্র বোঝাই বড়সড় ডেস্ক আর মাঝামাঝি জায়গায় সাময়িকী আর খবরের কাগজসহ লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে। ক্লাব চেয়ারগুলো লাল চামড়ায় মোড়া। কার্পেটের রঙ গাঢ় সবুজ। সবগুলো স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্পের আলো নিভেজ করা। একমাত্র যেটা বেমানান লাগল—ড্রিস্ক ট্রে আর সাইডবোর্ড কাঁচের লম্বা দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় ফেলা হয়েছে; আশট্রে সহ কয়েকটা টেবিল আর কিছু চেয়ার অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে ওগুলোকে ঘিরে।

গাঢ় কাঁচের ভিতর আলোড়িত নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। গাঢ় নীল পানিতে দেখা যাচ্ছে ছোট মাছের রূপালি ঝাঁককে

ধাওয়া করছে বড় কয়েকটা মাছ। ওগুলো জিনের কিনারায় হারিয়ে গেল। আসলে কী এটা? আকুয়েরিয়াম?

উপর দিকে তাকাল রানা। সিলিংয়ের এক গজ নীচে ছোট ছোট আছড়ে পড়ছে কাঁচের গ্যারে। টেবিলের উপরনিত সুরু একটা অংশের ব্লু-ব্ল্যাক রঙ একটু ধূসর হয়ে উঠেছে, এখানে সেখানে আলোক বিন্দু ছড়ানো। কালপুরুষের আকৃতি সূত্র ধরিয়ে দিল।

জিনিসটা আকুয়েরিয়াম নয়। এ হলো সাগর আর রাতের আকাশ। কামরার পুরো একটা দিক আর্মারড গ্লাস দিয়ে তৈরি। ওরা সাগরের নীচে রয়েছে, তাকিয়ে আছে বিশ কুট তলার পানিতে।

রানা আর ললিতা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। ওদের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল প্রকাণ্ড একজোড়া হাঙর। ওগুলো অদৃশ্য হতেই আড়াল-আবতাল থেকে বেরিয়ে এল নানা জাতের সামুদ্রিক প্রাণী—ইল, অটোপাস, কচ্ছিক, সোডকিন, সুইড ইত্যাদি। অদৃশ্য উৎস থেকে আলো পড়ল পানিতে। মনে হলো যেন রঙিন মাছের প্রদর্শনী চলছে চোখের সামনে।

একটু পরেই নিভে গেল সার্নাইট। ধীরে ধীরে কাঁচ ফোঁস সাগরের দিকে পিছন ফিরল রানা। আশা করছিল ডক্টর গজনবিকে দেখতে পাবে। কিন্তু কামরাটা এখনও খালি।

আবার সাগরের দিকে তাকাল রানা। আশ্চর্য সুন্দর অদৃশ্য একটা ধারণাই বাটে। এটাকে সম্ভব করে তুলতে বীতিমত জাদু দেখাতে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের। কিন্তু কীভাবে তৈরি করা হয়েছে এটা? সম্ভাব্য পদ্ধতি একটাই। নিশ্চয়ই প্রবাসে পাহাড়-প্রাচীরের গভীরে কাঁচের দেয়াল তৈরি করে সে, তারপর স্তরের পর স্তর কাটা হর বাইরের পাথর, অবশেষে তাইতাকরা প্রবাল-এক শেষ পর্যায়ের পাতলা তুক সতিয়ে নেয়। কিন্তু কাঁচটা কতটুকু পুরু? কাকে দিয়ে এই কাঁচ তৈরি করিয়েছে সে? ধীরে এটা অসম্ভব

হয়েছে কীভাবে? ক'জন ডাইভারকে কাজ করতে হয়েছে? খরচ পড়েছে কত?

‘পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।’

গমগমে, প্রতিধ্বনি তোলা একটা কণ্ঠস্বর: ভাষাটা বিতর্ক ইংরেজি, বাচনভঙ্গিতে কোন আঞ্চলিক টান নেই।

ধীরে সাগরের দিকে পিছন ফিরল রানা আবার, অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

ডেস্কের পিছনের একটা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে ডক্টর থাকিন গজনবি। ওদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠোঁটে সরু এক চিলতে হাসি। ‘ভাবলাম তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে চাইছ কত খরচ পড়েছে। আমার অতিথিরা সাধারণত পনেরো মিনিট পরই এই দিকটা নিয়ে ভাবে। তোমরাও কি?’

‘হ্যাঁ।’

এখনও হাসছে, ডেস্কের পিছন থেকে ধীর পায়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল ডক্টর গজনবি। পা ফেলার বদলে তার এগিয়ে আসার ধরনটা যেন ভেসে আসার মত। তার কাপড়ে হাঁটুর কোন আকৃতি ফুটছে না। পরনে গানমেটাল রঙের চকচকে কিমোনো, হেম-এর নীচে কোন জুতোও দেখা যাচ্ছে না।

তারপরই রানার নজর কাড়ল লোকটার দৈর্ঘ্য। ওর চেয়ে কম করেও সাত ইঞ্চি বেশি লম্বা সে। কিন্তু শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াবার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আরও বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। গোলাকার মাথা সম্পূর্ণ ন্যাড়া, দু'পাশ একটু ডেবে আছে, চিবুকটা ক্রমশ সরু, ফলে সবটুকু মিলিয়ে বৃষ্টির উল্টো করা প্রকাণ্ড একটা ফোঁটা বলে মনে হয়, বরং তেলের ফোঁটা বললেই যেন বেশি মানায়, কারণ তার চামড়া গাঢ় হলুদ।

ডক্টর গজনবির বয়স আন্দাজ করা অসম্ভব। রানার দৃষ্টিতে তার মুখে কোন ভাঁজ বা রেখা ধরা পড়ল না। খুলির মত মসৃণ চকচকে এমন কপাল আগে কখনও দেখেনি ও। ‘এমনকী গর্তে

তোকা মুখের নীচের অংশ, শক্ত আর চওড়া চোয়ালও আইভরির মত মসৃণ। তুরু জোড়া কুচকুচে কালো, চিকুনি দিয়ে উপর দিকে আঁচড়ানো, যেন সত্যিকার নয়, পেইন্ট করা। ওঙলোর নীচে গভীর একজোড়া গর্তের ভিতর কালো চোখ, কিন্তু সেই চোখে কোন পাতা নেই। দেখতে ছোট একজোড়া পিস্তলের মুখের মত-সরাসরি, অপলক তাকিয়ে আছে, ভাবলেশহীন।

নাকটা সরু, শেষ হয়েছে নিষ্ঠুর দর্শন মুখের কাছে; ঠোঁটে প্রায় স্থায়ী সরু হাসি লেগে থাকলেও, তাতে কর্তৃত্বের ভাবই ওমু ফুটে আছে। চিবুক গলার দিকে একটু বাঁকানো। রানার কেন যেন মনে হলো মাথা আর ভারটিভ্রা আলাদা নয়, অখণ্ড।

অদ্ভুতদর্শন, প্রায় ভাসমান মূর্তিটাকে টিন-ফয়েলে মোড়া দৈত্যাকার একটা বিষাক্ত কীট বলে মনে হলো রানার, পিছনের কার্পেটে লম্বা লেজ ঝুলে থাকতে দেখলে একটুও আশ্চর্য হবে না।

ওদের কাছ থেকে তিন কদম দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল ডক্টর গজনবি। লম্বাটে মুখের ফাটল ফাঁক হলো। ‘হাত মেলাতে পারছি না বলে আমাকে তোমরা মাফ কোরো,’ ভারী কণ্ঠস্বরে কোন উত্থান-পতন নেই। ‘আমি পারি না।’ ধীরে ধীরে আঙ্গিন খুলে গেল। ‘আমার আসলে হাত নেই।’

সরু রঙের মাথায় একজোড়া চকচকে ইস্পাতের চিমটা দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত পর আঙ্গিন ঢেকে ফেলল ওঙলোকে।

রানা অনুভব করল ওর পাশে দাঁড়ানো ললিতা শিউরে উঠল।

কালো চোখ দুটো ললিতার দিকে ঘুরে গেল। ‘এর কারণ একটা দুর্ঘটনা।’ রানার দিকে তাকাল ডক্টর গজনবি। ‘তুমি আমার অ্যাকুয়েরিয়াম উপভোগ করছিলে। মানুষ জানোয়ার বা পাখি ভালবাসে। আমি ভালবাসি মাছ। মাছ আমার কাছে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় আর আকর্ষণীয় মনে হয় এদের। আশা করি

শয়তানের দ্বীপ

তোমাদেরও ভাল লাগছে।

‘তোমাকে অভিনন্দন জানাই,’ বলল রানা। ‘এই কামনার কথা অনেকদিন মনে থাকবে আমার।’

‘দয়্যরাদ। আমাদের হাতে সময় খুব কম, অথচ অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে। বসো তোমরা, প্রিজ। কি খেবে? তোমাদের চেয়ারের পাশে সিগারেট পাবে।’

উঁচু একটা লেদার চেয়ারের দিকে এগোল ডক্টর গজনি, তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শরীরটাকে ভাঁজ করে বসল তাকে। তার উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল রানা। রানার পাশের চেয়ারে বসল ললিতা।

পিছনে একটা নড়াচড়া অনুভব করল রানা। কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল ও। বেঁটে এক রোহিঙ্গা, আকার-আকৃতি দেখে মনে হলো কুস্তিগির, বার-এর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো ট্রাউজার আর সাদা জ্যাকেটে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে।

ডক্টর গজনি বলল, ‘আমার বডিগার্ড। অনেক কিছুতে এক্সপার্ট ও। ওর এই আকস্মিক আগমনে কোন রহস্য নেই। আমার সঙ্গে সব সময় একটা ওয়াকি-টকি থাকে-এখানে, কিমোনো ঢাকা বুকটার দিকে চিনুক তাক করল। ‘মেয়েটি কী নিচ্ছে?’

রানা খেয়াল করল ‘তোমার স্ত্রী’ বলল না। ললিতার দিকে ফিরল ও। তার চোখ দুটো বড় বড় আর অপলক হয়ে আছে। মৃদুকণ্ঠে বলল, ‘কোকো-কোলা, প্রিজ।’

ওনে স্বস্তি বোধ করল রানা। ‘আর আমার জন্যে মিডিয়াম ভদকা ড্রাই মাটিনি-এক টুকরো লেবুসহ। রুশ বা পোলিশ ভদকা হলে ভাল হয়।’

ডক্টর গজনির সরু হাসিতে অতিরিক্ত একটা ভাঁজ পড়ল। ‘দেখতে পাচ্ছি নিজের জন্যে কোনটা উত্তম তা তুমি ভালই বোঝো। এক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছে পূরণ করা হবে। তোমার কি

মনে হয় না সাধারণত এককমর স্ট্রেচিং স্কেট কিছু কালো কীভাবে মেনে সেটা পেরে যায় সেটা আমার অভিজ্ঞতা অনুভব তাই বলে।’

‘ছোটখাট কিছু ব্যাপারে।’

‘বড় চাপকাটলো যদি পুরল না হয় তা হলে মনে মনে হলে জোরাল আকাঙ্ক্ষা সেই তোমার। নিমিত্ত কলসেনলটুল ফোকাস। একতলেই আসল কথা। আমাদের একটা জুতোর ফুলফ্রাম দাঁও, দুনিয়াটাকে সরিয়ে দিই আমি-তবে ওটাকে সরাসরি ইচ্ছেটা থাকতে হবে আমার।’ হাসিটা স্থির হয়ে আছে ঠোঁটে। ‘আসলে এসব মোশন। তার বদলে এসো কাক্সন কথা আলোচনা করি। মাটিনি কি তোমার পছন্দসমত হয়েছিল? আবদুল্লাহ চনমনা, মিস্টার মামুন রাহিকে আরেকটু মাটিনি দাঁও। আরেক বোতল কোক রানো মেয়েটির পাশে। একটা বোধহয় আটটা দশ। ঠিক-ন’টায় ডিনারে বসব আমরা।’

নিজের চেয়ারে আরেকটু বাড়ি হয়ে বসল ডক্টর গজনি। সামনের দিকে খানিক কুঁকে রানার দিকে তাকাল। কামনার ভিতর এই মুহূর্তে অটুট মীরবতা। ‘এবার, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা, এসো, পরস্পরকে নিজেদের গোপন বিষয়গুলো জানাই আমরা। প্রথমে আমি কিছু লুকাচ্ছি না বোঝাবার জন্যে, আমার সব কথা তোমাকে বলব। তারপর তোমার সব কথা তুমি আমাকে বলবে।’ গর্তের ভিতর তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। ‘তবে পরস্পরকে আমরা সত্যি কথা বলব।’ আন্তরিক সরিয়ে ইস্পাতের খাবা দুটো বের করে খাড়া করল সে। ‘আমি মিথ্যে বলব না। তুমিও সত্যি কথা বলবে। তা যদি না বলো, একতলে, ইস্পাতের চিমটা নিজের মুঠ চোখের দিকে তাক করল, ‘যদি ফেলবে তুমি মিথ্যে কথা বলছ।’

ইস্পাতের চিমটা সার... দুটোর একেবারে সামনে

নিয়ে গেল ডক্টর গজনবি, তারপর প্রতিটি মণিতে টোকা দিল।
ভেঁতো টিং-টিং আওয়াজ উঠল চোখের মণি দুটো থেকে।
'এগুলো,' বলল ডক্টর গজনবি, 'সব কিছু দেখতে পায়।'

তেরো

গ্রাসটা তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা। চিন্তা করছে ও।
ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করাটা বোকামি হয়ে যাবে। ও যে
এইচআরবি সোসাইটির প্রতিনিধি নয়, পাখি সম্পর্কে অভিজ্ঞ যে-
কেউ তা ধরে ফেলবে। এখন ওর দায়িত্ব সম্ভাব্য বিপদ থেকে
মেয়েটিকে বাঁচানো। প্রথমে তাকে আশ্বস্ত করা দরকার।

ডক্টর গজনবির দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'আকিয়াবে
তোমার চর আছে, তারা জানে আমি কে, কোথেকে আসছি।
সূর্য আর রচনাকে সরিয়ে ফেলার পর তুমিও জানতে ঢাকা থেকে
কাউকে পাঠানো হবে।'

কোন মন্তব্য করছে না ডক্টর গজনবি।

'ভাবছি কে তুমি,' আবার শুরু করল রানা। 'যুদ্ধে বা কোন
দুর্ঘটনায় আহত মানুষ নানা ডাক্তারি কৌশলের সাহায্য নিয়ে
বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। চোখের বদলে পাথরের লেন্স পরেছে।
চাকরবাকরকে ডাকার জন্যে বেলের বদলে ওয়াকি-টকি ব্যবহার
করো। নিশ্চয়ই আরও অনেক টেকনিকাল সাহায্য নিয়ে বেঁচে
আছ। কিন্তু আমি তোমার গোয়ানো খনক নই, কাজেই তোমার
ও-সব আমাকে অবাক করতে পারছে না।'

'কথা বলার সাহস সবার থাকে না, তোমার আছে, মিস্টার

রানা।' সরু হাসিটা একটু কেঁপে গেল ডক্টর গজনবির ঠোঁটে।
'তোমার মত একজন ইন্টেলিজেন্ট শোভা পেয়ে আমিও কথা
বলে আনন্দ পাব। আমার সে-সব কথা তুমিই প্রথম শুনবে। এর
আগে কখনও কাউকে বলিনি। তোমাকে বলব, তোমার
সঙ্গিনীকে বলব-নির্ভয়েই বলব, কারণ তোমরা কোনওদিন
সে-কথা আর কাউকে বলার সুযোগ পাবে না।'

আচ্ছা, ভাবল রানা, তা হলে এই ব্যাপার। গোপন কথা
শোনাতে এই জন্য যে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ওদেরকে ফিরতে
দেওয়া হবে না। ও বলল, 'মেয়েটিকে এত সব শোনাবার কোন
প্রয়োজন নেই। ওকে আমি গতকাল সৈকতে প্রথম দেখি।
ধানখামা দ্বীপের মেয়ে ও, ঝিনুক কুড়ায়। তোমায় লোকজন তার
নৌকা ভেঙে দিয়েছে, তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বাধ্য
হয়েছি। আমি চাই ওকে তুমি ছেড়ে দাও। একটা নৌকা পেলে
একাই ফিরে যেতে পারবে। কথা দিচ্ছি, কাউকে একটা কথাও
বলবে না ও।'

রানা থামতেই ললিতা বলল, 'একদম সত্যি নয়, আমি কথা
বলব! সবাইকে সব কথা বলে দেব! এই জায়গা ছেড়ে আমি
নড়ছি না। তোমার সঙ্গে আছি, তোমার সঙ্গেই থাকব।'

তার দিকে ভুরু কুঁচকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। ঠাণ্ডা
স্বরে বলল, 'তোমাকে আমি চাই না।'

'এটা বীরত্ব দেখাবার জায়গা নয়,' নরম সুরে বলল ডক্টর
গজনবি। 'অয়েস্টার দ্বীপে এসে কেউ কোনদিন ফিরে যেতে
পারে না। এটা আমার পলিসি নয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'ঠিক আছে, থাকো তুমি। শোনা
যাক ম্যানিয়াকটা কী বলে।'

জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল ললিতা, রানার সঙ্গে থাকার
অনুমতি পেয়ে ভারি খুশি। বিপদটাকে মোটেও গ্রাহ্য করছে না।

সেই নরম সুরেই শুরু করল ডক্টর গজনবি, 'তুমি

শয়তানের দ্বীপ

বলেছ, মিস্টার রানা। আমি ঠিক তা-ই, একটা ম্যানিয়াক।
দুনিয়ার সব কীর্তিমান পুরুষই ম্যানিয়াক। তাদের ওপর ম্যানিয়া
ভর করে, তারপর ঠেলে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। অমর
বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মীয় নেতা—সবাই ম্যানিয়াক। ম্যানিয়া, মাই
ডায়ার মিস্টার রানা, প্রতিভার মতই অমূল্য একটা গুণ। আমার
ম্যানিয়াটা কি শুনবে? ক্ষমতার লিঙ্গা। ক্ষমতা অর্জনকেই আমি
আমার জীবনের সার ভেবে নিয়েছি। সেজন্যেই আমি এখানে।

গ্রাসে আরেকটা ছোট চুমুক দিল রানা। 'আমি অবাক হচ্ছি
না। এটা অত্যন্ত পুরনো একটা রোগ—নিজেকে দেশের রাজা,
প্রেসিডেন্ট, পয়গম্বর বা এমনকী ঈশ্বর বলে মনে করা।
পাগলাগারদে এদের কোন অভাব নেই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে
কোন পাগলাগারদে ভর্তি না হয়ে তুমি নিজেই একটা বানিয়ে
নিয়েছ। কিন্তু এটা তুমি কী ভেবে করলে? ছোট একটা দীপে
নিজেকে বন্দি করে কীভাবে তুমি ক্ষমতা অর্জন করবে?'

'ক্ষমতা বলতে আমি কী বুঝি, ক্ষমতা কেন আমার দরকার,
এটা একটু ব্যাখ্যা করি, মিস্টার রানা। তা না হলে আমাকে
তোমার ভুল বোঝার অবকাশ থেকে যাবে।'

'জানি,' বলল রানা, 'এরপর নিজেকে তুমি সাধু ব্যক্তি বলে
দাবি করবে। বলবে তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, সেজন্যেই ক্ষমতা
দরকার। সব কালপ্রিটই তাই বলে।'

সরু হাসিটা আরও যেন স্থির হয়ে গেল। 'তার মানে তি
তুমি আমাকে চিনে ফেলেছ?'

হাসল রানা। 'এর মধ্যে না চেনার কী আছে? তোমার মত
ম্যানিয়াক কি সারা দুনিয়ায় আরেকটা খুঁজে পাওয়া যাবে? শের
পর্যন্ত পারো তো না কিছুই, শুধু শুধু কিছু নিরীহ মানুষ বুন আর
বিপুল সম্পদ নষ্ট করো। তারচেয়ে শুধু যদি সৃষ্টিশীল বিজ্ঞান
চর্চায় লেগে থাকতে, দুনিয়ার মানুষ কৃতজ্ঞ থাকত তোমার কাছ
থেকে অমূল্য কিছু পেয়ে।'

'মাই গড, রানা, তুমি দেখছি আমার প্রশংসা করছ।' ডক্টর
গজেনবিকে আনন্দে আপ্ত মনে হলো। 'তাও তো এখনও তুমি
আমার প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছুই জানো না। জানলে না জানি আরও
কত প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। চলো, কন্ট্রোলরুমে যাই।
আমার "ক্ষমতা দখল" প্রজেক্টের প্রকৃতি কেমন এগোচ্ছে দেখাই
তোমাদেরকে।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে নেমে একটা
দরজার দিকে এগোল সে।

দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল বডিগার্ড আবদুল্লাহ
চনমনা। চেয়ার ছেড়ে রানা আর ললিতা মিলেই সেদিকে
এগোল।

হঠাৎ থামল ডক্টর গজেনবি, যান্ত্রিক পুতুলের মত দূরে
মুখোমুখি হলো রানার। 'তুমি জানলে কীভাবে আমি কে?'

হাসল রানা। 'জানিনি। আন্দাজ করেছি। আসলে আমি এক
মিস গাইডেন্ড দুর্লভ প্রতিভাকে চিনি। সে একজন বিজ্ঞানী।
তোমার কাজকর্ম প্রায় সবই তার সঙ্গে মেলে। তোমার এই
যান্ত্রিক চেহারা বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করাও তার পক্ষে বুঝি সম্ভব।'

'জানতে পারি কে সে? কী নাম তার?'

'আমি তাকে পাগল বিজ্ঞানী কবির চৌধুরী হিসেবে চিনি,'
বলল রানা, হাসছে না।

'এর মধ্যে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই, রানা।' প্রত্যক্ষ পর
আবার ডক্টর গজেনবি, গুরুত্ব কবির চৌধুরীর ভাবী কণ্ঠস্বর
গমগমে, প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। 'কারণ আমার এই অবস্থার
জন্যে তুমিই দায়ী।'

'আমি দায়ী?' রানাকে নির্গুণ দেখাচ্ছে। 'কীভাবে?'

'আমার শেষ প্রজেক্ট ছিল "নো অরিজেন"—মনে পড়ে?
আমি চেয়েছিলাম এমন একটা বস্তু আবিষ্কার করব, যেটা
পৃথিবীর বুক থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত অরিজেন টেনে নেবে,
যার ফলে দম আটকে মারা যাবে মানুষ নামের অস্তিত্ব

কীটগুলো, তারপর আমার নিজের ল্যাভে বিশেষভাবে ক্রোন করা মানুষ তৈরি করে ছেড়ে দেব দুনিয়ার বুকে—তারা একেকজন হবে আইনস্টাইন, নিউটন, ডারউইন, রবীন্দ্রনাথ, কিংবা শেকসপিয়ার....'

'সংক্ষেপ করো,' বাধা দিল রানা।

'তুমি আমার সেই প্রজেক্ট ধ্বংস করে দিয়েছ,' বলল কবির চৌধুরী। 'আমাকে তুমি আমারই জুলন্ত ল্যাভে ছুঁড়ে দিয়েছিলে। পুড়ে যাই আমি। হাত হারাই, চোখ হারাই...কিন্তু মরিনি। তবে প্রতিবন্ধী হয়ে বেঁচে থেকে কী লাভ, বলো? তাই সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেকে আমি সাইবর্গ বানাব।

'তখনই আইডিয়াটা এল মাথায়। পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষকে দিয়ে এই দুনিয়া চালানো যাচ্ছে না। মানুষ কী? সে লোভী, সে স্বার্থপর, সে অপরাধী, অশ্লীলতা পছন্দ করে, তার বিকৃতি আছে। নিখুঁত করে বানাতে পারলে সাইবর্গের এ-সব খারাপ গুণ থাকবে না। সে হবে মানুষও, আবার যন্ত্রও, অথচ মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে।'

'ভুল,' বলল রানা। 'তার প্রমাণ তুমি নিজেই। নিজেকে তুমি সাইবর্গ বলে দাবি করছ, অথচ তোমার ভেতরে ক্ষমতার লোভ কাজ করছে, তুমি নির্দিধায় মানুষ খুন করছ....'

'বলেছি নিজেকে আমি সাইবর্গ বানাব,' বলল কবির চৌধুরী, 'কিন্তু তা এখনও বানাইনি।'

'যেগুলো বানিয়েছ সেগুলোও তেমন কাজের জিনিস হয়নি,' বলল রানা। 'ওগুলোও তো অপরাধ করছে—কয়েক শো মানুষকে মেরে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।'

'ওগুলোকে মানুষ মারার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে, রানা। আমার প্রথম কাজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। সেটা করতে হলে খুন-খারাবির আর তো কোন বিকল্প নেই। আমি চেয়েছিলাম সাইবর্গগুলোকে পুলিশের উর্দি পরিয়ে কয়েকটা দেশে পাঠাব

তারা ওইসব দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। ফলে মহাগণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। ভেঙে পড়বে আইন-শৃংখলা। সেই সুযোগে এখান থেকে আমি হাজার হাজার সাইবর্গ পাঠিয়ে পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে দখল করে নেব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। তারপর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলবে নাগরিকদের ধরে ধরে সাইবর্গ বানানোর কাজ।

'কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্রথম দফায় তৈরি করা সাইবর্গগুলোতে কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, তাই ওগুলো ধরা পড়েছে বা মারা গেছে। এখন আমার ল্যাভে বিজ্ঞানীরা নতুন করে গবেষণা করছেন। কী নিয়ে গবেষণা করছেন, চলো দেখাই।'

'তোমার এ-ধরনের পাগলামি আগেও আমি অনেক দেখেছি,' বলল রানা। 'আর দেখতে চাই না। তুমি শুধু আমার কাজ বাড়াও, কবির চৌধুরী। বুঝতে পারছি, তোমার সর্বশেষ প্রজেক্টটাও আমাকেই ধ্বংস করতে হবে।'

'ব্রাভো! ব্রাভো!' ঠোট চেরা পাতলা হাসি লম্বা হলো একটু, কবির চৌধুরী প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা একমাত্র তোমারই আছে, রানা।

'এটা বাদে, তোমার গুণের কিন্তু কোন অভাব নেই। আচ্ছা, তোমাকে কি কখনও বলেছি যে আমি তোমার একজন ভক্ত? তোমার-আমার সম্পর্কটা আসলে হেইট অ্যান্ড লাভ, ঘৃণা আর ভালবাসার সম্পর্ক। এটা বোধহয় মিউচুয়াল। পরস্পরকে যতটা ঘৃণা করি আমরা, তিক ততটাই ভালবাসি। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে আমি আর হাতছাড়া করব না।'

'ঠিক কী বলতে চাও?' রানার বুকের ভিতর একটা স্তম্ভ দানা বাধছে।

'তুমি যাতে জীবনে আর কোর্দান আমার ক্ষতি করতে না পার, তার পাক্যাপাক্য একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি,' বলল কবির

চৌধুরী। 'তোমার মগজ ধোলাই করা হবে, রানা। ফলে নিজের প্রায় সবটুকু অতীত ভুলে যাবে তুমি। তবে বিশেষভাবে খেয়াল রাখব তোমার সমস্ত গুণ আর দক্ষতা যেন অটুট থাকে। তুমি হবে আমার সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, আড়াই কোটি সাইবর্গ নিয়ে তৈরি করা হবে সেই সেনাবাহিনী। গোটা দুনিয়াকে শাসন করার জন্যে এর কমে হবে না। তারপর এক সময় শুধু সাইবর্গরাই থাকবে। এর তাৎপর্য তুমি ধরতে পারছ, রানা? গোটা দুনিয়া শাসন করবে তুমি, আমার নির্দেশ মোতাবেক।'

'ভিনারে দাওয়াত দিয়ে এভাবে প্রলাপ শোনাবে?' তিজ কণ্ঠে বলল রানা। 'তোমার প্রস্তাব আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করছি।'

'দুঃখিত, সত্যি দুঃখিত,' বলে দরজার দিকে এগোল কবির চৌধুরী, সেটা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার বডিগার্ড আবদুল্লাই চনমনা।

কবীর চৌধুরীর পিছু নিয়ে কন্ট্রোলরুমে ঢুকল রানা, সঙ্গে ললিতা। মাঝারি আকারের একটা কামরা, দরজার উল্টোদিকের পুরোটা দেয়াল জুড়ে বড়সড় একটা কন্ট্রোল প্যানেল, বোয়িং বিমানের ককপিটে যেমনটি দেখা যায়-ঝাঁক ঝাঁক সুইচ, লিভার, ডায়াল আর ডিসপ্লে মনিটর।

'বসো তোমরা,' বলল কবির চৌধুরী, কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে ফেলা চেয়ারগুলোর দিকে মাথা ঝাঁকাল। তারপর নিজে একটা চেয়ারে বসে সুইচ টিপল কয়েকটা। তার আগে দেখে নিল আবদুল্লাই চনমনা ঠিক রানার পিছনে পজিশন নিয়েছে কিনা।

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে,' বলল রানা, এইমাত্র জ্যান্ট হয়ে ওঠা মনিটরের দিকে চোখ। তবে ঠিক কোন্ বোতামটা টিপল কবির চৌধুরী, দেখে নিতে ভুল করেনি।

বিশাল একটা কারখানার দৃশ্য ফুটে উঠেছে মনিটরে-এক

মাথা থেকে আরেক মাথা এত দূরে যে চোখে ঝাপসা দেখাচ্ছে, তবে তারপরও অস্পষ্টভাবে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। কারখানাটা পরিত্যক্ত বলে মনে হলো রানার। ওঅর্কবেল্ল, শেলফ, মেঝে, ক্যাটওয়াক-মোট কথা এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সাইবর্গদের দেখা যাচ্ছে না।

তবে তারা কেউ নড়ছে না। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে-সব রকম ভঙ্গিতেই দেখা যাচ্ছে তাদেরকে। রানা আন্দাজ করল সংখ্যায় তারা বিশ হাজারের বেশি হবে তো কম নয়।

'ওরা নড়ছে না কেন?' নীরবতা ভেঙে সবাইকে একটু যেন চমকেই দিল ললিতা।

'কারণ ওরা বেঁচে নেই,' জবাব দিল কবির চৌধুরী। 'ফিল্ডে পাঠিয়ে দেখলাম পারফরম্যান্স সন্তোষজনক নয়। অর্থাৎ ওদের মধ্যে নানা রকম ত্রুটি রয়েছে। তাই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তেইশ হাজার তিনশো বাইশটা সাইবর্গের স্বত্বপূর্ণ অচল করে দিয়েছি আমি।'

শিউরে উঠল রানা। 'এতগুলো মানুষকে তুমি মেরে ফেললে!'

'চোরাচালানি, জেলে-এদেরকে তুমি মানুষ বলো?' হাসল কবির চৌধুরী। 'আমি বলি গিনিপিগ।'

'কিন্তু ওদের রক্ত-মাংসের অংশটুকু?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাতে পচন ধরেনি কেন?'

'গোটা কারখানাটাই ডিপ ফ্রিজ,' বলল পাগল বিজ্ঞানী। 'প্রয়োজনীয় ত্রুটি মেরামত করার জন্যে রক্ত-মাংসের অংশটুকু ফেলে দিয়ে সংযোজন করা হবে নতুন রক্ত-মাংস। আসলে তেইশ হাজার নতুন মানুষ দরকার আমার। সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই তেইশ হাজারকে চিনে পাঠাব। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মত ছোট দেশে সাইবর্গ পাঠানোটা আমার একটা ভুল সিদ্ধান্ত

ছিল। প্রথমেই একটা সুপার পাওয়ারের ক্ষমতা দেখল করা উচিত। বাকি দুনিয়া দেখল করা তা হলে অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

‘আমার খিদে পেয়েছে,’ বলল রানা। ‘ঘড়ি...’

‘নটা বাজতে দেরি আছে এখনও,’ রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল কবির চৌধুরী। ‘এবার এটা দেখো, এখানে ক্রটিহীন নতুন সাইবর্গ তৈরি হচ্ছে।’ একটা সুইচ টিপল সে। জুম লেন্স-এর মাধ্যমে কারখানার দূরপ্রান্তের ঝাপসা দৃশ্য ছাপানু ইঞ্চি মনিটরের একেবারে সামনে চলে এল। নড়াচড়ার যে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, এবার সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা।

এখানে কিছু জীবিত সাইবর্গকে ব্যস্ত দেখা গেল। সংখ্যায় তারা এক-দেড়শো হবে। প্রত্যেকে একটা করে মরা সাইবর্গকে কাঁধে তুলে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কারখানা থেকে। বিরতিহীন আসা-যাওয়ার মধ্যে রয়েছে তারা।

আরেকটা সুইচ টিপল কবির চৌধুরী। মনিটরে নতুন একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। প্রকাণ্ড আকারের ইস্পাতের ভ্যাট দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি অনেকগুলো। প্রতিটি ভ্যাটের গায়ে ধাতব মই লাগানো। কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে মই বেয়ে উপরে উঠছে জীবিত সাইবর্গরা, তারপর ঢাকনিবিহীন খোলা ভ্যাটে ফেলে দিচ্ছে কাঁধের মরা সাইবর্গদের।

আবার সুইচ টিপল কবির চৌধুরী। এবার সিলিঙের একটা ক্যামেরার চোখ দিয়ে ভ্যাটের ভিতরের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ওরা। ইলেকট্রিক হিটিং সিস্টেমের সাহায্যে ভ্যাটের পানি গরম করা হয়েছে। ফুটন্ত পানিতে মৃত সাইবর্গদের ফেলা হচ্ছে ধাতব যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র থেকে রক্ত-মাংসের অংশটুকু আলাদা করার জন্য।

ফুঁপিয়ে উঠে দু’হাতে মুখ ঢাকল ললিতা।

রানা অনুভব করল ওর পিছনে নড়েচড়ে দাঁড়াল আবদুল্লাহ

চনমনা। কবির চৌধুরীর দিকে তাকাল ও। ‘তুমি পড়ও অধম!’

‘ভ্যাটের পানিতে কেমিক্যাল মেশানো আছে। রক্ত-মাংস সব খুব সহজে আলাদা করে ফেলবে, ভ্যাটে থেকে যাবে শুধু ইকুইপমেন্টগুলো। হাতঘড়ি দেখল কবির চৌধুরী। ‘প্রায় নটা বাজে,’ ঠোঁটের স্থির হাসি নিয়ে রানার দিকে তাকাল। ‘চলো, আগে খেয়ে নিই। বাকি সব পরে দেখাব।’

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসে আবার সেই আগের চেয়ারগুলোতেই বসল ওরা। রানাকে আরও খানিকটা ভদকা মার্টিনি দিল আবদুল্লাহ চনমনা। সবার অগোচরে সেটুকু ফ্লাওয়ার ভাসে ঢেলে দিল ও।

আবার লেকচার বাড়তে শুরু করল বিপথগামী প্রতিভা। ‘যে কোনও বড় প্রজেক্টে শত শত কোটি টাকার দরকার হয়। কেউ একজন আমার মাথায় আইডিয়াটা ঢোকাল-পাখির বর্জ্য বা বিষ্ঠাকে সোনায়ে রূপান্তর করা যায়। সত্যি যায় কিনা দেখার জন্যে নিষ্ঠা নিয়ে কাজে নামলাম। কদিন পরই এটাকে আমার আদর্শ একটা ইন্ডাস্ট্রি বলে মনে হলো। সারাক্ষণ অর্ডার আসছে এই প্রাকৃতিক সারের।

‘পাখিগুলোর কোন যত্ন দরকার নেই, ওগুলোকে শুধু শান্তিতে থাকতে দিলেই হলো। প্রতিটি পাখি ছাড়কে মলে পরিণত করার স্রেফ একটা কারখানা বিশেষ। গোয়ানো খোঁড়ার সময় শুধু খেয়াল রাখতে হয় বেশি খুঁড়ে যেন অপচয় করা না হয়। শ্রমিকদের পিছনে খরচ অতি নগণ্য। বাংলাদেশী টাকায় হিসেব দিলে বুঝতে সুবিধে হবে তোমার। ধরো শ্রমিকদের আমি মাথা পিছু বিশ টাকা করে রোজ দিই। একটন গোয়ানো খুঁড়তে পাঁচজন লোকের সারাদিন লেগে যায়। এটা আমি বিক্রি করি পনেরো হাজার টাকায়। লাভে লাভ।

‘ইঞ্জিনিয়ার আনিয়ে তৈরি করলাম কাভারটা, আরামদায়ক স্যানাটোরিয়াম। ডাক্তার আর নার্সদের চাকরি দিলাম। এ-সবের

শয়তানের দ্বীপ

ভেতরে গোপনে চলছে সাইবর্গ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজ।

‘তারপর উপদ্রব হয়ে দেখা দিল একটা পাখি-রোজিয়েট স্পুনবিল। বিশদ ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, কারণ অনেকটাই তুমি জানো বলে সন্দেহ করি। এইচআরবি সোসাইটির কর্মী দু’জনকে অনুমতি দিইনি আমার এদিকে আসার। ওরা আসতও না। তারপর কী হলো? সোসাইটি চিঠি লিখে আমাকে জ্ঞানাল এই বিরল পাখি লোকে দেখতে আসতে চায়, তাই অয়েস্টার দ্বীপের নিজেদের অংশে তারা একটা আবাসিক হোটেল বানাবে।

‘উত্তরে তাদের অংশ অবিশ্বাস্য মোটা টাকায় কিনে নিতে চাইলাম আমি। কিন্তু তারা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমার উচ্ছেদ করতে হলো। ড্রাগন পাঠিয়ে পুড়িয়ে দিলাম কর্মীদের ক্যাম্প। শুধু ওদেরকে নয়, ওদের পাখিগুলোকেও আগুনের ভয় দেখিয়ে খেদিয়ে দিয়েছি...’

‘এ-সব শোনার কোন আগ্রহ নেই আমার,’ তাকে বাধা দিয়ে বলল রানা। ‘এখানে আমি এসেছি একটা কেসের সূত্র ধরে। সূর্য আর রচনার কথা বলো। কোথায় তারা?’

‘আমি কাউকে মিথ্যে আশা দিই না,’ ভারী গলায় বলল একই সঙ্গে বাঙালী জাতির গর্ব এবং অভিশাপ কবির চৌধুরী। ‘তাতে অযথা সময় নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে। তারা বেঁচে নেই, রানা। সাগরের তলায় ঘুমাচ্ছে।’

‘তুমি জানো, আমিও কাউকে মিথ্যে হুমকি দিই না,’ বলল রানা। ‘নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ওদের মৃত্যুর বদলা নেব আমরা?’

‘বলো, চেষ্টা করবে।’ সরু হাসিটা আগের মতই স্থির হয়ে থাকল দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর ঠোঁটে। ‘আমি জানতাম পোকাটা মাকড়সার কাছে আসবে। তোমার অপেক্ষায় তৈরি হয়ে ছিলাম আমি। রাডার স্ক্রিনে যে-ই নৌকাটা দেখতে পেলাম,

ভাবলাম-চুকছ বটে, কিন্তু বেরুতে পারবে না।’

‘তোমার রাডার তেমন কাজের জিনিস নয়। নৌকা ছিল আসলে দুটো। তোমার রাডারে ধরা পড়েছে মেয়েটির নৌকা। তোমাকে বললাম না, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।’

‘সেক্ষেত্রে বলতে হয় মেয়েটির দুর্ভাগ্য। ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্যে স্থানীয় একটা মেয়ে আমার দরকারও। যেমন বলছিলাম তোমাকে, কেউ কিছু চাইলে কীভাবে যেন সেটা পেয়ে যায় সে।’

চিন্তিত ভঙ্গিতে কবির চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ধোঁকা দিয়ে পার পাওয়া যাবে কিনা ভাবছে, অন্তত খানিকটা সুবিধে আদায় করতে পারলেও মন্দ হয় না। সহজ ভঙ্গিতে, প্রায় নির্লিপ্ত সুরে বলল, ‘নিজের বিপদ সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে তোমার কোন ধারণাই নেই। তোমার সমস্ত কীর্তির রিপোর্ট আর আমার লোকেশন ঢাকায় পৌঁছে যাবে সময় মত।’

‘আমার কীর্তি?’

‘বিশাল ফলের উৎস, কাকড়া বিছা, বিধ্বস্ত মোটর কার-সব রেকর্ড করা হয়েছে। তামান্না রিরিন ডলির নামটাও। আমি অয়েস্টার দ্বীপ থেকে তিন দিনের মধ্যে ফিরতে ব্যর্থ হলে এই রিপোর্টের কপি পৌঁছাবে ঢাকায় আর আকিয়াবের আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক কর্নেল চাও পারায়ার অফিসে।’

থামল রানা।

কবীর চৌধুরীর চেহারায় কোন বিকার নেই। মুখ বা চোখ নড়েচড়ে না। জাগিউলার শিরাটা স্বাভাবিক ছন্দে লাফাচ্ছে। সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। নরম সুরে বলল, ‘তবে শুধু মেয়েটির কথা ভেবে, তোমার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে রাজি আছি আমি। আমাদেরকে আকিয়াবে নিরাপদে ফিরে যাবার সুযোগ দাও, কেটে পড়ার জন্য তোমাকে এক হপ্তা সময় দেয়া হবে। তুমি তোমার টাকা-পয়সা আর প্লেন নিয়ে পালাবার

শয়তানের দ্বীপ

সুযোগ পাবে।’

কবীর চৌধুরী কিছুই বলছে না।

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'তুমি আত্মহী, ডক্টর গজেনবি?'

চোদ্দ

রানার পিছন থেকে একটা শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'টেবিলে
ডিনার দেয়া হয়েছে।'

ঘাড় ফেরাল রানা। বডিগার্ড লোকটা। পাশে আরেকজন,
যমজ হতে পারে। পেশিবহুল পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে,
হাতগুলো কিমোনের ভিতর ঢোকানো, তাকিয়ে আছে রানার
মাথার উপর দিয়ে কবির চৌধুরীর দিকে।

‘ও, আচ্ছা, এরইমধ্যে তা হলে নটা বেজে গেছে।’ ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল পাগল বিজ্ঞানী। ‘চলো তা হলে। আরও ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনাটা কন্টিনিউ করা যাবে।’

সাদা জ্যাকেট পরা দু'জন লোকের পিছনে খোলা একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কবির চৌধুরীর পিছু নিয়ে মেহগনি কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া চারকোনা একটা কামরায় ঢুকল ওরা, আলোর উৎস সোনালি একটা ঝাড়বাতি আর প্রায় একশো মোমবাতি সহ একটা রূপালি মোমদানি।

ঝাড়বাতির সরাসরি নীচে মেহগনি কাঠের ডাইনিং টেবিল
তিনজনের জন্য সাজানো। প্লেট, চামচ ইত্যাদি সবই নকশা করা
রূপোর তৈরি।

নকশাবিহীন গাড়ী নীল কার্পেট। উঁচু পিঠ সহ মাঝখানের

চেয়ারটায় বসল কবির চৌধুরী। মাথা ঝাঁকিয়ে ডান দিকের
চেয়ারটা ললিতাকে দেখাল। বসার পর সাদা সিন্ধু ন্যাপকিনের
ভাঁজ খুলল ওরা।

ফাঁপা বা শূন্যগর্ভ আনুষ্ঠানিকতা আর আকর্ষণীয় কামরাটা খেপিয়ে তুলছে রানাকে। নিজের হাতে এই পরিবেশ ধ্বংস করতে ইচ্ছে করছে ওর-ন্যাপকিনটা কবির চৌধুরীর গলায় পেঁচিয়ে দুই প্রান্ত ধরে টান দিলে কেমন হয়? যতক্ষণ কালো গর্ত থেকে পাথরের মণি দুটো ছিটকে বেরিয়ে না আসে?

গার্ড দু'জনের হাতে সুতি দস্তানা। তারা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করল পেশাদারি দক্ষতার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে দু'একটা বার্মিজ শব্দ উচ্চারণ করে তাদেরকে উৎসাহ যোগাল কবির চৌধুরী।

প্রথম দিকে অন্যমনস্ক মনে হলো তাকে। আস্তে-বীরে তিন ধরনের সুপ শেষ করল। হাতল লাগানো চামচ ব্যবহার করেছে সে, চিমটার মাঝখানে নিখুঁতভাবে ফিট করেছে হাতলট।

নিজের ভয় যতটুকু পারা যায় মেয়েটির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে রানা। ওর ভাব আর আচরণ দেখে মনে হবে খুব খিদে পেয়েছে, খেতেও পারছে প্রচুর। খাওয়ার ফাঁকে হাসি হাসি মুখ করে ললিতাকে বাংলাদেশের গল্প শোনাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর পা টেবিলের তলায় ললিতার পা বুঁজে নিচ্ছে। ললিতাও পরিস্থিতি ভুলে মনের আনন্দে হাসছে। তবে রানার রোন ধারণা নেই ওর ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা আদৌ কাজে লাগছে কিনা।

মেয়েটির সঙ্গে কিছু করার ফাঁকে সবচেয়ে বারানটির জন্য
নিজেকে তৈরি করেছে। অন্য সব পোনের পাশে অস্ত্রের যে
অভাব নেই। সেই কারণেই বৃষ্টির ফাঁকে, অন্য ই
করছে কী ধরনের। বৃষ্টির ফাঁকে, বৃষ্টির ফাঁকে
করার পরে যেই বৃষ্টির ফাঁকে, বৃষ্টির ফাঁকে
আর কথা বলা হয়। বৃষ্টির ফাঁকে, বৃষ্টির ফাঁকে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

টেনে নিল নিজের দিকে। ওটা দিয়ে মাংস কাটা হয়। ডান হাতের ধাক্কা লেগে শ্যাম্পনের গ্লাসটা পড়ে গেল টেবিলে। ওটা পতনের মুহূর্তেই বাঁ হাত স্যাৎ করে কিমোনোর গভীর আঙ্গিনে টেনে নিল ছুরিটাকে।

রানা ক্ষমা-প্রার্থনা করল, সেই সঙ্গে বডিগার্ডদের সঙ্গে হাত লাগাল টেবিল মোছায়। বাম হাত উঁচু করল ও, অনুভব করল ছুরিটা পিছলে বগলের তলায় পৌঁছে গেছে, তারপর কিমোনোর ভিতর দিয়ে নেমে এল পাজরের কাছে। কাটলেট খাওয়া শেষ করে কোমরের সিল্ক বেল্ট আঁটো করে নিল ও, ছুরিটাকে সরিয়ে এনেছে পেটের উপর। ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে ইস্পাতটা।

খাওয়ার পাট শেষ হয়ে এসেছে, পরিবেশিত হলো কফি। গার্ড দু'জন ভিতরে ঢুকে রানা আর ললিতার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াল। বুকে হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছে তারা, ভাবলেশহীন, অটল, জল্লাদের ভঙ্গিতে।

পিরিচে আস্তে করে নিজের কাপটা নামিয়ে রাখল কবির চৌধুরী। নিজের সামনে টেবিলের উপর ইস্পাতের চিমটা দুটো ফেলে রাখল। শরীরটাকে ইঞ্চিখানেক রানার দিকে ঘোরাল সে। চেহারায় এই মুহূর্তে এতটুকু অন্যমনস্কতার ভাব নেই। চোখ দুটো কঠিন, তাকানোর ভঙ্গি সরাসরি। সরু মুখে সামান্য ভাঁজ পড়ল, তারপর খুলে গেল সেটা। 'ডিনারটা তুমি উপভোগ করলে, রানা?'

ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল রানা, সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেভাবেই হোক লাইটারটা চুরি করবে। আঙুনও আরেকটা সম্ভাব্য অস্ত্র।

'ওহ, ইয়েস!' বলল ও। কয়েকটা টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল সিগারেট, লাইটারটা এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে বাঁ বগলের তলায়। চোখে-মুখে খুশি খুশি ভাবটা ধরে রেখে কবির চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এরপর কী, চৌধুরী?'

'আমরা ডিনার-পরবর্তী এন্টারটেইনমেন্ট চালিয়ে যেতে পারি, রানা,' বলল কবির চৌধুরী। ঠোঁটের হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল আবার। 'তোমার প্রস্তাব সবদিক থেকে পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। গ্রহণ করতে পারলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কাজটা তুমি ভাল করছ না।'

'তোমার প্রস্তাব সোনার ডিম, রানা। তুমি যেভাবে বলছ এসপিওনাজ এজেন্টরা সেভাবে কাজ করে না। তা ছাড়া, তোমার কথা সত্যি হলেই বা কী? পুলিশ আসবে? মিলিটারি আসবে? আসুক না। কোথায় সেই লোক আর সেই মেয়ে? কোন্ লোক, কোন্ মেয়ে? আমি তো কিছুই জানি না। প্রিজ, আমার দ্বীপ ছেড়ে চলে যান। কাজেই, রানা, বুঝতেই পারছ, তোমার ব্রাফ কোনও কাজে লাগেনি।'

'শোনো। তোমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। আমাকেও ঘুমাতে যেতে হবে। মাসে মাসে যে জাহাজটা আসে, সেটার কাল আসার কথা, লোডিং সুপারভাইজ করতে হবে আমাকে। সারাদিন জেটিতেই থাকতে হবে কাল। যদি কিছু বলতে চাও, রানা, তাড়াতাড়ি!'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। আমি জানতে চেয়েছি,' বলল রানা, 'এরপর কী?'

'ও, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই অনেক কিছু ভাবছ। তোমার আবার বোজ নেয়ার অভ্যাস। ঠিক আছে, পরের পাতাটা ওল্টাচ্ছি আমি। এই দ্বীপে পঞ্চাশ হাজার লোককে ধরে এনে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তাদেরকে দেখতে চাইলে আমার সঙ্গে আরেকবার কন্ট্রোলরুমে যেতে হবে তোমাকে।- বুঝতেই পারছ এই পঞ্চাশ হাজার লোককেও সাইবর্গ বানাব আমরা।'

'কাজেই বার্মিজ এয়ার ফোর্স বোমারু বিমান পাঠিয়ে যদি অয়েস্টার দ্বীপ ধ্বংস করে দেয়, পঞ্চাশ হাজার মানুষকে হত্যা করার জন্যে দায়ী থাকবে তারা।'

‘আমি কিন্তু এখনও প্রশ্নটার জবাব পেলাম না,’ বলল রানা।
‘নাকি তুমি আমার প্রশ্ন বুঝতেই পারনি? আমি আসলে জানতে চাইছি, আমাদেরকে নিয়ে কী করবে বলে ভাবছ তুমি।’

‘তুমি দুনিয়ার শাসক হতে রাজি হলে না, আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে। তাই স্থির করেছি এখন আর সাইবর্গ নয়, আমি ক্রোনবর্গ তৈরি করব।’

‘ক্রোনবর্গ? সেটা আবার কী?’ রানা শঙ্কিত।

‘ক্রোনবর্গ কী, সংক্ষেপে এর উত্তর দিলে ধাঁধার মত শোনাবে,’ বলল কবির চৌধুরী। ‘প্রমাণ দিচ্ছি—ক্রোনবর্গ হলো এক গুচ্ছ মাসুদ রানা।’

‘হেঁয়ালি বাদ দিয়ে...’

‘ধারণা করেছিলাম, আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে তুমি, তাই বিকল্পটাও ভেবে রেখেছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি দুধের সাধ ঘোলে মেটাব। সেটা কী রকম? তোমার গুধু একটা চুল নেব আমি, রানা। আর সেই চুল থেকে বানাব ক্রোন মাসুদ রানা।’

‘বলেছি—এক গুচ্ছ। তারমানে কিন্তু কয়েকটা নয়, নয় দু’পাঁচ হাজার, এমন কী লাখ-লাখও নয়, হে। মাসুদ রানার ক্রোন তৈরি করা হবে কোটি কোটি। কত কোটি? সে প্রশ্নে পরে আসছি।’

‘বিশেষ একটা কৌশল করায় দেখতে তারা এক রকম হবে না, তবে বুদ্ধিতে, মেধায়, সাহসে, নিষ্ঠায়, আত্মবিশ্বাসে তোমার মতই ক্ষমতামূলী হবে—মোটকথা, তোমার সমস্ত গুণ আর বৈশিষ্ট্য বোলআনাই পাবে তারা।’

‘এমন ভাবেই করা হবে, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে তোমার ওই ক্রোনগুলো। তোমাকে দিয়ে যে কাজ আমি করাতে পারিনি, ওদেরকে দিয়ে সেই কাজ অনায়াসে করিয়ে নিতে পারব। আমার নির্দেশে মানুষ নামের কীটগুলোকে দুনিয়ার বুক থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেবে তোমার ওই

ডুপ্লিকেটগুলো। একসময় দেখা যাবে, কীট নেই, তাদের জায়গায় আছে গুধু ক্রোনবর্গ। হাহ হাহ হাহ হাহ!’

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। বিড়বিড় করে বলল, ‘কার সাধ্য এই শালা পাগলকে সামলায়!’ গলা চড়িয়ে বলল, ‘আমি তোমার প্রলাপ শুনতে চাইনি। জানতে চেয়েছি এখন থেকে আমরা কি চলে যেতে পারব, সে স্বাধীনতা আমাদের আছে?’

‘এখনই বলছি তোমাদেরকে নিয়ে কী করা হবে!’ কবির চৌধুরীর চেহারা থেকে অকস্মাৎ যেন একটা মুখোশ খসে পড়ল। শিরদাঁড়া খাড়া করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তার বসে থাকা হঠাৎ করে যেন ভীতিকর হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল সে। গার্ড দু’জন সঙ্গে সঙ্গে এক পা করে সামনে এগিয়ে দুই বন্দির কনুই চেপে ধরল, তারপর জোর খাটিয়ে ওদের হাতগুলোকে পিছনে টেনে এনে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল।

রানা বা ললিতা, কেউ কোন বাধা দিচ্ছে না। রানা খেয়াল রাখছে লাইটারটা যেন বগলের তলায় থাকে। মেয়েটির দিকে ফিরে হাসল ও। ‘সত্যি আমি দুঃখিত, লোলি। আমাদের সম্পর্কটা বেশি দূর গড়াবে বলে মনে হচ্ছে না।’

ললিতার চেহারা স্নান, ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল। ‘ব্যথা পাব?’ জানতে চাইল সে।

‘সাইলেন্স!’ অকস্মাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল কবির চৌধুরী। ‘যথেষ্ট অর্বাচীনতা হয়েছে। ব্যথা তো অবশ্যই লাগবে। বিজ্ঞান চর্চার স্বার্থে সম্প্রতি ব্যথা দেয়ার ব্যাপারে আমি ইন্টারেস্টেড। আমার এ-ও দেখার ইন্টারেস্ট রয়েছে যে হিউম্যান বডি কতটুকু সহ্য করতে পারে। শাস্তি পাওনা হয়েছে, এ-ধরনের লোকদেরকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করি আমি। আর গিনিপিগ বানাই তোমাদের মত লোকজনকে, যারা আমার সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ করতে এসে ধরা পড়ে যায়।’

‘কথা হলো, তোমরা দু’জন আমাকে খুব ভুগিয়েছ। তা

ছাড়া, যেহেতু তুমি আমার চমৎকার প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছ, কাজেই তোমাদেরকে নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাব। এটা আমার উপরি পাওনা! এক্সপেরিমেন্ট মানে, প্রচেষ্টা বাধ্য দেব। আমি রেকর্ড করতে চাই—কতক্ষণ টিকে থাকবে তোমরা। সমস্ত ক্যাঁচ টুকে রাখবে। একদিন আমার আবিষ্কার দুনিয়ার মানুষকে দান করা হবে। তোমাদের মৃত্যু বৃথা বাবে না, বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মানুষের কোন জিনিসই না হতে দিই না আমি। যুদ্ধের সময় জার্মান বিজ্ঞানীরা জীপির ব্যাডির ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাত বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মহৎ উদ্দেশ্যে। এক বছর আগে একটা মোরোকে সেভাবে মেরেছি, তোমাদেরও সেভাবে মারার প্ল্যান করেছি আমি, লোলি। সেই মোরোটটি ছিল শ্রেষ্ঠতম। তিন ঘণ্টা টিকেছিল সে। কুলম করার জন্য স্থানীয় একটা মোরে দরকার ছিল আমার, তাগাত্তো তোমাকে পোরে গেলাম। দীপে তোমার আগমন বন্ধন রিপোর্ট করা হলো আমাকে, আমি অবাক হইনি—বন্ধন বেটা চাই, সেটাই পাই আমি।’ চেয়ারে হেলান দিল করির চৌধুরী। তার চোখ এখন ললিতার দিকে নিবদ্ধ, মোরোটটির প্রতিদিন্য লক্ষ করতে ললিতাও তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে, বেন সামোভির হয়ে।

রানা দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

‘তুমি একজন বার্মিজ মোরে, হিন্দু, কাজেই তুমি বুঝবে ঐ নিয়ে কথা বলছি আমি। মাদানমাতের বৈশিষ্ট্যগুণ দীপই কাকড়া ভর্তি। বার্মার লোকেরা এগুলোকে “কালো কাকড়া” বলে। গুগলোর একেকটির ওজন এক পাউন্ড, আকারে পিরিয়ে সমান। বছরের এই সময়টার তীরের কাছাকাছি গর্ত খোদে হাজারে হাজারে বেরিয়ে আসে, তারপর বন্ধন ঢাল বেয়ে পাহাড় উপরে গুরু করে, দেখে মনে হয় কালো চানুর বিছানো হচ্ছে।

‘পাহাড়ী ওই ঢালে, পাথরের গারে, প্রচুর গর্ত আছে

সেখানে ডিম পাড়ে গুগলো। একেকবার কাকড়াশ কাকড়া মিছিল করে এসে। সমস্ত বাবা উপরে এসে মিসিলা। এমন কী সামানে বড়-বাড়ি পড়লও সেটার ওপর নিচে এসে।’ বেন নেওয়ার জন্য কামল করির চৌধুরী।

তারপর নরম সুরে আবার শুরু করে, ‘এবার আসল কথাটি বলি। এই কাকড়া বড়ই বিচিত্র। ঢালার পাত বা পাত তারই যান গ্রহণ করে গুগলো। এই মুহুর্তে, লোলি, গুগলোর মিছিল শুরু হয়েছে। পাহাড়ী ঢাল বেয়ে উপরে আসছে হাজার হাজার—একদম পর এক টকটকে লাল, কামলা মত কালো ডেঁটে। তোমাদের মাথার ওপর। এই মুহুর্তে।

‘অর আজ রাতে এসেবার শেষ শ্বেরে নিচে পাহারে হাত-পা গাঁবা একটা মোরোকে গারে গুগলো। গরম শরীরটি অনুভব করবে। গুগলোর “কটীচামড়”, মানে, মোরোটটি প্রথমে মোটে একটা কুটো করবে। তারপর শুরু হবে ভোজন—’

ভক্তির চোরে আচর্য্য বেরিয়ে এল ললিতার গলা থেকে। মাথাটা আলগা একটা ভক্তিতে বুকের কাছে বুকে গুলে। জ্ঞান হারিয়েছে সে।

রানার শরীরটি হঠাৎ করে হোঁপ টান দেয়ায়। দু’মিনিট দাঁতের কঁক গলে ছিটকে বেরিয়ে এল বাহুরি করা অশ্রুদ্রব কিছু গালি। এর বাহুর চরপাশে আঙনের মত হাত আছে গাঙের প্রকাণ্ড হাত। কথা জোঁ, চেয়ারের পাতা পবিত্র নুড়িতে গুলে না ও। এক মুহুর্ত পর জিল দিল শেনিয়ারে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল নিজেদের শান্ত করতে, তারপর কাকড়ের দিল মোরোট কল, ‘ইউ বান্টার্ড। এর জ্ঞান নরকের আঙন গুলিয়ে ছা’ তোমাদের।’

সকল হানিটা করির চৌধুরী মোটে অস্বস্তি লগ্ন। ‘আমি নরকের অস্তিত্ব শিখল কই না। বাগারী মো’ বানা। সাকুনা দাও

শরতচন্দ্রের দীপ

থেকে শুরু করবে। পালস-এর বিট আকুট করবে ওগুলোকে। তারপর আর বেশি সময় লাগবে না।" বার্মিজ ভাষায় একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে।

মেরেটির পিছনে দাঁড়ান গার্ড সামনের দিকে ঝুঁকে ডেয়ার থেকে অনায়াসে তুলে নিল তাকে, ললিতা বেন ছোট্ট একটা শিশু। তারপর তাকে কাঁধে ফেলল। ঝুলন্ত দুই হাতের মাঝখানে রাশি রাশি এলো চুল খসে পড়তে দেখল রানা। দরজার দিকে এগোল গার্ড। কব্জি ধুলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে আবার সেটা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকল কামরাটা। রানা শুধু চামড়ায় লেগে থাকা ছুরি আর বগানের নীচে আটকান লাইটারের কথা ভাবছে। এই দুটুকরো মেটাল দিয়ে কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে? আলো কি পাগলটাকে নাশালের মাঝে পাবে ও?

উন্মাদটা শান্ত সুরে বলল, "এবার, রানা, তোমার বিনায় নিয়ে আলোচনা করি। এটির মাঝেও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা আছে। মানুষের সাহসের প্রতি আমার রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। সাহসের ব্যাবহায়ে আমি সাংঘাতিক আছি। সেইসঙ্গে আমার জানতে ইচ্ছে করে মানুষের সহায়কমতা আনলে কতটুকু।

কিছু সহায়কমতা আমার উপায় কী? বাঁচার ইচ্ছে পরিমাপ করার জন্যে কীভাবে একটা গ্রাক তৈরি করব? এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছি। সমাধানও একটা পেরে-গেছি। তেমন সুস্থ নয়, একটু ভোঁতা আর কর্কশ, তবে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিটিরও উন্নতি হবে। সাবজেক্ট আমি আরও অনেক পার বলে আশা রাখি।

"তোমাকে সোডেটিভ দেব, শরীরটা যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়। ভাল খাওরার, যাতে প্রচুর শক্তি পাও। ভবিষ্যতে তোমার মত রোগী যত পাব-রোগী ছাড়া তোমাদেরকে আর কিছু আমি ভাবতে পারি না-তাদের সঙ্গেও এই একই আচরণ করা হবে।

তারপর যার যত বেশি সহায়কমতা সে তত বেশি সময় টিকে থেকে রেকর্ড তৈরি করবে।" থামল, রানার মুখটা ঝুঁটিয়ে দেখছে। "এর বেশি আর কিছু জানাচ্ছি না তোমাকে। কারণ সারপ্রাইজের অপেক্ষার থাকলে মনে একটা ভয় জাগে। অজানা বিপদই সবচেয়ে ভীতিকর, বিজ্ঞান করা সাহস খেয়ে ফেলে কুয়ে কুয়ে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো-একটা গ্রাক তুমিই হবে প্রথম ডট বা বিন্দু।"

কিছু বলছে না রানা। এ-সবের মানেটা কী? কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট? তাতে কি প্রাপ্যতা করা সম্ভব? তা থেকে পালিয়ে মেরেটির কাছে পৌঁছাতে পারা যাবে?

নিঃশব্দে সাহস সঞ্চয় করছে রানা। অজানা বিপদকে ভয় না পাওয়ার দৃঢ়তা অর্জন করছে।

শরীরের ভাঁজ ধুলে ডেয়ার ছাড়ল পাগল বিজ্ঞানী, পিছনে গেল এক পা, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। দরজার সামনে পৌঁছে থামল সে, যান্ত্রিক গুহুস্রব মত ফুটল। ভীতিকর কালো গার্ড দুটো রানার দিকে তাক করা। সামান্য একটু কাত হয়ে আছে চকচকে মাথা। বেগুনি ট্রোট ভাঁজ হয়ে সোঁমিয়ে গেছে ভিতর দিকে। "খোড়ো নৌড়াবে, কেমন, রানা?" অবাক ফুটল সে, চৌকাত পার হলো। তারপর পিছনে মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

পনেরো

এলিভেটরে একজন লোক রয়েছে। দরজা খোলা। হ্যান্ডক্যাক পরানো বন্দিকে হাঁটিয়ে এনে ভিতরে ঢোকানো হলো।

শয়তানের স্বীপ

থেকে শুরু করবে। পালস-এর বিট আকৃষ্ট করবে ওয়ারেনকে। তারপর আর বেশি সময় লাগবে না।' বার্মিজ ভাবার একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে।

মেরেটির পিছনে দাঁড়ান গার্ট সামনের দিকে বৃকে চেয়ার থেকে অনারাসে তুলে নিল তাকে, ললিতা বেন ছোট্ট একটা শিশু। তারপর তাকে কাঁধে ফেলল। কুলন্ত দুই হাতের মাঝখানে রাখি রাখি এলো চুল খসে পড়তে দেখল রানা। দরজার দিকে এগোল গার্ট। কবাত খুলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে আবার সেটা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকল কামরাটা। রানা শুধু চামড়ার লেগে থাকা ছুরি আর বগলের নীচে আটকান লাইটারের কথা ভাবছে। এই দুটুকরো মেটাল দিয়ে কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে? আদৌ কি পাগলটাকে নাগালের মধ্যে পাবে ও?

উন্মাদটা শান্ত সুরে বলল, 'এবার, রানা, তোমার বিদায় নিয়ে আলোচনা করি। এটার মধ্যেও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা আছে। মানুষের সাহসের প্রতি আমার রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। সাহসের ব্যবচ্ছেদে আমি সাংঘাতিক আগ্রহী। সেইসঙ্গে আমার জানতে ইচ্ছে করে মানুষের সহ্যক্ষমতা আসলে কতটুকু।

'কিন্তু সহ্যক্ষমতা মাপার উপায় কী? বাঁচার ইচ্ছে পরিমাপ করার জন্যে কীভাবে একটা গ্রাফ তৈরি করব? এ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেছি। সমাধানও একটা পেয়ে গেছি। তেমন সূক্ষ্ম নয়, একটু ভোঁতা আর কর্কশ, তবে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিটারও উন্নতি হবে। সাবজেক্ট আমি আরও অনেক পাব বলে আশা রাখি।

'তোমাকে সেডেটিভ দেব, শরীরটা যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়। ভাল খাওয়াব, যাতে প্রচুর শক্তি পাও। ভবিষ্যতে তোমার মত রোগী যত পাব-রোগী ছাড়া তোমাদেরকে আর কিছু আমি ভাবতে পারি না-তাদের সঙ্গেও এই একই আচরণ করা হবে।

তারপর আর যত বেশি সহ্যক্ষমতা সে তত বেশি সময় টিকে থেকে রেকর্ড তৈরি করবে।' থামল, রানার দুখটা বুজিয়ে দেখাচ্ছে। 'এর বেশি আর কিছু জানাচ্ছি না তোমাকে। কারণ সারথাইজের অপেক্ষায় থাকলে মনে একটা ভয় জাগে। অজানা বিপদই সবচেয়ে ভীতিকর, রিজার্ভ করা সাহস খোঁজে কেলে কুত্র করে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো-একটা গ্রাফে তুমিই হবে প্রথম ডট বা বিন্দু।'

কিছু বলছে না রানা। এ-সবের মানেটা কী? কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট? তাতে কি প্রাণরক্ষা করা সম্ভব? তা থেকে পালিয়ে মেরেটির কাছে পৌছাতে পারা যাবে?

নিঃশব্দে সাহস সঞ্চয় করছে রানা। অজানা বিপদকে ভয় না পাওয়ার দৃঢ়তা অর্জন করছে।

শরীরের ভাঁজ খুলে চেয়ার ছাড়ল পাগল বিজ্ঞানী, পিছিয়ে গেল এক পা, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। দরজার সামনে পৌছে থামল সে, যান্ত্রিক পুতুলের মত ঘুরল। ভীতিকর কালো গর্ত দুটো রানার দিকে তাক করা। সামান্য একটু কাত হয়ে আছে চকচকে মাথা। বেগুনি ঠোঁট ভাঁজ হয়ে সঁধিয়ে গেছে ভিতর দিকে। 'ঝেড়ে দৌড়াবে, কেমন, রানা?' আবার ঘুরল সে, চৌকাঠ পার হলো। তারপর পিছনে মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

পনেরো

এলিভেটরে একজনা

পরানো বন্দিকে ই

শয়তানের দ্বীপ

রয়েছে। দরজা খোলা। হ্যাঁ

ভিতরে ঢোকানো হলো।

থেকে গুরু করবে। পালস-এর বিট আকৃষ্ট করবে শুধুমাত্র। তারপর আর বেশি সময় লাগবে না।' বার্মিজ ভাষায় একটা শব্দ উচ্চারণ করল সে।

মেয়েটির পিছনে দাঁড়ান গার্ড সামনের দিকে তাকে চেয়ার থেকে অন্যায়সে তুলে নিল তাকে, ললিতা যেন ছোট একটা শিশু। তারপর তাকে কাঁধে ফেলল। কুলজ দুই হাতের মাঝখানে রাখি রাখি এলো তুল খসে পড়তে দেখল রানা। দরজার দিকে এগোল গার্ড। কবটি খুলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে আবার সেটা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে থাকল কামরাটা। রানা শুধু চামড়ার স্লেগে থাকা ছুরি আর বগলের নীচে আটকান লাইটারের কথা ভাবছে। এই দুটুকরো মেটাল দিয়ে কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে? আদৌ কি পাগলটাকে নাগালের মধ্যে পাবে ও?

উন্মাদটা শান্ত সুরে বলল, 'এবার, রানা, তোমার বিদায় নিয়ে আলোচনা করি। এটার মধ্যেও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা আছে। মানুষের সাহসের প্রতি আমার রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। সাহসের ব্যবচ্ছেদে আমি সাংঘাতিক আগ্রহী। সেইসঙ্গে আমার জানতে ইচ্ছে করে মানুষের সহায়কমতা আসলে কতটুকু।

'কিছু সহায়কমতা মাপার উপায় কী? বাঁচার ইচ্ছে পরিমাপ করার জন্যে কীভাবে একটা গ্রাফ তৈরি করব? এ নিয়ে বগেট চিন্তা-ভাবনা করেছি। সমাধানও একটা পেয়ে-পেছি। তেমন সুস্থ নয়, একটু ভোঁতা আর কর্কশ, তবে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিটারও উন্নতি হবে। সাবজেক্ট আমি আরও অনেক পাব বলে আশা রাখি।

'তোমাকে সেডেটিভ দেব, শরীরটা যাতে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়। ভাল ষাওরাব, যাতে প্রচুর শক্তি পাও। ভবিষ্যতে তোমার মত রোগী কত পাব-রোগী ছাড়া তোমাদেরকে আর কিছু আমি ভাবতে পারি না-ভাসের সঙ্গেও এই একই আচরণ করা হবে।

রানা-ওরে

তারপর যার যত বেশি সহায়কমতা সে তত বেশি সময় টিকে থেকে রেকর্ড তৈরি করবে।' ধামল, রানার ঘুখটা বুটিয়ে দেখছে। 'এর বেশি আর কিছু জানাচ্ছি না তোমাকে। কারণ সারপ্রাইজের অপেক্ষায় থাকলে মনে একটা ভয় জাগে। অজানা বিপদই সবচেয়ে ভীতিকর, রিজার্ভ করা সাহস খেয়ে ফেলে কুরে কুরে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো-একটা ঘাফে তুমিই হবে প্রথম ডট বা বিন্দু।'

কিছু বলছে না রানা। এ-সবের মানেটা কী? কী ধরনের এক্সপেরিমেন্ট? ভাঙে কি প্রাণরক্ষা করা সম্ভব? তা থেকে পালিয়ে মেয়েটির কাছে পৌঁছাতে পারা যাবে?

নিঃশব্দে সাহস নক্ষয় করছে রানা। অজানা বিপদকে ভয় না পাওয়ার দৃঢ়তা অর্জন করছে।

শরীরের ভাঁজ খুলে চেয়ার ছাড়ল পাগল বিজ্ঞানী, পিছিয়ে গেল এক পা, তারপর ঘুরে দরজার দিকে এগোল। দরজার সামনে পৌঁছে ধামল সে, যান্ত্রিক পুতুলের মত ঘুরল। ভীতিকর কাপো গর্ভ দুটো রানার দিকে তাক করা। সামান্য একটু কাত হয়ে আছে চকচকে মাথা। বেতনি ঠোঁট ভাঁজ হয়ে সৈন্যের গেছে ভিতর দিকে। 'ঝেড়ে দৌড়াবে, কেমন, রানা?' আবার ঘুরল সে, চৌকাঠ পার হলো। তারপর পিছনে মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

পনেরো

এলিভেটরে একজন লোক রয়েছে। দরজা খোলা। হ্যাণ্ড-কাম্ফ পরানো বন্দিকে হাঁটিয়ে এনে ভিতরে ঢোকানো হলো।

শরভাসের দীপ

১৮৩

ডাইনিংরুম এখন খালি, ভাবছে রানা। কখন ফিরে গিয়ে টেবিল পরিষ্কার করবে গার্ডরা, খেয়াল করবে একটা ছুরি আর লাইটার পাওয়া যাচ্ছে না?

হিস্‌স্‌ করে মৃদু শব্দের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। অপারেটর সুইচবোর্ডের সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, রানা যেন দেখতে না পায় কোন্‌ বোতামটায় চাপ দিল সে। উপরে উঠছে ওরা। দূরত্বটার আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টা করল রানা। মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে থামল এলিভেটর। মেয়েটিকে নিয়ে নামার সময় যে সময় লেগেছিল ওর, তারচেয়ে যেন কম লাগল। দরজা খোলার পর সামনে কার্পেটবিহীন করিডর দেখা গেল, পাথুরে দেয়াল ধূসর পেইন্ট করা। করিডরটা লম্বায় বিশ গজের কম নয়।

‘একটু অপেক্ষা করো, চিলুইন,’ রানার গার্ড এলিভেটর অপারেটরকে বলল। ‘এখনই আসছি আমি।’

করিডর ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রানাকে। দু’পাশের দরজা হরফ দিয়ে চিহ্নিত করা। কোথাও কোনও মেশিন চলছে, অস্পষ্ট যান্ত্রিক গুঞ্জন ঢুকল কানে। তারপর একটা কামরার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা রেডিওর শব্দজট শুনতে পেল রানা।

শেষ দরজার সামনে পৌঁছাল ওরা। কালো রঙে ইংরেজি হরফ Q আঁকা রয়েছে কবাটে। জোড়া কবাট একটু ফাঁক হয়ে আছে।

হ্যান্ডকাফ খুলে নিয়ে পিছন থেকে রানার পিঠে কনুই দিয়ে ধাক্কা মারল গার্ড। দরজা খুলে গেল পুরোপুরি। ভিতরে ঢুকল রানা।

এটা একটা পাথরের তৈরি সেল, কমবেশি পনেরো বর্গফুট হবে। একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। সেটার পিঠে ধুয়ে ইট্রি করা রানার ক্যানভাস জিন আর নীল শার্টটা দেখা যাচ্ছে।

ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল রানা। হাত দিয়ে দাড়ি মুচড়ে হাসল সে, চোখে কৌতুক আর কৌতূহল দুটোই ছাপ ফেলেছে। এক হাতে দরজার হাতল ধরে আছে সে, অপর হাতে উদ্যত পিস্তল। বলল, ‘এটা তোমার স্টার্টিং পয়েন্ট, ব্রাদার। এখানে বসে পচতে পার, কিংবা পথ করে নিয়ে বাইরের কোর্স-এ পৌঁছাতে পার। বিদায়।’

রানা ভাবল, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী। গার্ডকে ছাড়িয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি। এলিভেটরের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপারেটর, এদিকে তাকিয়ে দেখছে ওদেরকে। মৃদুকণ্ঠে বলল ও, ‘এক লাখ মার্কিন ডলার, সঙ্গে দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় চলে যাবার প্রেন টিকিট। শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, চাইলেই পেতে পার।’ লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে রানা। চওড়া হাসি দেখা গেল তার মুখে।

‘ধন্যবাদ, মিস্টার। আমি বরং বেঁচে থাকব।’ দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে গার্ড।

জরুরি সুরে ফিসফিস করল রানা, ‘আমরা একসঙ্গে এখন থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।’

খোঁকিয়ে উঠল লোকটা। ‘মর জ্বালা!’ ক্লিক করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর ঘট্যাং-ঘট্যাং করে লেগে গেল দুটো বোল্ট।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সময় নষ্ট না করে প্রথমেই দরজাটা পরীক্ষা করল ও। স্টিলের তৈরি, ভিতর দিকে কোন হাতল নেই। হেঁটে এসে চেয়ারে ভাঁজ করা কাপড়গুলোর উপর বসল, সেলের চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

দেয়ালটা সম্পূর্ণ ন্যাড়া, শুধু এক কোণে সিলিঙের কাছে, ভেন্টিলেশন গ্রিল দেখা যাচ্ছে, মোটা তার দিয়ে তৈরি। ওর দুই কাঁধের চেয়ে একটু ওঁচা ওটা। বোঝাই যাচ্ছে, অ্যাস

কোর্স-এ বেরবার ওটাই একমাত্র পথ। দেয়ালে আর খেঁচা
হয়েছে-মোটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা একটা পোর্ট হোল, আকারে
জানার মাথার চেয়ে বড় নয়, দরজার ঠিক উপরে। কবিরের
আলো ওটার ভিতর দিয়েই ঢুকছে সেলে।

এখন সম্ভবত সাত্বে দশটা বাজে। বাইরে পাহাড়ের ঢালে
কোথাও, এরইমধ্যে শুইয়ে ফেলা হয়েছে মেয়েটিকে, আতঙ্কে
নীল হয়ে কাঁকড়ার কামড় খাওয়ার অপেক্ষায় আছে সে। অসহায়
রাগে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। হঠাৎ সিঁধে হলো। কী মনে করে
এখানে চুপচাপ বসে আছে ও! তারের তৈরি গ্রিলের ওদিকে যা-
ই থাকুক না কেন, বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে।

ছুরি আর লাইটার বের করে পরনের কিমোনো খুলে ফেলল
রানা। ট্রাইজার আর শার্ট পরে লাইটারটা হিপ পকেটে ভরল।
আঙুলের ডগা দিয়ে ছুরির ফলা পরীক্ষা করল। যথেষ্ট ধারাল।
ফলার ডগাটা চোখা করা গেলে আরও ভাল হয়।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে ছুরির ভোঁতা ডগা পাথরে ঘষতে শুরু
করল রানা। পনেরো মিনিট শান দেওয়ার পর সম্ভবত বোধ করল
ও। এখন এটা দিয়ে কাটা তো যাবেই, খোঁচাও মারা যাবে।

ছুরিটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে গ্রিলের সরাসরি
নীচে চেয়ারটা টেনে আনল রানা, তারপর ওটার উপর
দাঁড়াল। গ্রিলটা! টেনে ওটাকে কবজা থেকে খুলে আনতে
পারলে সিকি ইঞ্চি চওড়া তারের ফ্রেমটাকে সোজা করে নিয়ে
একটা বন্ধন বানানো সম্ভব হলেও হতে পারে। তাতে করে ওর
অস্ত্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে তিনে। হাত উঁচু করে আঙুল
বাঁকা করল রানা।

কীভাবে কী ঘটল কিছুই বলতে পারবে না রানা, শুধু তীব্র
একটা ঝাঁকি লাগল হাতে, তারপর অনুভব করল পাথরের
মেঝেতে বাড়ি খেল মাথাটা। ওখানেই পড়ে থাকল ও, স্থবির,
ওধু নীল একটা উজ্জ্বল ঝলক আর ইলেকট্রিসিটির হিসহিসানি

মনে করিয়ে দিয়েছে ধাক্কাটা কে দিয়েছে।

দীর্ঘে দীর্ঘে হাঁটুর উপর সিঁধে হলো রানা। মাথাটা নিচু করে
আহত পতর মত এনিক-ওনিক নাড়ল করেকর। একদিকে
খেরাল করল পোড়া মাংসের গন্ধ পায়। ডান হাতটা চোখের
সামনে তুলল ও। সেখান আঙুলের ফাঁকে, ভিতরের চামড়া
খানিকটা পুড়ে গেছে। সেখান পর এখন বাখাটা অনুভব করছে।

দীর্ঘে দীর্ঘে সিঁধে হলো রানা। চোখ বুজে গ্রিলটার দিকে
এমন দৃষ্টিতে তাকাল ওটা বেন বিবাক একটা সাপ, মোকল
হারবে। চোখ-মুখ ধমধম করছে, চেয়ারটা তুলে আবার দেয়াল
ঘেঁষে খাড়া করল। মেঝে থেকে ছুরিটাও তুলল, তারপর
কিমোনো থেকে এক ফালি কাপড় কেটে আঙুলগুলোয় জড়াল।

আবার চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গ্রিলটার দিকে তাকাল রানা।
এটা এখানে আছেই ওকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়ার
জন্য। শকটা ওকে খানিক নরম করেছে-কী ধরনের বাখা
দেওয়া হবে তার একটা নমুনা। সন্দেহ নেই জিনিসটাকে ফিউজ
করে দিয়েছে ও। সন্দেহ নেই বোতাম টিপে বিদ্যুতের প্রবাহ
খামিয়ে দিয়েছে ওরা। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য ওটার দিকে
তাকাল রানা, তারপরই বাম হাতের আঙুলগুলো বাঁকা করে
চালিয়ে দিল তারের জাল লক্ষ্য করে। তারের রিম ভেদ করে
গেল ওগুলো, তারপর আঁকড়ে ধরল।

কিছু নেই! একেবারেই কিছু নেই। শুধু তার। সেটা ধরেই
টান দিল রানা। ইঞ্চিখানেক নড়ল। আবার টানল ও। এবার
ওটা বেরিয়ে এল হাতে, একজোড়া কপার কর্ড থেকে কুলছে,
ওগুলোর দুই প্রান্ত হারিয়ে গেছে দেয়ালের ভিতর।

কর্ড থেকে ফ্রেমটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে চেয়ার থেকে নামল
রানা। জালটা প্রথমে ছিঁড়ে আলাদা করল ও, তারপর
চেয়ারটাকে হাতুড়ির মত ব্যবহার করে ফ্রেমের রডটা সিঁধে
করল। দশ মিনিটের মধ্যে তিন-সুতা ব্যাসের চার ফুট লম্বা

একটা বল্লম তৈরি হয়ে গেল। কারও পরনের কাপড় ভেদ করবে না, তবে হাত-মুখ আর ঘাড়ে গুরুতর জখম তৈরি করতে পারবে।

স্টিলের দরজার নীচে সরু ফাটলে বল্লমের ডগাটা ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিল রানা, ধীরে ধীরে একটু একটু করে বাঁকা হলো সেটা। পায়ের পাশে খাড়া করে মাপ নিল ও। বেশি লম্বা হয়ে গেছে। আরও খানিকটা কসরত করে রডের ডগাটা ছাতার বাঁটের মত বাঁকিয়ে দৈর্ঘ্য কমিয়ে ফেলল। এবার ট্রাইজারের একটা পায়ার ভিতর ঢুকিয়ে রাখল। এখন ওটা ওর বেল্ট থেকে ঝুলছে, পা ঘেঁষে গোড়ালির গাঁট পর্যন্ত চলে এসেছে।

চেয়ারের কাছে ফিরে এসে আবার তাতে চড়ল রানা। একটু নার্ভাস বোধ করছে, তবে ভেন্টিলেটরের কিনারায় হাত দিয়ে এবারও শক খেল না। হাতের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, ফাঁকের ভিতর তুলে আনল শরীরটা, উপুড় হয়ে শুয়ে শাফটের ভিতর দিয়ে সামনে তাকাল।

রানার দুই কাঁধের চেয়ে চার ইঞ্চি বেশি চওড়া শাফটটা। আকারে গোল ওটা, ধাতব, পালিশ করা। লাইটার বের করে জ্বালল ও। হ্যাঁ, জিঙ্ক-এর নতুন আচ্ছাদন চকচক করছে। ওর সামনে সোজা এগিয়েছে শাফট, শুধু পাইপগুলো জোড়া লাগার জায়গা একটু উঁচু হয়ে আছে। আগুন নিভিয়ে লাইটারটা পকেটে রেখে দিল ও, তারপর সাপের মত ক্রল করে এগোল।

অন্যায়সে এগোতে পারছে রানা। ভেন্টিলেটিং সিস্টেম থেকে আসা জোরাল ঠাণ্ডা বাতাস পাচ্ছে ও। বাতাসটায় সাগরের গন্ধ নেই, আসছে একটা এয়ার-কন্ডিশনিং প্লান্ট থেকে। কবির চৌধুরী নিশ্চয়ই একটা শাফট নিজের কাজের জন্য বেছে নিয়েছে। তার “রোগী”-কে টেস্ট করার জন্য কী ধরনের ফাঁদ বা নিষ্ঠুরতার আয়োজন করে রেখেছে সে? সন্দেহ নেই, প্রচণ্ড ব্যথা দেওয়ার মত কিছু একটা হবে সেটা, শিকারের প্রতিরোধ

রানা-৩৫৫

শক্তি যাতে কমিয়ে আনা যায়। কে জানে এই দৌড়ের শেষ মাথায় কী অপেক্ষা করছে! তবে শিকার কি শেষ মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে?

দেখা যাক।

সামনে সামান্য আলোর আভাস। সাবধানে এগোচ্ছে রানা। আভাটা উজ্জ্বল হচ্ছে। ওখানটা শাফটের শেষ মাথা? একটা সাইড শাফট থেকে বেরিয়ে আসা আলো? আরও খানিক এগিয়ে চিৎ হলো রানা, সরাসরি উপর দিকে তাকাল। প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা খাড়া নতুন একটা শাফটের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। বাঁকটা চৌকো, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঘুরে পজিশন বদলে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। তা হলে এই খাড়া ধাতব টিউব বেয়ে উপরে উঠতে হবে ওকে, অথচ টিউবের কোথাও কোন খাঁজ-ভাঁজ নেই যে পা বাধান যাবে! এ কি সম্ভব?

বাইসেপ দুটো চওড়া করল রানা। হ্যাঁ, টিউবের দু'পাশের দেয়ালে আটকায়। পা দুটোও মসৃণ সারফেসে সাময়িক বাধে, যদিও জয়েন্টের জায়গা ছাড়া একটু পরই পিছলে যাবে ওগুলো। কাঁধ বাঁকিয়ে পা ছুঁড়ল রানা, জুতো জোড়া ছিটকে পড়ল। চেষ্টা করে দেখার কোন বিকল্প নেই।

প্রতিবার ছয় ইঞ্চি করে শাফট বেয়ে উঠে যাচ্ছে রানার শরীর-টিউবের দু'ধারে কাঁধ ও ট্রাইসেপ আটকে, পা তুলছে উপরে, হাঁটু দিয়ে ঠেকাচ্ছে পতন, তারপর পা দুটো পিছলাতে গুরু করলে শাফটের গায়ে ঘষে কাঁধ দুটোকে কয়েক ইঞ্চি উপরে তুলছে; বারবার, আবার, ফের। শাফট যেখানে জোড়া লেগেছে, সেই ফুলে থাকা জায়গায় একটু থামো, একটু দম নাও, মাপ নাও পরবর্তী দূরত্বের।

কিংবা তাকিয়ো না উপরে, শুধু ধাতব ইঞ্চিগুলোর কথা চিন্তা করো, যেগুলো এক এক করে জয় করতে হবে। আলোর ক্ষীণ আভাটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না। ওটা উজ্জ্বল হচ্ছে না, না হোক;

শয়তানের দ্বীপ

১৮৯

কাজে আসবে না, না আসুক। কীম বা পা নিছলে যাবে, মনে
নতুন শাকটীর লীচ, এ-সব চিন্তা করার সময় নেই। অত্যাশ
কাজে কবে কত পেরো না। মনে হচ্ছে বেশি বিক্ষোভিত হয়ে
চাচ্ছে। কখনো মন থেকে কেড়ে ফেলো। কীম আর পাভের
চামড়া হতে যাচ্ছে, খোঁচে দাও। তুমি শুধু উঠবে, এক ইঞ্চি এক
ইঞ্চি করে। এটাই তোমার একমাত্র কাজ। ওঠাটাই আসল।
জানতই বিজয়।

কিছু না খাচ্ছে ভুল করার নিছলে যাচ্ছে। কীম দুটো
ব্রেক-এর কুমিল পালনে বার্থ হওয়ার দু'বার নিছলে এক পজের
মত মেয়ে এল রানা। অগত্যা বাধ্য হয়ে খামতে হলো তাকে,
দীর্ঘের মিকে প্রবাহিত বাতাসে খাম শুকাবার জন্য সময় দিয়ে।

মশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, পালিশ করা জিঞ্জের পায়ে
আবছাড়াতে দুটো ওঠা নিজের প্রতিফলন দেখছে। দাঁতের ফাঁকে
ছুরিটা থাকায় ভর খুঁচ দু'জায়ে বিভক্ত হয়ে আছে। এখনও উপর
মিকে তাকিয়ে দেখতে রাজি নয় রানা আর কতটুকু পথ বাকি।
দুরত্বটুকু সহ্য করার বা মেনে নেওয়ার চেয়ে বেশিও হতে
পারে। সাবধানে ট্রাউজারের পায়ের সঙ্গে পা দুটো মুছে নিয়ে
আবার শুরু করল ও।

মনের একটা অংশ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাচ্ছে,
আরেকটা অংশ স্বপ্ন দেখছে। বাতাসের তীব্রতা বাড়ছে, আলোর
উজ্জ্বলতাও আগের চেয়ে বেশি, তবে এ-সব খেয়াল করছে না।
নিজেকে একটা আহত ঠাণ্ডাপোকা মনে করছে ও, নোংরা পাইপ
বেয়ে একটা বাথরুমে পৌছানোর চেষ্টা করছে। পাইপ থেকে
বেরিয়ে কী দেখবে ও? নগ্ন একটা নারী তোয়ালে দিয়ে পা
মুছেছে? কিংবা কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে দাড়ি কামাচ্ছে একজন
লোক? জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে খালি একটা বাথরুমে?

মাথাটা কিছুটা সজে বাড়ি খেল। আঁটো ভাবটা খুইয়ে বসায়
পিছলে গজ্ঞানেক নেমে এল রানা। তারপর উপলব্ধি করল

হালাতুরি। শেষ বাতাস পৌঁছে গেছে বা নতুনসে উজ্জ্বল আলো
তার জোড়াল বাতাসে খেয়াল করল। আবার উঠল ও, বতাসের বা
বাতাসী ঠেকল কিছুতে। বাতাস মাগছে তার বাকি কানে। দীর্ঘ
দীর্ঘে মাথাটা খোঁচাল ও। এটা আরেকটা নতুন শাকটী। বর
তখনই ঢাকা একটা পোর্টহোল থেকে আলো ঢুকছে পাখটীর
ভিতর। দীর্ঘে দীর্ঘে নিজেকে মোহাতে হার, তারপর নতুন
শাকটীর কিনারা ধরে উঠু করবে পরীক্ষাকে, নিজেকে তুলিয়ে
নেবে ভিতরে। তারপর অবশেষে লম্বা হয়ে উঠে শাখা যাবে।

মহল মনে হলোও, কাজটা করতে খেমে খেমে উঠল রানা,
মহল লাগল মশ মিনিট। এক প্রাক্তি বোধ করল, কিছুক্ষণ চোখ
বুজে পড়ে থাকল ও।

তারপর হঠাৎ এক সময় চোখ মেলে জাবল-জাবল ছিল না,
নাকি খুম ভাঙল? ঠাণ্ডা লাগছে ওর। কোন ঘরানা নেই পাছাতের
টিক কোথাও রয়েছে ও। আসে না কীটা বাজে এখন। সে উঠল
ধরে উঠে এসেছে এখানে সেটার মিকে একবার তাকাল।
তারপর মাথা তুলে পোর্টহোল দিয়ে দাঁড়িয়েটা দেখার চেষ্টা
করল। কীচটা মোটা। আলো কেমন হলমেটে লাগছে। ও লম্বা
কামরার পোর্টহোলটার কথা স্মরণ করল ও। সেটাকে ভাঙার
কোন উপায় ছিল না। এটারও মোদহয় নেই।

অকস্মাৎ কীচের ভিতরে নড়াচড়া দেখতে পেল রানা।
ইলেকট্রিক বালবের নিছনে পরিষ্কার হয়ে উঠল একজোড়া চোখ,
ওর মিকে তাকিয়ে রয়েছে। এক মুহূর্ত পর সরে পেল ওগুলো।
গভীর হলো রানা। তার মানে লক্ষ রাখা হচ্ছে কতটুকু কী করতে
পারছে ও, রিপোর্ট করা হবে কবির চৌধুরীকে।

আবার উপড় হলো রানা। মাথা তুলে সামনে তাকাল।
টানেলটা আপসা হয়ে কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এই, এটা
ইতস্তত করার সময় নয়। ছুরিটা তুলে আবার দাঁতে আটকাল ও,
তারপর দীর্ঘে দীর্ঘে এগোল।

একটু পরই ফুরিয়ে গেল আলো। মাঝে মধ্যে খেমে লাইটারটা জ্বলল রানা, তবে সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। শাফটের ভিতর গরম হয়ে উঠছে বাতাস। আরও প্রায় পঞ্চাশ গজ এগোবার পর রীতিমত উত্তপ্ত লাগল।

বাতাসে উত্তাপের একটা গন্ধ পাচ্ছে রানা, কোথাও যেন ধাতব কিছু পুড়ছে। ঘামতে শুরু করল ও। দেখতে দেখতে সারা শরীর ভিজে গেল, চোখ মোছার জন্য কয়েক মিনিট পর পর থামতে হচ্ছে।

সামনে পড়ল ডান-হাতি একটা বাঁক। ঘোরার সময় বড়সড় টিউবের মেঝে ওর চামড়া যেন পুড়িয়ে দিতে চাইল। উত্তাপের গন্ধটা এখন প্রকট। সামনে আরেকটা ডান-হাতি বাঁক। মাথাটা বাঁকে ঘোরাবার পরই লাইটার জ্বলল রানা, তারপর ত্রল করে পিছিয়ে এসে নেতিয়ে পড়ল, ক্লান্ত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে।

মনটা তিক্ততায় ভরে উঠেছে, মাথা তুলে নতুন বিপদটা পরীক্ষা করছে রানা। লাইটারের কাঁপা কাঁপা আলোয় রঙচটা জিহ্ব বা দস্তা দেখা যাচ্ছে। কবির চৌধুরীর পরবর্তী এক্সপেরিমেন্টটা হলো উত্তাপ!

রানার গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। এই প্রচণ্ড উত্তাপ শরীরের চামড়া কীভাবে সহ্য করবে? কীভাবে রক্ষা করবে নিজেকে?

ফিরে যেতে পারে ও। কিন্তু সেলে ফিরে লাভ কী? এখানে পড়ে থাকতে পারে। তাতেই বা কী লাভ? আরেকটা উপায় হলো-সামনে এগোনো। অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায় নেই-না আছে আরেকটা শাফট, না অন্য কোন অজুহাত। তবে একটা সান্ত্বনা অবশ্যই আছে। কী সেটা?

এই উত্তাপ ওকে খুন করবে না, স্রেফ আহত করবে। এটা ফাইনাল কিলিং গ্রাউন্ড নয়। এ স্রেফ আরেকটা পরীক্ষা-কতটুকু সহিতে পার তুমি।

মেয়েটির কথা ভাবল রানা। না জানি কী ঘটছে তার কপালে! নাহ্, দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।

ছুরি দিয়ে শাফটের সামনের অংশ ফালি ফালি করে কেটে ফেলল রানা। জিহ্ব সারফেসের সঙ্গে শরীরের যে অংশ বেশি ঘষা খাবে সেগুলো কাপড় দিয়ে মুড়ে ফেলা দরকার-হাত আর পা। হাঁটু আর কনুই এক প্রস্থ সুতি কাপড়ে ঢাকা আছে, তাতেই চালিয়ে নিতে হবে।

তৈরি হলো রানা। বাঁকটা ঘুরে ঢুকে পড়ল উত্তপ্ত নতুন শাফটে।

নিরাবরণ পেট সারফেসে যেন না ঠেকে! কাঁধের সাহায্যে সামনে বাড়ো! হাত, হাঁটু, পায়ের আঙুল; হাত, হাঁটু, পায়ের আঙুল। দ্রুত, দ্রুত! দ্রুত এগোতে পারলে হয়তো উত্তাপকে ফাঁকি দেওয়া যাবে...

হাঁটু দুটো সবচেয়ে বেশি ভুগছে, কারণ শরীরের ভার বেশির ভাগ ওগুলোই বহন করছে। এবার হাতে জড়ানো প্যাড পুড়তে শুরু করেছে। আগুনের একটা ফুলকিও দেখা গেল। একটু পর আরেকটা। আরেকটু পর ঝাঁক ঝাঁক লাল পোকাকার মত ছোটোছুটি করতে দেখা গেল ওগুলোকে। চোখে ধোঁয়া লেগে জ্বালা করছে। আল্লাহ্, আর তো পারা যায় না! বাতাস নেই। ফুসফুস ফেটে যাবে। হাতে জড়ানো কাপড় থেকে হাজার হাজার আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। নিশ্চয়ই পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে প্যাড। এরপর পুড়বে ওর মাংস।

আরেকটু সামনে বাড়ল রানা, দুই কাঁধের ক্ষতে মেটাল সারফেস ঠেকল। আর্ত চিৎকার বেরুল গলা থেকে।

একটু পরপরই চোঁচাচ্ছে রানা; হাত, হাঁটু বা পায়ের আঙুল সারফেসে ঠেকা মাত্রই। এখানেই ওর সব শেষ হতে যাচ্ছে। নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে পড়ে থাকবে। সময় নিয়ে, ভাজা ভাজা হয়ে মরবে। না!

আতঙ্কে চৈঁচিয়ে উঠল রানা। মাংস, হাড় না পোড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে ওকে!

হাঁটুর চামড়া বলে নিশ্চয়ই কিছু নেই। একটু পরেই হাতের তালু জিঙ্ক সারফেস স্পর্শ করবে। শুধু হাত বেয়ে নামা ঘাম প্যাডগুলোকে স্নাতসেঁতে করে রাখতে পারছে। চৈঁচাও! তাতে ব্যথা ভুলে থাকা যায়। চিৎকার বলে দেয় তুমি বেঁচে আছ। এগোও! এগোও! নিশ্চয়ই আর বেশিক্ষণ নেই। এখানে তোমার মৃত্যুর আয়োজন করা হয়নি। এখনও তুমি বেঁচে আছ। হাল ছেড়ো না।

সামনে বাড়ানো ডান হাতে কী যেন ঠেকল, জায়গা ছেড়ে সরে গেল সেটা। হিম শীতল বাতাসের ঝাপটা লাগল মুখে। বাম হাত আর মাথাতেও ঠেকল জিনিসটা, তারপর সরে গেল। একটু শব্দ হলো। অ্যাসবেসটস ব্যাফল্ প্রেটের নীচের প্রান্ত ঘষা খেয়েছে পিঠে। শব্দ, বাতাস, পানি বা আলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এ-ধরনের প্রেট বা মেকানিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

সামনে এগোচ্ছে রানা। ব্যাফল্ ডিভাইস বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ও। এরপর হাত দুটোয় ঠেকল নিরেট দেয়াল।

ডান আর বাম দিক হাতড়াচ্ছে রানা। এই বাঁকটা ঘুরেছে ডান দিকে। কোণটা পেরিয়ে এল ওর শরীর। হিম বাতাস ছুরির মত লাগল ফুসফুসে। ভয়ে ভয়ে মেটাল সারফেসে আঙুল ছোঁয়াল ও। মেঝেটা ঠাণ্ডা! গুঁড়িয়ে উঠে ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর শরীরের ব্যথা সজাগ করে তুলল ওকে। উপুড় হলো ও। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল ওর উপরে আলোকিত একটা পোর্টহোল-মোটাকাঁচ দিয়ে মোড়া। সেখানে একজোড়া চোখ। দেখছে ওকে।

তারপর আবার কালো ঢেউ এসে গ্রাস করল রানাকে।

ঠাণ্ডা অন্ধকারে শরীরের ফোসকা আর ভেজা ক্ষতগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসায় টান ধরছে। শরীর আর হেঁড়া কাপড়ের ঘামও শুকিয়ে যাচ্ছে। গরম হয়ে থাকা ফুসফুসে অকস্মাৎ হিম বাতাস ঢোকায় বুকে ব্যথা অনুভব করছে রানা। তবে স্বতঃপিত্ত তার কাজ ঠিকমতই করে যাচ্ছে।

যেন কয়েক বছর পর জাগল রানা। একটু একটু নড়ছে। এই নড়াটাই বিপদ ডেকে আনল।

চোখ খুলে তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো আরেক জোড়া চোখের সঙ্গে, মোটাকাঁচের পিছনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ওগুলো।

সামান্য একটু নড়তেই টান ধরা ক্ষত আর ফুসফুসের ব্যথা কাঁপ ধরিয়ে দিল শরীরে। অপেক্ষা করছে কাঁপুনিটা কখন বন্ধ হয়। দেখা গেল নড়লেই রিয়াক্ট করছে শরীর। আর একবার শুরু হলে কাঁপুনিটা সহজে থামানো যাচ্ছে না।

তারপরও শরীরের সহ্যশক্তি পরীক্ষার জন্য বারবার নড়ল রানা। এক সময় সান্দ্রীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকাবার জন্য চিৎ হলো ও। একবারে এত বেশি নড়াচড়া করায় গোটা শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অপেক্ষা করছে রানা, দেখতে চায় কাঁপুনিটা কমে কতক্ষণ সময় লাগে, ধকল সহ্য করার কতটা শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে।

রানার ঠোট দাঁতের কাছ থেকে পিছিয়ে এল, অন্ধকারে খঁকানোর মত আওয়াজ বেরল গলা থেকে। পশুরা এরকম আওয়াজ করে।

এখন ব্যথা পেলো বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হলে মানুষসুলভ প্রতিক্রিয়া আর বোধহয় হবেই না ওর। কবির চৌধুরী ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। তবে পশুসুলভ বেপরোয়া ভাব রিজার্ভ হিসাবে রয়ে গেছে এখনও। আর শক্তিশালী একটা পশুর মধ্যে এই রিজার্ভ অত্যন্ত গভীর।

শয়তানের দ্বীপ

১৯৫

আতঙ্কে চোঁচিয়ে উঠল রানা। মাংস, হাড় না পোড়া পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে ওকে।

হাঁটুর চামড়া বলে নিশ্চয়ই কিছু নেই। একটু পরেই হাতের তালু জিহ্বা সারফেস স্পর্শ করবে। শুধু হাত বেয়ে নামা ঘাম প্যাডগুলোকে স্নাতকসেতে করে রাখতে পারছে। চোঁচাও! ভাতে ব্যথা ভুলে থাকা যায়। চিৎকার বলে দেয় তুমি বেঁচে আছ। এগোও! এগোও! নিশ্চয়ই আর বেশিক্ষণ নেই। এখানে তোমার মৃত্যুর আয়োজন করা হয়নি। এখনও তুমি বেঁচে আছ। হাল ছেড়ো না।

সামনে বাড়ানো ডান হাতে কী যেন ঠেকল, জায়গা ছেড়ে সরে গেল সেটা। হিম শীতল বাতাসের ঝাপটা লাগল মুখে। বাম হাত আর মাথাতেও ঠেকল জিনিসটা, তারপর সরে গেল। একটু শব্দ হলো। অ্যাসবেসটস ব্যাফল প্লেটের নীচের প্রান্ত ঘষা খেয়েছে পিঠে। শব্দ, বাতাস, পানি বা আলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে এ-ধরনের প্লেট বা মেকানিক্যাল ডিভাইস ব্যবহার করা হয়।

সামনে এগোচ্ছে রানা। ব্যাফল ডিভাইস বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেল ও। এরপর হাত দুটোয় ঠেকল নিরেট দেয়াল।

ডান আর বাম দিক হাতড়াচ্ছে রানা। এই বাকটা ঘুরেছে ডান দিকে। কোণটা পেরিয়ে এল ওর শরীর। হিম বাতাস ছুরির মত লাগল ফুসফুসে। ভয়ে ভয়ে মেটাল সারফেসে আঙুল ছোঁয়াল ও। মেঝেটা ঠাণ্ডা! গুঁড়িয়ে উঠে ওখানেই মুখ খুবড়ে পড়ল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর শরীরের ব্যথা সজাগ করে তুলল ওকে। উপুড় হলো ও। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল ওর উপরে আলোকিত একটা পোর্টহোল-মোটাকাঁচ দিয়ে মোড়া। সেখানে একজোড়া চোখ। দেখছে ওকে।

তারপর আবার কালো ঢেউ এসে গ্রাস করল রানাকে।

ঠাণ্ডা অন্ধকারে শরীরের ফোসকা আর ভেজা ক্ষতগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসায় টান ধরছে। শরীর আর হেঁড়া কাপড়ের ঘামও শুকিয়ে যাচ্ছে। গরম হয়ে থাকা ফুসফুসে অকস্মাৎ হিম বাতাস ঢোকায় বুকে ব্যথা অনুভব করছে রানা। তবে অতীত তার কাজ ঠিকমতই করে যাচ্ছে।

যেন কয়েক বছর পর জাগল রানা। একটু একটু নড়ছে। এই নড়াটাই বিপদ ডেকে আনল।

চোখ খুলে তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো আরেক জোড়া চোখের সঙ্গে, মোটাকাঁচের পিছনে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ওগুলো।

সামান্য একটু নড়তেই টান ধরা ক্ষত আর ফুসফুসের ব্যথা কাঁপ ধরিয়ে দিল শরীরে। অপেক্ষা করছে কাঁপুনিটা কখন বন্ধ হয়। দেখা গেল নড়লেই রিয়াক্ট করছে শরীর। আর একবার গুরু হলে কাঁপুনিটা সহজে থামানো যাচ্ছে না।

তারপরও শরীরের সহ্যশক্তি পরীক্ষার জন্য বারবার নড়ল রানা। এক সময় সাক্ষীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকাবার জন্য চিৎ হলো ও। একবারে এত বেশি নড়াচড়া করার গোটা শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অপেক্ষা করছে রানা, দেখতে চায় কাঁপুনিটা কমতে কতক্ষণ সময় লাগে, ধকল সহ্য করার কতটা শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে।

রানার ঠোঁট দাঁতের কাছ থেকে পিছিয়ে এল, অন্ধকারে খেকানোর মত আওয়াজ বেরুল গলা থেকে। পশুরা এরকম আওয়াজ করে।

এখন ব্যথা পেলো বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হলে মানুষসুলভ প্রতিক্রিয়া আর বোধহয় হবেই না ওর। কবির চৌধুরী ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। তবে পশুসুলভ বেপরোয়া ভাব রিজার্ভ হিসাবে রয়ে গেছে এখনও। আর শক্তিশালী একটা পশুর মধ্যে এই রিজার্ভ অত্যন্ত গভীর।

শয়তানের দ্বীপ

ধীরে ধীরে ক্রল করে কয়েক গজ এগোল রানা, চোখ দুটোর পথ থেকে সরিয়ে আনল নিজেকে, তারপর লাইটারটা জ্বালল। সামনে শুধু কালো চাঁদ, হাঁ করে থাকা গোল মুখ, নিয়ে যাবে মৃত্যুর পেটে।

লাইটার নেভাল রানা। বড় করে শ্বাস নিয়ে মেঝেতে কনুই আর হাঁটু রাখল। ব্যথাটা আগের চেয়ে বেশি নয়, তবে অন্য রকম। ধীরে ধীরে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, ক্রল করে এগোচ্ছে।

কনুই আর হাঁটুর সুতি কাপড় পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। হিম ধাতব মেঝেতে ঘষা খেয়ে ফোসকাগুলো ফেটে যাওয়ায় ভেজা ভেজা লাগছে। এগোবার সময় ব্যথা পরীক্ষার জন্য হাত আর পায়ের আঙুল নাড়ছে ও।

ধীরে ধীরে একটা হিসাব পাওয়া গেল কী করতে পারবে, কী করলে ব্যথা খুব বেশি লাগে। ব্যথা মেনে না নেওয়ার মত কিছু নয়, নিজেকে বোঝাল রানা। ও যদি বিধ্বস্ত একটা প্লেন থেকে বেরিয়ে আসত, দেখা যেত এখানে-সেখানে পুড়ে গেছে আর চামড়া ছড়ে গেছে। কদিন পরই ছাড়া পেয়ে যেত হাসপাতাল থেকে। তেমন কিছুই হয়নি ওর। এখনও সারভাইভ করছে। ব্যথা পাচ্ছে, তবে সেটা কিছু নয়। এরচেয়ে মারাত্মক কোন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি, সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকো।

তবে এ-সব চিন্তার পিছনে হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে একটা বাস্তব সত্য-আসল পরীক্ষা বা বিপদটা সামনে। জানে, নিজের দক্ষতা আর প্রতিরোধ শক্তি কমে গেছে, কাজেই ভয় লাগা স্বাভাবিক-জানে না কীভাবে সেটাকে জয় করবে।

কখন আসবে সেই বিপদ? কেমন হবে তার চেহারা? কিলি গ্রাউন্ডে পৌছানোর আগে আর কতটা নরম করা হবে ওকে?

সামনের গাড়ি অন্ধকারে আলোর খুদে বিন্দুগুলো দৃষ্টিভ্রম হতে পারে। থামল রানা। চোখ কোঁচকাল। মাথা ঝাঁকাল। না, বিন্দুগুলো এখনও আছে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ও। ওগুলো

রানা-৩৫০

এখন নড়ছে।

আবার থামল রানা। কান পেতে শুনছে। ঠাণ্ডাপিঞ্জের শান্ত ধকধকানিকে ছাপিয়ে উঠল নরম খসখসে আওয়াজ। বিন্দুগুলো সংখ্যায় বেড়েছে। এখন বিশ কি ত্রিশটা হবে, সামনে পিছনে নড়াচড়া করছে, কোনটা দ্রুত, কোনটা ধীরে-সবই সামনের বৃত্তাকার কালো অন্ধকারে। লাইটারটা বের করতে যাচ্ছে রানা। ছোট্ট হলদেটে শিখা জ্বালার সময় দম বন্ধ করে রাখল ও। লাল বিন্দুগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। তার বদলে, ওর এক গজ সামনে, অত্যন্ত সরু তারের জাল দেখা যাচ্ছে-প্রায় মিহি মসলিনের মত, শাফটটা বন্ধ করে রেখেছে।

সাবধানে, একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা, জ্বলন্ত লাইটার সামনে ধরে আছে। জিনিসটাকে এক ধরনের ঝাঁচা মনে হলো, ভিতরে ছোট আকৃতির জ্যান্ত কী যেন আছে। শুনতে পেল খসখস আওয়াজ করে পিছিয়ে যাচ্ছে ওগুলো আলোর কাছ থেকে।

জালটা থেকে এক ফুট দূরে থাকতে লাইটার নিভিয়ে দিল রানা। চোখে অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষায় আছে। শুনতে পেল মৃদু খসখসে শব্দ ফিরে আসছে-ওর দিকে, তারপর ধীরে ধীরে আবার জড়ো হলো লাল এক ঝাঁক বিন্দু, জালের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কী ওগুলো? রানা টের পেল হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে। সাপ নাকি? কঁকড়া বিছে? ঠাণ্ডাপোকা?

সাবধানে চোখ দুটোকে জুলজুলে ছোট জালটার কাছে নিয়ে গেল রানা। ধীরে ধীরে মুখের পাশে সরিয়ে আনল লাইটারটাকে, তারপর হঠাৎ চাপ দিল লিভারে।

পলকের জন্য অনেকগুলো খুদে নখর দেখতে পেল রানা, জালে আটকে আছে। মোটা পশমে ঢাকা বিশ-পঁচিশটা পা আর পোঁটলার মত পেট দেখতে পেল, উপরে বড়সড় পোকায় মত

শয়তানের দ্বীপ

মাথা, পুরোটাই খেঁচ মখল করে রেখেছে লাল দুই চোখ। কটপট জাল থেকে নেমে পাশাপাশে শুকলো, তিলের মেখেতে বনখর আওয়াজ হচ্ছে, খাঁচার এক কোণে গিয়ে শশমের একটা কুপ হয়ে থাকল।

জালের ভিতর দিয়ে সামনে ডাকাল রানা, ভাল করে দেখার জন্য শিখাটা এদিক থেকে ওদিকে সরাজে। তারপর দুয়েল খাঁচানোর জন্য নিভিয়ে দিল লাইটার। আটকে রাখা দম জড়ল মুদু শব্দ করে।

শুকলো মাকড়সা, দৈত্যাকার টারানটিউলা, একেকটা ভিন্ন কি চার ইঞ্চি লম্বা। গুণেছে রানা, বিশটা।

সামনে এগোতে হলো শুকলোকে পাশ কাটাতে হবে।

ওয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা, চিন্তা করছে: লাল চোখগুলো আবার জড়ো হলো ওর মুখের সামনে।

এগুলো কতটা বিপজ্জনক? টারানটিউলা সম্পর্কে যে-সব কথা শোনা যায় তার কতটুকু মিথ? পশুপাখিকে অবশ্যই মেরে ফেলে, কিন্তু মানুষের জন্যও কি এরকম বড় আকারের মাকড়সা মারাত্মক? শিউরে উঠল রানা। কাকড়া বিছের কথাটা মনে পড়ে গেল ওর। টারানটিউলার ছোঁয়া আরও অনেক নরম হবে। সুড়সুড়ি লাগবে চামড়ায়। যতক্ষণ না কামড় দেয়।

তবে, আবারও প্রশ্ন ওঠে, এটা কি পাগল বিজ্ঞানীর কিলি গ্রাউন্ড হতে পারে? বড়জোর হয়তো দু'একটা কামড়-অন্যরকম একটা ব্যথার স্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অন্ধকারে জাল ছিঁড়ে এগোতে চেষ্টা করলে ভয় করবে ওর, কবির চৌধুরী হয়তো উপভোগ করতে চেয়েছে সেটা-তার তো জানা ছিল না ওর কাছে লাইটার থাকবে। এক বাক লাল চোখকে অগ্রাহ্য করা বা নরম শরীরগুলোকে ঝেঁতলে তুল করা সহজ নয় কারও জন্যই। তার উপর আছে কামড়। কিন্তু কাপড়চোপড়ের ভিতর পৌঁছিয়ে যাবে, তারপর সেখান থেকে কামড়াবে। সবশেষে কপালে জুটবে

রানা-৩৫৫

নিষের জ্বালা। বিকৃত মস্তিষ্ক চৌধুরী এভাবেই চিন্তা করলে-আতঙ্কে আর মস্তিষ্ক টেঁচাতে টেঁচাতে সামনে এগোলে রানা। সামনে কোথায়? কীসের মধ্যে? সবশেষে সিলমে? কী সেটা?

জলে রানার কাছে লাইটার, ছুরি আর সব্বম আছে। এখন ওর মরকার শুধু নার্স।

লাইটারের চোয়াল সাবধানে সামান্য একটা খুলল রানা, তারপর দু'আঙুলে ধরে মলকেটা টেনে আশ-ইঞ্জিনাসের লম্বা করল, শিখাটা যাতে বড় হয়। এরপর লাইটার জ্বালল ও।

মাকড়সাগুলো পিছু হটতে দেখে ছুরির ডগা দিয়ে পাতির জালটা ছিঁড়ে ফেলল রানা। ফ্রেমের কাছাকাছি একটা গর্ত তৈরি করল প্রথমে, তারপর কিনারা ধরে কেটে ফেলল চারদিকের জাল। কাটা জাল ফ্রেম থেকে ছাড়িয়ে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল ও। ছুরিটা আবার ফিরে গেল দু'সারি দাঁতের মাঝখানে। তুল করে এগোচ্ছে ও। লাইটারের আতঙ্ক এগোচ্ছে দেখে এককোণে জড়ো হলো মাকড়সাগুলো, তারপর একটার উপর চড়তে শুরু করল আরেকটা।

তার দিয়ে তৈরি বহুমুখী ট্রাউজারের ভিতর থেকে বের করল রানা, তারপর ভোতা ডগাটা দিয়ে মাকড়সাগুলোর মাঝখানে শুঁতো মারল। একবার নয়, বারবার আঘাত করে শুকলোকে ভর্তা বানিয়ে ফেলল। দু'একটা মাকড়সা পালাবার চেষ্টায় ওর দিকে ছুটে আসতে চাইছে, সেগুলোর দিকে লাইটারের শিখা বাড়িয়ে দিল ও, একটা একটা করে পুড়িয়ে মারছে। এরপর দেখা গেল জ্যান্তগুলো হামলা করেছে মরা আর আধমরাগুলোর উপর।

ধীরে ধীরে সব নড়াচড়া মস্তুর, তারপর একেবারে থেমে গেল। শুকলো কি সব মারা গেছে? নাকি ভয় পেয়ে মরার ভান করছে? ছোট হয়ে আসছে লাইটারের শিখাটা। তারপর একেবারে নিভে যেতে শুরু করল। কুঁকিটা না নিয়ে উপায় নেই

শয়তানের দ্বীপ

১৯৯

কোন। সামনে হাত বাড়িয়ে মরা স্তূপটাকে একপাশে ঠেলে দিল রানা। এরপর দাঁতের মাঝখান থেকে ছুরিটা নামাল, লম্বা করা হাতে ধরে জালের দ্বিতীয় পরদাটা কাটছে। কাটা শেষ হতে পরদাটা ভাঁজ করে নামিয়ে আনল খেঁতলানো শরীরগুলোর স্তূপে। কাঁপতে কাঁপতে লাল আভায় পরিণত হলো শিখা। শরীরটা শক্ত করল রানা, জালে ঢাকা মাকড়সার স্তূপের উপর দিয়ে ত্রল করে পার হলো এবড়োখেবড়ো ফ্রেমটা।

রানার কোন ধারণা নেই কী ধরনের ধাতব ছুঁয়েছে, কিংবা কোন মাকড়সার গায়ে হাঁটু বা পা ফেলেছে কিনা। শুধু জানে বিপদটাকে পিছনে ফেলে এসেছে। বেশ কয়েক গজ না এগিয়ে থামল না ও। থেমে দম নিচ্ছে, শক্ত করে নিচ্ছে নার্ভগুলোকে।

ওর উপরে স্থান আলো জ্বলল। মাথাটা একটু কাত করে সেদিকে তাকাল ও, জানে কী দেখতে পাবে। মোটা কাঁচের পিছন থেকে অনুসন্ধানী একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বালবের পিছনে মাথাটা এদিক ওদিক নড়ছে। চোখের পাতা বিদ্রূপাত্মক করুণা প্রকাশের চঙে নিচু হলো। বন্ধ একটা মুঠো দেখা গেল—বিদায় দেওয়া বা পরিত্যাগ করার ভঙ্গিতে শুধু বুড়ো আঙুলটা নীচের দিকে তাক করা—টুকে পড়ল বালব আর মোটা কাঁচের মাঝখানে। তারপর ফিরিয়ে নেওয়া হলো মুঠোটা। নিভে গেল আলো। শাফটের ঝেঁঝের দিকে মুখ ফেরাল রানা, ঠাণ্ডা মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ভঙ্গিটা বলে দিল এবার ওর শেষ পরীক্ষাটা নেওয়া হবে, ওর সঙ্গে পর্যবেক্ষকদের সমস্ত কাজ ফুরিয়েছে, বাকি শুধু তারা এসে ওর অবশিষ্ট নিয়ে যাবে, অবশিষ্ট বলে আদৌ যদি কিছু থাকে। এখন পর্যন্ত টিকে আছে ও, সেজন্য সামান্যতম প্রশংসাও করা হয়নি। সন্দেহ নেই এই রোহিঙ্গারা ঘৃণা করে ওকে। সেজন্য কবির চৌধুরী দায়ী। তার কাছ থেকেই এই ঘৃণা সংক্রমিত হয়েছে তাদের মধ্যে। তারা শুধু ওর মৃত্যু চায়, যতটা

খারাপভাবে সম্ভব।

রানার দু'সারি দাঁত মৃদু ঘষা খেল। মেয়েটির কথা ভাবল ও। চিন্তাটা শক্তি এনে দিল ওকে। এখনও মরে যায়নি ও। আরে ধ্যাত, এত সহজ নাকি! ওকে মারতে হলে বুক থেকে হুপিগুটা টেনে ছিড়ে আনতে হবে না!

পেশিগুলো শক্ত করল রানা। এবার এগোতে হয়। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অস্ত্রগুলো আগের জায়গায় রাখল, তারপর ব্যথা সহ্য করে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল অন্ধকারের দিকে।

শাফটটা নীচের দিকে সামান্য ঢালু হয়ে নামছে। সহজে এগোতে পারছে রানা। খানিক পর আরও খাড়া হলো শাফটের মেঝে, ফলে শরীরের ভারে একটু একটু পিছলে যাচ্ছে ও। সামনে ধূসর আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। আলোর আভা মানে অন্ধকার ওদিকটায় কম গাঢ়। তবে একটা পরিবর্তন বটে। বাতাসের ধরনও অন্য রকম লাগল। নতুন, তাজা একটা ভাব লেগে আছে। কী ব্যাপার? সামনে সাগর নাকি?

হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা শাফটের নীচে খসে পড়ছে ও। নিজেকে থামাবার জন্য দুই বাহু চওড়া করল দ্রুত, ছড়িয়ে দিল পা দুটো। ব্যথা পেল, কিন্তু এ-ধরনের ব্রেকে তেমন কাজ হচ্ছে না। শাফটটা এবার চওড়া হয়ে যাচ্ছে। ধরার মত কিছু পাচ্ছে না ও। পা বাধাবারও নেই কিছু। পতনের গতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। একটু সামনেই একটা বাঁক। আর বাঁকটা নীচের দিকে।

বাঁকের গায়ে আছড়ে পড়ল শরীরটা। ঘুরল। গড! মাথা নীচে দিয়ে খসে পড়ছে ও। মরিয়া হয়ে হাত আর পা দুটো যতদূর পারা যায় মেলে দিল। ধাতব সারফেস ওর চামড়া তুলে নিচ্ছে। নিজের উপর এতটুকু নিয়ন্ত্রণ নেই ওর, যেন একটা কামানের নল বেয়ে ছুটে বেরুচ্ছে।

অনেক নীচে বৃত্তাকার ধূসর আলো দেখতে পাচ্ছে রানা। ও

শয়তানের দ্বীপ

কি খোলা বাতাসে বেরুচ্ছে? সাগরে পড়ছে? আলোটা ছুটে আসছে ওর দিকে। শ্বাস নেওয়ার জন্য ছটফট করে উঠল রানা। বেঁচে থাকো, গর্দভ কোথাকার! বেঁচে থাকো!

আগে মাথা, রানার শরীর শাফটের ভিতর থেকে কামানোর গোলার মত বেরিয়ে এল শূন্যে। সীসা রঙের সাগরে নামতে শুরু করল ও। একশো ফুট নীচে সেটা।

ষোলো

ভোরের সাগর যেন আয়না হয়ে আছে, রানার শরীর একটা বোমার মত ভেঙে দিল সেটাকে।

শাফট থেকে বেরুবার আগেই, আলোর বুত্তটাকে ক্রমশ বড় হতে দেখে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরামর্শে দাঁত থেকে ছুরিটা নামিয়ে নিয়েছে রানা, পতন সহনীয় করার জন্য হাত দুটোকে সামনে বাড়িয়ে মাথাটাকে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে দ্রুত উঠে আসা সাগরের দিকে তাকিয়ে, বুকটা ভরে নিয়েছে তাজা বাতাসে। কাজেই ডাইভ দেওয়ার ভঙ্গিতেই পানিতে পড়ল ও, সামনে বাড়ানো মুঠো করা হাত দুটো খুলি আর দুই কাঁধের জন্য গর্ত তৈরি করল।

পানির সারফেস থেকে বিশ ফুট নেমে গেল রানা। জলন হারিয়েছে দশ ফুট পেরোবার আগেই। তবে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে সংঘর্ষ ঘটলেও, পানি ওকে জখম করতে পারেনি।

ধীরে ধীরে পানির উপরে ভেসে উঠল শরীরটা। মাথা ডুবিয়ে ভেসে থাকল ওটা, ডাইভের তৈরি আলোড়নে সামান্য দোল

খাচ্ছে। পানি ঢোকায় সংকুচিত হলো ফুসফুস, কোনভাবে একটা মেসেজ পাঠাল ব্রেনে। হাত আর পা এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক ছুটছে। মাথা উঁচু হলো, খোলা মুখ থেকে পানি ঝরছে। আবার ডুবে গেল মাথা। আবার ঝাঁকি খেল পা, শরীরটাকে পানিতে খাড়া রাখার চেষ্টা করছে। এবার, বেদম কাশির সঙ্গে, ঝাঁকি খেয়ে সারফেসের উপরে উঠল মাথা, থেকে গেল ওখানেই। হাত আর পা দুর্বলভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে, যেন একটা কুকুর সাঁতরাচ্ছে। লাল আর কালো পরদার ভিতর দিয়ে লালচে চোখ দুটো লাইফলাইন দেখতে পেয়েছে, ব্রেনকে বলছে ওটার দিকে যাও।

কিলিং গ্রাউন্ড সরু আর গভীর একটা ইনলেট বা প্রবেশপথ, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায়। সাঁতরানোর সময় ট্রাউজারের পায়ায় ভরা বলমটা বাধা দিচ্ছে রানাকে। সাঁতরে যে লাইফলাইনের দিকে এগোচ্ছে ও, শক্তিশালী তারের একটা বেড়া সেটা, পাথুরে পাঁচিলগুলো থেকে বিস্তৃত হয়েছে, খোলা সাগর থেকে আলাদা করে ইনলেটটাকে একটা ঝাঁচার পরিণত করেছে। পানির সারফেস থেকে ছয় ফুট উপরে একটা কেইবল টানা হয়েছে, সেটা থেকে ঝুলছে বেড়াটা। তার দিয়ে তৈরি দুই বর্গফুটী চৌকো ঘর, ঘরগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে পানির গভীরে।

তারের কাছে পৌঁছে ঝুলে থাকল রানা, যিশুর মত ক্রুশবিদ্ধ ভঙ্গিতে। পনেরো মিনিট ওভাবেই স্থির থাকল, শরীরটা মাঝামাঝি ঝাঁকি খাচ্ছে বমি পাওয়ায়। ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে ও। মাথা ঘুরিয়ে দেখল কোথায় রয়েছে। ওর উপরে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর। স্রোত মছর, ইংরেজি হরফ ভি আকৃতির একটা ইনলেট। জায়গাটা গভীর আর স্থান ছায়ার ভিতর, পাহাড়টা ভোরের আলোকে বাধা দিয়ে রেখেছে।

অলস হয়ে রয়েছে ব্রেন। তারের বেড়াটার উদ্দেশ্য কী, কী কারণে এক চিলতে সরু আর আবছা অন্ধকার সাগরকে বন্ধ করে

রাখা হয়েছে? ঘুরেফিরে একই প্রশ্ন জাগছে মনে। কী কাজ এটার? এটার সাহায্যে কোনও জিনিস আটকে রাখা হয়, নাকি কোনও জিনিসকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়? নিজের চারপাশে, কালো গভীরতার দিকে তাকাল রানা। তারগুলো ওর পায়ের নীচে, গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। ওর কোমরের নীচে, পায়ের চারধারে ছোট ছোট মাছ দেখা যাচ্ছে। কী করছে ওগুলো? মনে হলো খাচ্ছে। ছুটে আসছে ওর দিকে, তারপর পিছু হটছে। মুখে খাবার। কী খাবার? ছেঁড়া ট্রাউজারের টুকরো? পরিষ্কার করার জন্য মাথাটা কাঁকাল রানা। তারপর আবার তাকাল। না, মাছগুলো ওর জমাট বেঁধে যাওয়া রক্ত খাচ্ছে।

শিউরে উঠল রানা। ইঁা, ওর শরীর থেকে এখনও রক্ত চোরাচ্ছে। চামড়া ছেঁড়া কাঁধ, হাঁটু আর পা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে পানিতে।

এতক্ষণে জ্বালা অনুভব করল রানা। ক্ষতগুলোয় সাগরের নোনা পানি লাগছে। ব্যথাটা ব্রেনের অলস ভাব দূর করল। ছোট মাছগুলো যদি পছন্দ করে, ব্যারাকুডা আর হাঙর কী করবে? তারের বেড়াটা কি তা হলে মানুষকে কো মাছকে সাগরে পালাতে না দেওয়ার জন্য? সেক্ষেত্রে এখনও সেগুলো ওকে ধরেনি কেন? দূর ছাই! প্রথম কাজ ত্রল করে তার টপকে ওপারে যাওয়া। এই ঘেরা অ্যাকুয়েরিয়ামের ভিতর যা-ই থাক, নিজের আর ওগুলোর মাঝখানে তারের বেড়াটা দরকার।

এই সময় রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসা হাঙরটাকে দেখতে পেল রানা-তারের বেড়ার ওপারে ওটা, টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর নিয়ে ধীরে ধীরে তারের ঘর বেয়ে উঠল রানা, মাথা টপকে ওপারে কিছুটা নামল। এখানে এখন পানি থেকে যথেষ্ট উপরে বিশ্রাম নিতে পারবে। মোটা কেইবলে হাত বাধিয়ে ঝুলে থাকল ও, রশিতে ঝুলিয়ে রোদে শুকাতে দেওয়া কাপড়ের মত, তাকিয়ে আছে মাছগুলোর দিকে। এখনও ওর পা

থেকে বরাবর যাচ্ছে ওগুলো।

হাঙর এখন একজোড়া। রানার পায়ের নীচে, পানি সারাকেস থেকে আঁখ হাত গভীরে, লুপ্ত অঙ্গ-যন্ত্রা করছে।

এখন আর খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট নেই রানার, বিজ্ঞান ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টিউব থেকে শেষ চাইত, পানির সঙ্গে সংঘর্ষ আর ভূবে অধমরা হওয়ার উপক্রম স্পষ্টের মত নিঃসৃত হওঁকে। এখন হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা ওর, ঘেঁরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পানির কোমল বহুতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারলে খুশি হয়।

ভোজসভা থেকে মাছগুলোকে অকস্মৎ নতবোঁরে পলাতে দেখে বিস্ময়ের একটা হাক্সা খেল রানা, সেই সঙ্গে মুহূর্ত হাতে আত্মসমর্পণের যপুটী তৈরি পেল। সারাকেস থেকে অনেক নীচে কী যেন একটা নড়ছে। দূরে একটা ফিল্মিসে ভাব। বেড়ার ওপার, তীরের দিক থেকে, কিছু একটা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে।

রানার শরীর টান টান হলো। ঝুলে থাকা চোয়াল ধীরে ধীরে বন্ধ হলো, দূর হয়ে পেল চোখের ফুল ফুল ভাব। বিপদের আশঙ্কা ইলেকট্রিক শক-এর মত হাক্সা দিচ্ছে, ঝাঁপের আকৃতি জাপিয়ে তুলেছে দেহ-মনে।

জ্যাম্পের শিকার আত্মলগ্ন্যে নতুনমত করছে রানা অনেক আগেই ওগুলোকে ওর ব্রেন ইকুয়ালিটরিয়ামে ফুটিয়ে তেন না ফেলে। সেটার হাতল নতুন করে মুঠোর ভিতর ধরল ও। ঝুঁকে নিচু হলো ও, ট্রাউজারের পায়ের সঙ্গে ঝুলে থাকা বল্লমটা একবার ঝুলো। মাথাটা একবার কাঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করল ও। এবার কী?

হঠাৎ খেয়াল করল রানা, হাঙরগুলোও পানিরোহে। ওর নীচে পানিতে কাঁপন শুরু হচ্ছে। অনেক গভীরে কী যেন

শয়তানের ধীপ

१. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 २. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ३. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ४. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ५. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ६. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ७. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ८. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ९. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 १०. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

বন্ধন প্রাপ্তি চক্ষু বন্ধ করাই। প্রায় পূর্ণ। বিহীন
কল্প। ২। অক্ষ। প্রায়ই প্রায়ই বন্ধ। অক্ষ। অক্ষ।

নীচের দিকে ভাঁজের আছে বলা, আরো সামান্যই, পানির
পট্টায় একতরফা কাপা কাপা চোখ দেওয়া। এ হলো
ইকতাকার কুইড, সেই আতি প্রাচীন কলনিক শ্রেণী, যে কিনা
উই দ্বারা টেনে বিশাল আকারের সব জাহাজকে পানির নীচে
নাথিয়ে নিয়ে যেত, তিসির সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ
দানব, এক টন বা তারও বেশি ওজন। শুধুতো সম্পর্কে আর কী
জানো শু?

কুইন্ডের শুভ সব মিলিয়ে বারোটা, তার মধ্যে দুটো
অস্বাভাবিক লম্বা। মাছেদের মধ্যে একমাত্র কুইন্ডের চোখই
ক্যাথেরার মত কাজ করে, অর্থাৎ মানুষের চোখের সঙ্গে মিল
আছে। যন্ত্রিক অনুবরণ নয়, বরং ত্রিশ নীট প্রতিভে পিছু হটতে
পারে। হারপুন শুঙলোর পিচ্ছিল আচ্ছাদনের কোন ক্ষতি

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for a systematic approach to record-keeping, such as using a ledger or accounting software, to ensure that all financial data is properly documented and organized.

2. The second part of the text focuses on the importance of regular reconciliation of accounts. This involves comparing the company's internal records with external statements, such as bank statements or supplier invoices, to identify any discrepancies or errors. Regular reconciliation helps to ensure the accuracy of the financial statements and prevents the accumulation of mistakes over time.

3. The third part of the text discusses the importance of budgeting and financial planning. It highlights the need to establish a realistic budget for the business, taking into account all expected income and expenses. By comparing actual performance against the budget, management can identify areas where costs are exceeding expectations and take corrective action.

4. The fourth part of the text emphasizes the importance of maintaining adequate liquidity. This means ensuring that the business has sufficient cash or liquid assets to meet its short-term obligations, such as payroll, rent, and supplier payments. Maintaining liquidity is crucial for the long-term survival and growth of the business.

5. The fifth part of the text discusses the importance of seeking professional advice from accountants or financial advisors. These professionals can provide valuable insights and guidance on financial matters, helping businesses to optimize their financial performance and make informed decisions.

মস্তিষ্কে কী মেসেজ যাচ্ছে কল্পনা করতে পারছে ও: হ্যাঁ, খেতে ভালই লাগবে এটা। মস্তিষ্ক পাল্টা সংকেত দিচ্ছে: তা হলে ধরো ওটাকে! নিয়ে এসো আমার কাছে!

চোষকগুলো উরু বেয়ে উঠছে। ওঁড়ের মাথাটা চোখা, তার নীচের অংশ চওড়া হয়ে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে রানার উরুর প্রশস্ত দিকটা তো ঢাকা পড়লই, এরপর ওর একটা কবজিরও নাগাল পেতে যাচ্ছে। ওটাই রানার টার্গেট। ব্যথা আর আতঙ্কটুকু জয় করতে হবে ওকে, অপেক্ষা করতে হবে কবজিটাকে কখন নাগালের মধ্যে পায়।

এক ঝলক বাতাস, প্রথম ভোরের কোমল বাতাস, ইনলেটের ধাতব পাত সদৃশ সারফেসে ফিসফাস আওয়াজ করছে। ছোট ছোট ডেউ উঠল, ছুটে গিয়ে মৃদু ধাক্কা খেল পাহাড়-প্রাচীরের খাড়া গায়ে। এক ঝাঁক করমরান্ট উড়ল কোথাও থেকে, ইনলেটের পাঁচশো ফুট উপরে চক্কর দিল একবার, তারপর ক্যাচক্যাচ আওয়াজ তুলে চলে গেল খোলা সাগরের দিকে।

করমরান্ট উড়ে যাওয়ার পর ওগুলোকে বিচলিত করার আওয়াজটা রানার কানে পৌঁছাল-পর পর তিনবার বিস্ফোরিত একটা সাইরেনের শব্দ, অর্থ হলো কার্গো গ্রহণ করতে তৈরি ওটা।

আওয়াজটা এল রানার বাম দিক থেকে। জেটিটা নিশ্চয়ই ইনলেটের উত্তর বাহুর বাঁকের পর। সাপ্লাই নিয়ে জাহাজ এসেছে, ফেরার সময় অন্য ধরনের কার্গো নিয়ে যাবে। হয়তো সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে জাহাজটা। বাইরের দুনিয়ার একটা অংশ থেকে, যে দুনিয়া এক মিলিয়ন মাইল দূরে, রানার নাগালের বাইরে। হয়তো চিরকালের জন্যই ওর নাগালের বাইরে। এই তো, বাঁকটার পরেই গ্যালিতে বসে লোকজন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। রেডিওর খবর শুনছে। টিভির প্রোগ্রাম দেখছে। কড়াইয়ে ছাত্

রানা-৩৫৫

ছাত্ আওয়াজ করছে মটরগুটি আর মাছ বা মাংস। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কফির সুবাস।

চোষকগুলো এখন ওর নিতম্বে। হাড় সদৃশ কাপগুলোর ভিতর চোখ পড়ল রানার। একটা অপ্রীতিকর ভ্যাপসা গন্ধ পেল ও, স্কুইডের খাটো একটা হাত ঢেউ তোলার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে উঠে আসছে উপরে। হাতের পিছনে গ্রে-ব্রাউন রঙের জেলি কতটা শক্ত? ও কি ছুরির কোপ মারবে? না, দ্রুতবেগে ঘন দিতে পারলে কাজ হবে, রশি কাটার ভঙ্গিতে। নিজের চামড়া কেটে ফেলবার ভয়টাকে পাত্তা দিলে চলবে না।

এখন! জোড়া ফুটবল আকৃতির চোখ দুটোর দিকে ঝট করে একবার তাকাল রানা-রাজ্যের সহিষ্ণুতা সেখানে, কৌতূহলের ছিটেফোঁটাও নেই। এই সময় দ্বিতীয় লম্বা বাহুটা পানির সারফেস ভেঙে সোজা ছুটে এল ওর মুখ লক্ষ্য করে। ঝাঁকি খেয়ে মাথাটা পিছিয়ে নিল রানা। বাহুটা তার ডিঙিয়ে এসে মুঠো পাকাল ওর চোখের সামনে। এক সেকেন্ডের মধ্যে ওর কাঁধ বা গলায় সরে যাবে ওটা, সেই সঙ্গে ভবলীলা সাজ হবে। এখনই!

লম্বা প্রথম হাত বা হুঁড়টা ওর পাঁজরে। লক্ষ্যহিরের জন্য তেমন একটা সময় না নিয়েই রানার ছুরি ধরা হাতটা তির্যক একটা পথ ধরে নেমে এল। মাছের পুড়িৎ-এর মত মাংসে ছুরির ফলা বেঁধাটা অনুভব করল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে আহত ওঁড় সপাং করে পানিতে নেমে যাওয়ার ওর হাত থেকে ছুরিটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেল ওর চারপাশে টগবগ করে ফুটছে সাগর। এরপর দ্বিতীয় লম্বা বাহুটা তার ছেড়ে দিয়ে ওর পেটে বাড়ি মারল। হাতটা ওখানে জোঁকের মত সঁটে থাকল, প্রতিটি চোষক সমস্ত শক্তি শাঙ্গে লাগাচ্ছে। মাংসে কামড় দেওয়ায় চোঁচিয়ে উঠল রানা। উন্মত্তের মত ছুরি চালান ও, বারবার। আল্লাহ, ওর পেট বোধহয় ছিঁড়ে

ফেলা হচ্ছে। টানা-হ্যাঁচড়ায় বেড়াটা অনবরত কাঁপছে। ওর নীচে পানি ফুটছে আর সাদা ফেনা তৈরি করছে। হাল না ছেড়ে উপায় নেই ওর। আর একটা কোণ, এবার বাহুর উল্টোপাশে। কাজ হলো! কাঁকি খেয়ে মুক্ত হলো ওটা, একেবেঁকে নেমে গেল পানিতে, ওর পেটের উপর রেখে গেল বিশটা লাল বৃত্ত, বৃত্তগুলোর কিনারায় রক্ত।

ওগুলো নিয়ে দৃষ্টিভ্রম করার সময় নেই রানার। কারণ এবার পানির সারফেস ভেঙেছে স্কুইডের মাথাটা। চারদিকে প্রবল আলোড়ন ওঠায় পানিতে ফেনা তৈরি হচ্ছে। স্কুইডের লাল চোখ দুটো আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। স্কুয়ার্ট বাহুর জঙ্গলটা ওর গোড়ালি আর হাঁটুতে পৌঁছে গেল, টেনে ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে দিচ্ছে সুতি কাপড়। টান দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নীচে নামাচ্ছে রানাকে। ওর বগলের তলায় কামড় বসাচ্ছে তার। অনুভব করল টান পড়ায় মেরুদণ্ড লম্বা হচ্ছে। এখনও যদি বেড়া না ছাড়ে ও, শরীরটা দুটুকরো হয়ে যাবে। এখন চোখ দুটো আর বিরাট তেকোনা শক্ত ঠোঁট পানির ঠিক উপরে উঠে এসেছে। ঠোঁট দিয়ে রানার পায়ের নাগাল পেতে চাইছে ওটা। এই সময় একমাত্র আশাটা দেখতে পেল রানা।

ছুরিটা দু'সারি দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিল রানা, খালি হাত স্যাঁৎ করে নেমে এল বল্লমের গায়ে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করল ওটা, তারপর দুই হাতে ধরল ঝাড়া করে। এখন নীচের দিকে ঝুঁকতে হবে ওকে, তা না হলে নাগাল পাওয়া যাবে না, কাজেই হাতল থেকে একটা হাত সরিয়ে নিতে হলো। এখন যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, বেড়ার উপরই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হবে ওকে।

এখনই, অসহ্য ব্যথায় জ্ঞান হারাবার আগে! এখন, এখন!

তারের তৈরি মই থেকে গোটা শরীরটাকে খসে পড়তে দিল

রানা-৩৫৫

রানা, তারপর অবশিষ্ট সবটুকু শক্তি নিয়ে আঘাত করল।

পলকের জন্য দেখতে পেল রানা একটা কালো মণিতে বল্লমের ডগা ঢুকে যাচ্ছে। পরমুহুর্তে ফেন গোটা ওকে লক্ষ্য করে উখলে উঠল কালো একটা ফেনারায় পড়ে গেল ও, শরীরটা উল্টে গেছে, ঝুলছে হাঁটুর উপর, মাথাটা পানির সারফেস থেকে কয়েক ইঞ্চি নীচে।

কী ঘটল? ও কি অন্ধ হয়ে গেছে? চোখে কিছু দেখছে রানা। চোখ দুটো কুটকুট করছে। মুখের ভিতর মাছের ভয়ানক গন্ধ। তবে অনুভব করছে হাঁটুর পিছনের মাংস তারমানে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে ও! আচ্ছন্ন অবস্থায় দিল ও, হাত তুলে কাছাকাছি এক গ্রন্থি তা চাইছে। ধরল ওটা। অপর হাতটা তুলল। তার অসহনীয় কষ্টের ভিতর দিয়ে নিজেকে তুলে বেড়াটার যাতে বসতে পারে। কীপ আলোর কোণে চোখে। মুখের উপর একটা হাত ঘষল। এখন দেখতে পাচ্ছে। হাতের দিকে তাকাল। ওটা কী চটচটে। চোখ নামিয়ে শরীরের নীচের দিকে তাকাল রঙে ঢাকা পড়ে গেছে ও। ওর চারপাশের বিশ গা নোংরা। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা কী ঘটেছে। আহত তার কালির খলে ওর দিকে উপুড় করেছে।

কিন্তু স্কুইডটা কোথায়? ওটা কি ফিরে আসবে? চারদিকে তল্লাশী চালাল রানা। কোথাও কিছু নেই, শুধু হাল পড়া কালো রঙ ছাড়া। কিছুই নড়ছে না। একটা ছোট ছোট পানি নেই। তা হলে অপেক্ষা কোরো না! জলদি পালাও! ব্যত হলে ডানে আর বাঁয়ে তাকাল রানা। বাম দিকে জাহাজটা, তবে ওখানে রয়েছে বদ্ধ উন্মাদটাও। কিন্তু ডানে কিছু না। তারের বেড়াটা তৈরি করার জন্য লোকজন নিশ্চয়ই বাম দিক থেকে

শয়তানের দ্বীপ

এসেছিল, জেটির ওদিক থেকে। নিশ্চয়ই কোনও ধরনের পথ আছে। হাত উঁচু করে উপরের কেইবলটা ধরল রানা, প্রচণ্ড ব্যস্ত তার সঙ্গে দোল খাওয়া বেড়া ধরে বিশ গজ দূরের পাথুরে হেডল্যান্ডের দিকে এগোল।

দুর্গন্ধ ছড়িয়ে, রক্ত ঝরিয়ে কালো কাকতাদুয়াটা তার হাত আর পা চালাচ্ছে দম দেওয়া পুতুলের মত। চিন্তা করার, কিছু অনুভব করার যন্ত্রপাতি এখন যেন রানার শরীরের অংশ নয়। ওগুলো ওর শরীরের পাশে থেকে ওর সঙ্গে এগোচ্ছে, কিংবা মাথার উপর ভেসে থাকছে, তবে সুতোয় টান দিয়ে পুতুলটাকে দিয়ে কাজ করাবার জন্য যথেষ্ট যোগাযোগ রাখছে। রানা এখন দ্বিখণ্ডিত একটা পোকা, দুই টুকরো হয়ে ঝাঁকি খাচ্ছে সামনে বাড়ার জন্য, অথচ প্রাণ বিদায় নিয়েছে, তার জায়গা দখল করেছে নার্সাস ইমপালস-এর নকল প্রাণ। শুধু, রানার বেলায়, টুকরো দুটো এখনও মৃত নয়। ওগুলোর মধ্য থেকে সাময়িক দূরে সরে আছে প্রাণ। ওর শুধু এখন দরকার খানিকটা আশা, অল্প একটু আশ্বাস-বেঁচে থাকার চেষ্টা করাটা এখনও ফলপ্রসূ হতে পারে।

পাহাড়ী পাঁচিলের গায়ে পৌছাল রানা। ধীরে ধীরে তারের সবচেয়ে নীচের ধাপে নেমে এল। মৃদু উথলানো পানির দিকে তাকাল। কালো হয়ে আছে, দৃষ্টি চলে না, তবে যথেষ্ট গভীর বলেই অনুভব করা যায়। স্কুইডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়েছিল হাঙর, এখন আবার ফিরে আসেনি তো? কিংবা আহত স্কুইডটা ওর পিছু নেয়নি তো, পানিতে নামলেই গুঁড় লম্বা করে পেঁচিয়ে ধরবে?

ফতই ঝাঁকি থাক, পানিতে একবার নামতেই হবে রানাকে। যতক্ষণ না গায়ে শক্ত হয়ে গুঠা পলি আর রক্ত ধুচ্ছে, মুছে ফেলতে পারছে মাছের উৎকট দুর্গন্ধ, ততক্ষণ ওর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

ছিন্নভিন্ন শার্ট আর ট্রাউজার খুলে তারে ঝোলাল রানা। সারা শরীরে চোখ বুলাল, আঁচড় আর ছোট-বড় দাগ ভর্তি। মনে পড়ে যেতে পালস দেখল একবার। ধীর লয়ে চললেও, নিয়মিত। জীবনের সুশৃংখল স্পন্দন উৎসাহ বাড়িয়ে তুলল ওর। দূর ছাই, কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছে! বেঁচে আছে ও। শরীরের ক্ষত আর আঁচড়গুলো কিছুই নয়। ওর একটা হাড়ও ভাঙেনি। হেঁড়া এনভেলাপের ভিতর মেশিনটা বেশ জোরেই টিক টিক করছে। আগে বাড়, ব্যাটা! ধুয়ে পরিষ্কার কর নিজেই, ঘুম থেকে জাগ। কত কিছু হারাসনি, ভেবে কৃতজ্ঞ হ। মেয়েটার কথা চিন্তা কর। পাগলটার কথা চিন্তা কর, যাকে তোর খুঁজে বের করে খুন করতে হবে। আড়াই কোটি নিখুঁত সাইবর্গ বানিয়ে গোটা পৃথিবী দখল করে নিতে চায় সে। শুরুতেই তার কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে এই অশুভ কর্মকাণ্ড থামিয়ে দিতে হবে। আকিয়াবের সামরিক প্রশাসক কর্নেল বস চাও পারায়াকে বললেই অয়েস্টার দ্বীপে কী হচ্ছে দেখার জন্য পুলিশ বা সেনাবাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা করবে সে। বোম্বার পাঠিয়ে বোমা ফেলার পরামর্শ দিত রানা, কিন্তু তাতে দ্বীপে বন্দি হাজার হাজার জেলে মারা যাবে।

তবে তার আগে পালের গোদা, মূল কালপ্রিট, কবির চৌধুরীর একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে। তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কোন লাভ নেই। আইনের ফাঁক গলে, কিংবা দুর্নীতির আশ্রয় নিরে আবার পালিয়ে যাবে সে। তার মত অশুভ প্রতিভার কাছ থেকে সভ্যতাকে নিরাপদ রাখার একমাত্র উপায় দুনিয়া থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া।

দশ মিনিট পর। ঘমামাজা শরীরে ভেজা কাপড়চোপড় সেঁটে আছে। চোখের উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে চুল। প্রায় খাতা ঢাল বেয়ে উঠে এল হেডল্যান্ডে।

হ্যাঁ, ওর আন্দাজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সর্ব একটা পাথুরে

শরতানের দ্বীপ

পথ, রোহিঙ্গা শ্রমিকদের আসা-যাওয়ায় তৈরি হয়েছে, হেডল্যান্ডের আরেক প্রান্তের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে, ঘুরে পার হয়েছে পাহাড়-প্রাচীরের ফুলে থাকা একটা অংশকে।

কাছাকাছি কোথাও থেকে নানা রকম শব্দ ভেসে আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বুঝতে পারল একটা ট্রেন কাজ করছে। পাম্প করে পানি নিষ্কাশন চলছে, সম্ভবত কোন জাহাজ থেকে।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। নিঃশব্দ নীল। লালচে-সোনালি মেঘ জড়ো হয়ে আছে দিগন্তের কোল ঘেঁষে। ওর মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে ঝাঁক-ঝাঁক করমরান্ট পাখি। খানিক পর মাছ খাওয়ার উৎসব শুরু করবে ওগুলো। এই মুহূর্তে হয়তো দূর সাগরে মাছের খবর নিতে পাঠানো স্কাউট গ্রুপের উপর নজর রাখছে। এখন বোধহয় ছ'টা বাজে। শান্ত, সুন্দর একটা ভোর, সারাটা দিন ভাল যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে।

সরু পথে রক্তের ফোঁটা ঝরিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা। পাহাড়-প্রাচীরের গাঢ় ছায়ার ভিতর রয়েছে ও। ঝাঁক ঘোরার পর দেখা গেল প্রকাণ্ড আকারের বোল্ডারের ভিতর দিয়ে একেবেঁকে এগিয়েছে পথটা। শব্দগুলো এখন আগের চেয়ে জোরাল লাগছে কানে। হাঁটার গতি কমিয়ে আনল রানা। আরও সাবধান হলো, লক্ষ রাখছে আলগা কোন পাথরে যেন পা লেগে না যায়।

চমকে ওঠার মত কাছাকাছি কোথাও থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'শুরু করতে পারি?'

দূর থেকে কেউ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

ট্রেনের ইঞ্জিন গর্জে উঠল।

আর মাত্র কয়েক গজ। আরেকটা বোল্ডার। তারপর আরেকটা। এইবার!

পাথরের গায়ে শরীরটা স্টেটে আছে, অত্যন্ত সাবধানে মাথা এগিয়ে ঝাঁকের ওদিকে তাকাল রানা।

সতেরো

দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে, যা কিছু দেখার দেখেই, মাথাটা টেনে নিল রানা। পাথরের ঠাণ্ডা গায়ে হেলান দিল ও, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। চোখের সামনে ছুরিটা তুলে ফলাটা পরীক্ষা করল। সম্ভ্রষ্ট হয়ে পিছনে নিয়ে গেল, শিরদাঁড়ার গায়ে বেল্টের সঙ্গে গুঁজে রাখল। সহজ নাগালের মধ্যে থাকল ওখানে, কিছুটা সঙ্গে ধাক্কা লাগার আশঙ্কাও কমল। লাইটারের কথা ভাবল ও। হিপ পকেট থেকে বের করল ওটা। জ্বলবে তো নাই-ই, বরং পাথরের সঙ্গে ঘষা খেয়ে আওয়াজ করতে পারে। পায়ের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে মাটিতে রেখে দিল ওটা।

এরপর বসল রানা, মস্তিষ্কে আঁকা ছবিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে।

ঝাঁকের পর, খুব বেশি হলে দশ গজ দূরে, ট্রেনটা রয়েছে। কেবিনের কোন পিঠ নেই। ওটার ভিতর কন্ট্রোলে এক লোক বসে রয়েছে। এ হলো সেই বার্মিজ রোহিঙ্গা, কেবিন ক্রুজারে চড়ে সার্চ পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তার সামনে বিশ গজ দূরে জেটি, শেষ মাথাটা অবিকল T একটা। বিশ হাজার টনী একটা পুরানো ট্যাংকার T-এর মাথা বরাবর নোঙর ফেলেছে। পানি থেকে যথেষ্ট উঁচু হয়ে আছে ওটা, জেটি থেকে ডেক সম্ভবত

বারো ফুট উপরে। ট্যাংকারের পিছনে নাম লেখা-সি ফ্রেম। ট্যাংকারে প্রাণের কোন সাড়া নেই, শুধু ঘেরা ব্রিজের ভিতর হুইলের সামনে বসে এক লোককে তুলতে দেখা গেছে। বাকি সব তুরা নীচে আছে, গোয়ানো ধুলোকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য।

ফ্রেনের ঠিক ডানদিকে, পাহাড়-প্রাচীর থেকে করোগেটেড আয়রন হাউজিং-এ ঢাকা একটা ওভারহেড কনভেয়ার-বেল্ট বেরিয়ে এসেছে। খাড়া করে পোঁতা উঁচু পোল-এর সাহায্যে জেটির অনেক উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটাকে, থেমেছে ট্যাংকার-হোল্ডের ঠিক পিছনে। কনভেয়ার-বেল্টের মুখ শেষ হয়েছে ক্যানভাসের বিশাল একটা মোজায়। ভায়ামিটারে সম্ভবত ছয় ফুট হবে ওটা। ফ্রেনটার কাজ হলো তারের ফ্রেম সহ মোজার মুখটা তোলা, ওটা যাতে সরাসরি ট্যাংকার-হোল্ডের উপরে থাকে। ফ্রেনের দ্বিতীয় কাজ হলো, মোজার মুখটাকে ডানে আর বাঁয়ে আনা-নেওয়া করা, যাতে সমবন্টন নিশ্চিত হয়। মোজার মুখ থেকে বিরতিহীন নিরেট স্রোত হয়ে দুধের সঙ্গে ফেটানো ডিমের মত রঙ নিয়ে বেরিয়ে আসছে গোয়ানো ধুলো, স্রোতটা সরাসরি নেমে যাচ্ছে হোল্ডে, প্রতি মিনিটে কয়েক টন করে।

নীচে, জেটির বাঁয়ে, ভেসে যাওয়া গোয়ানো ধুলোর উল্টো দিকে, দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘদেহী ডক্টর থাকিন গজনবি ওরফে কবির চৌধুরী।

ব্যস, এটুকুই। সকালের বাতাস পালকের মত নরম ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে গভীর জলের হারবারে, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীরের নীচে এখনও অর্ধেকটা গাঢ় ছায়ায় ঢাকা। কনভেয়ার-বেল্ট শান্ত গম্ভীর একঘেয়ে শব্দ তুলে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। ফ্রেনেরা ইঞ্জিনও তার নিজস্ব ছন্দে সচল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, নেই অন্য কোন নড়াচড়া। জাহাজের হুইলে উপস্থিত

প্রহরা ছাড়া প্রাণের আর কোন চিহ্ন নেই। এ-সবই যে সুষ্ঠুভাবে চলছে, স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হচ্ছে দ্বীপটার মালিক-কবির চৌধুরী।

পাহাড়ের উল্টোদিকে শ্রমিকদের একটা বাহিনী কাজ করছে, কনভেয়ার-বেল্টে তুলে দিচ্ছে টন টন গোয়ানো, সেটা পাথরের গহ্বর থেকে গর্জন তুলে বেরিয়ে আসছে এদিকে। তবে এপাশটায় তাদের কারও আসার অনুমতি নেই, আনার কোন দরকারও নেই। কনভেয়ার-এর মুখ তাক করা ছাড়া এখানে কারও কোন কাজ নেই।

বোল্ডারের পাশে বসে চিন্তা করছে রানা-দূরত্ব মাপছে, স্মরণ করছে ফ্রেন ড্রাইভারের হাত আর পা লিটার আর প্যাডেলের ঠিক কোথায় ছিল। ধীরে ধীরে ওর বোদে পোড়া কর্কশ চেহারা সুরু, কঠিন এক টুকরো হাসি ফুটল। ইয়েস! ব্যাপারটা শুরু করা যায়! এ সম্ভব। তবে আলগোছে, নরম ভাবে, ধীরে ধীরে। পুরস্কারটি হবে প্রায় অসহ্য বকম মিষ্টি।

হাত আর পায়ের তলা পরীক্ষা করল রানা। এগুলো দিয়ে হবে। হতেই হবে। পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে ছুরির হাতলটা অনুভব করল। ঠেলে এক ইঞ্চি সরাল ওটাকে। দাঁড়াল, বড় করে শ্বাস নিল কয়েকবার, লবণ মেশানো চুলে দু'হাত চালাল, মাথা থেকে নামিয়ে এনে কর্কশভাবে ঘষল গালে, তারপর হেঁড়া-ফাটা জিনসের দু'পাশে ঝোলাল। সবশেষে আঙুলগুলো বার কয়েক নাচাল। ও এখন তৈরি।

খাঁজে পা রেখে বোল্ডারটার খানিক উপরে উঠল রানা, একপাশের কিনারা থেকে সাবধানে উঁকি দিয়ে তাকাল।

কিছুই বদলায়নি। দূরত্ব সম্পর্কে যা আন্দাজ করেছিল রানা, সেটা ঠিকই আছে। ফ্রেনের ড্রাইভার নিজের কাজে মগ্ন। খোলা খাকি শার্টের উপর ঘাড়টা নগ্ন-যেন অপেক্ষারত। বিশ গজ দূরে

রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির চৌধুরী, যেন সাদাটে-হলুদ ধুলোর প্রপাতকে পাহারা দিচ্ছে। ব্রিজের লোকটা সিগারেট ধরাচ্ছে।

দশ গজ পথ দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল রানা, ক্রেনের পিছন দিকটাকে পাশ কাটিয়ে গেছে সেটা। কোথায় কোথায় পা ফেলবে আগে থেকে ঠিক করে রাখল ও। তারপর বোল্ডার থেকে নীচে নামল, সাবধানে বাঁকটা ঘুরেই ছুটল।

দৌড়ে ক্রেনের ডানদিকে যাচ্ছে রানা, ওর বাছাই করা জায়গায় পৌছাতে পারলে কেবিনটা ওকে ড্রাইভার আর জেটির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে। সেখানে পৌছাল রানা, থামল, কুঁজো হলো, কান পেতে আছে। ইঞ্জিন গজরাচ্ছে, ওর পিছন আর উপরের পাহাড় থেকে গভীর শব্দ তুলে বেরিয়ে আসছে কনভেয়ার-বেল্ট। কোথাও কিছু বদলায়নি।

কেবিনের পিছনে লোহার দুটো পাদানী, রানার মুখ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে, দেখে যথেষ্ট শক্ত আর নিরেট বলেই মনে হচ্ছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছোটখাট শব্দকে চেপে রাখবে। তবে সিট থেকে লোকটার শরীরকে খুব দ্রুত টেনে সরিয়ে দিতে হবে, নিজের হাত আর পা রাখতে হবে নিয়ন্ত্রণে। ছুরির এক কোপেই সারতে হবে আসল কাজটা। হাত তুলে নিজের কলারবোন ছুলো রানা, নরম তেকোনা জায়গাটার চামড়া অনুভব করল, নীচে জাগিউলার লাফাচ্ছে। স্মরণ করল লোকটার পিঠ লক্ষ্য করে এগোবার সময় পথটা কতটুকু তির্যক হবে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল ছুরিটাকে শরীরে ঢোকাতে হবে গায়ের জোরে।

কান পাতল শেষবারের মত। শিরদাঁড়ার কাছ থেকে টেনে নিল ছুরিটা। একটা প্যাহারের মত নিঃশব্দ ক্ষিপ্ততার সঙ্গে লোহার ধাপ বেয়ে কেবিনে উঠল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়া করার কোন প্রয়োজন

দেখা গেল না। লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, তার গন্ধ পাচ্ছে নাকে। সময় পেল ছুরি ধরা হাতটা কেবিনের প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু করার, শরীরের সমস্ত শক্তি এক করার। তারপর ফলা নামিয়ে আনল ওর হলদেটে চামড়ায়।

লোকটার হাত আর পা কন্ট্রোল থেকে খসে পড়ল। মুখটা ঘুরে গেছে রানার দিকে। ওর মনে হলো ওকে চিনতে পেরে বিস্ফারিত চোখ জোড়া আরেকটু বড় হলো, পরমুহূর্তে কালো অংশটুকু গড়িয়ে উপর দিকে উঠে গেল। এরপর বিষম খাওয়ার মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল খোলা মুখ থেকে। বিরাট শরীরটা লোহার সিট থেকে ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে।

ঝট করে সিটটায় বসে প্যাডেল আর লিভারের দিকে হাত-পা বাড়াল রানা। সব কিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

ইঞ্জিন চলছে নিউট্রালে, ড্রাম থেকে সবেগে বেরিয়ে আসছে তারের ভারী রশি, ক্রেনের ডগাটা জিরাফের গলার মত ধীরে ধীরে সামনের দিকে বেকে যাচ্ছে, কনভেয়ার-বেল্টের ক্যানভাস মুখ বাঁকা হয়ে আছে, এই মুহূর্তে ধুলোর স্তম্ভ খসে পড়ছে জাহাজ আর জেটির মাঝখানে। কবির চৌধুরী মুখ তুলে উপর দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ খোলা। সে বোধহয় চিৎকার করে কিছু বলছে।

ধীরে ধীরে মেশিনটার লাগাম টেনে ধরল রানা। ইঞ্জিন পুরোদমে চালু হলো। ড্রাম এখন ধীরে ধীরে ঘুরছে উল্টোদিকে।

ক্যানভাস মুখ ফিরে আসছে জাহাজের উপর। ক্রেনের ডগা উঁচু হলো, তারপর স্থির। দৃশ্যটা এখন আবার আগের মত।

সামনে ঝুঁকে আঁয়রন হুইলের দিকে হাত বাড়াল রানা। ড্রাইভারকে প্রথম যখন এক পলকের জন্য দেখেছিল ও, এটার উপরই ছিল লোকটার হাত। কোনদিকে ঘোরাতে হবে জানে রানা। প্রথমে বাঁ দিকে ঘোরাল হুইল। ক্রেনের ডগা সামান্য ডান

দিকে ঘুরে গেল। এবার হুইলটা ডান দিকে ঘোরাল ও। হ্যা, প্রচলিত নিয়মেই সাড়া দিচ্ছে ক্রেন-আকাশের গা ধরে বাঁ দিকে এগোচ্ছে ওটা, সঙ্গে ঝুলছে কনভেয়ার-বেল্ট-এর মুখ।

জেটির দিকে ছুটল রানার দৃষ্টি। কবির চৌধুরী সরে গেছে। কয়েক পা এগিয়ে একটা পোলের কাছে দাঁড়িয়েছে সে। পোলটা চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল ওর।

পাগল বিজ্ঞানীর হাতে একটা ফোনের রিসিভার দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের অপর দিকটার সঙ্গে যোগাযোগ করছে সে।

ডিরেক্টর হুইল ঘোরাল রানা। দূর ছাই, এটা আরও জোরে ঘুরবে না? আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যাবে কবির চৌধুরীর, তার আগেই কাজটা শেষ করতে হবে রানাকে।

আকাশের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ক্রেনের ডগা। এই মুহূর্তে কনভেয়ার-বেল্টের মুখ নিঃশব্দে ধুলোর স্তম্ভ ছাড়ছে জাহাজের পাশে। এখন হলুদ স্তূপ জেটির উপর যেন মিছিল করে এগোচ্ছে। পাঁচ গজ, চারগজ, তিন, দুই! ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবি না, শালা বন্ধ উন্মাদ! এইবার, পেয়েছি তোকে। হুইল থামালাম। নে এবার, চৌধুরী!

একেবারে শেষ মুহূর্তে ঘাড় ফেরাল কবির চৌধুরী। তার লম্বা বাহু দুটো দু'দিকে প্রসারিত হতে দেখল রানা, যেন নেমে আসা ধুলোর স্তম্ভকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে সে। একটা হাঁটু দৌড়াবার জন্য উঁচু হলো। মুখ খুলে গেল, ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে সরু একটা চিৎকার ভেসে এল রানার কানে। তারপরের দৃশ্য নাচের। কবির চৌধুরী প্রাণ বাঁচানোর জন্য নৃত্য শুরু করেছে। তবে তা মাত্র পলকের জন্য স্থায়ী হলো। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল পাখির শব্দকানো, মিহি আর হলুদ বিষ্ঠার একটা টিবি আকারে শুধু বড়ই হচ্ছে, শুধু বড়ই হচ্ছে।

রানা-৩৫৫

‘খোদা!’ কেবিনের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল রানার কণ্ঠস্বর। নোংরা ধুলোয় ফুসফুস ভরে ওঠার কথা ভাবল ও, কল্পনার চোখে দেখতে পেল শরীরটা ঝুঁকে পড়ছে, তারপর বোঝার চাপে পড়ে যাচ্ছে, শেষবারের মত বৃথাই গোড়ালি ছুঁড়ছে। শেষ অনুভূতিটা কী হতে পারে তার? রাগ, আতঙ্ক, পরাজয়? তারপর দুর্গন্ধময় সমাধির ভিতর চির নিস্তব্ধতা জাঁকিয়ে বসবে।

হলুদ পাহাড়টা এখন বিশ ফুট উঁচু। জেটির কিনারা থেকে সাগরে পড়ছে এখন ওই ধুলো। জাহাজটার দিকে তাকাল রানা। ঠিক সেই মুহূর্তে ওটার সাইরেন তিনবার আওয়াজ করল। পাহাড়-প্রাচীরে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দটা। আবার বাজল সাইরেন, এবার থামছে না। প্রহরীকে দেখতে পাচ্ছে রানা, শব্দ করে একটা লাইন ধরে ব্রিজের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। কন্ট্রোল থেকে হাত তুলে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘষল রানা। এবার যেতে হয়।

সিট ছেড়ে লাশটার দিকে ঝুঁকল ও। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পরীক্ষা করল। .৩৮, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, রেগুলার মডেল। নিজের বেল্টে গুঁজে রাখল অস্ত্রটা। ধাপ দুটোয় পা দিয়ে নেমে এল ক্রেনের কেবিন থেকে।

ক্রেনের পিছনেই লোহার একটা মই, পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে উঠে গেছে, থেমেছে ঠিক যেখানে বেরিয়ে রয়েছে কনভেয়ার-হাউজিং। করোগেটেড আয়রনের দেয়ালের গায়ে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ধাপ বেয়ে উঠল রানা। সহজেই খুলে গেল দরজাটা, সেই সঙ্গে মিহি কিছু গোয়ানো বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

সচল রোলার আর কনভেয়ার-বেল্টের দ্রুতগতি ছুটে যাওয়া কান ফাটানো আওয়াজ তৈরি করেছে হাউজিং-এর ভিতর।

শয়তানের দ্বীপ

টানেলটা দেখতে পাচ্ছে রানা, ওটার পাথুরে সিলিংয়ে ইমপেকশন লাইট জ্বলছে। টানেলের ভিতর দিয়ে সরু একটা ক্যাটওয়াক পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেছে, পাশে খরস্রোতা ধুলোর একটা নদী। ওটা ধরে হন হন করে এগোল ও, আঁশটে অ্যামোনিয়াক বাতাসে ছোট করে শ্বাস নিচ্ছে। যে-কোন মূল্যে এই টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছাতে হবে ওকে—জাহাজের সাইরেন বাজার তাৎপর্য আর সাড়া না দেওয়ায় টেলিফোন রহস্য গার্ডরা বুঝতে পারার আগেই।

টানেল ধরে ছুটতে শুরু করল রানা, ফলে ঘনঘন হোঁচট খাচ্ছে। আর কত দূর? দুশো গজ? কিন্তু তারপর কী? কে জানে কী! টানেলের মুখ থেকে বেরিয়েই গুলি শুরু করবে ও। আতঙ্ক ছড়িয়ে ভাল কিছু আশায় থাকবে। কাউকে আটকে জেরা করে জেনে নেবে কোথায় রাখা হয়েছে মেয়েটিকে। তারপর কী? পাহাড়ী ঢালে পৌঁছে কী দেখবে ও? কতটুকু অবশিষ্ট আছে তার?

ছোট্টার গতি আরও বাড়াল রানা। মাথাটা নিচু করে রেখেছে, চোখ রাখছে ব্যবধান রেখে ফেলা কাঠের তক্তাগুলোয়, ভাবছে পা ফসকে গোয়ানো ধুলোর নদীতে পড়ে গেলে কী অবস্থা হবে। বেল্ট থেকে কি আবার বেরিয়ে আসতে পারবে ও, নাকি স্রোতটা ওকে টেনে নিয়ে যাবে, তারপর ফেলে দেবে কবির চৌধুরীর সমাধির উপর?

নরম একটা পেটে আঘাত করল রানার মাথা। অনুভব করল দুটো হাত ওর গলায় উঠে এসেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, পিস্তলটার কথা ভেবে এখন কোন লাভ নেই। ওর একমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল পেশিতে ঢিল দিয়ে প্রথমে নিচু হলো, তারপর পা জোড়াকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সামনে। ওর কাঁধের ধাক্কায় সরে গেল পা দুটো, সেই সঙ্গে একটা আতর্জিৎকার শোনা গেল শরীরটা মুখ প্লবড়ে পড়ল ওর পিঠে।

এক দিকে ঠেলে দিতে যাচ্ছিল রানা, ইচ্ছে আরোমগকাধীকে কনভেয়ার-বেল্টে ফেলে দেবে, এই সময় চিকিৎসকের দরম আর শরীরটার নরম স্পর্শ মুহূর্তের জন্য পদ্ম বানিয়ে দিল ওকে। এ সম্ভবই নয়!

যেন ওর বিশ্বাসের উত্তরেই তীক্ষ্ণ দাঁত কামড় বসল ওর ডান পায়ের নরম মাংসে, সেই সঙ্গে পিছন দিকে ঢালিয়ে একটা কনুই ঠেতো মারল ওর উরুসন্ধিতে।

ব্যথায় গুঁড়িয়ে উঠল রানা। শরীরটাকে 'দ' বানিয়ে সারো যাওয়ার চেষ্টা করছে। 'লোলি' বলে চেঁচিয়ে ওঠা সত্ত্বেও কনুইটা আবার ঠেতো মারল ওকে।

তবে সাবধান ছিল বলে এবার রানা স্তম্ভন ব্যথা পেলে না। এক ঝটকায় দাঁড়াল ও, শক্ত করে তার একটা কবজি ধরে আছে, তা না হলে কনভেয়ার-বেল্টে পড়ে যেতে পারে। সে-ও দাঁড়াল, মাথা দিয়ে ঠেতো মারল ওর বুকে—তবে তত জোরে নয়, এতক্ষণে সে-ও কেন বুঝতে পারছে কোথাও একটা গোচরাল হচ্ছে।

‘খামো! লোলি! আমি রানা!’

কনভেয়ার-বেল্টের একটানা গর্জন সত্ত্বেও রানার চিকিৎসকটা তার কানে পৌঁছল। তার পাল্টা চিকিৎসার প্রকারে পেল রানা ‘রানা?’ ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে। ‘রানা! রানা! রানা! রানা!’

বীরে বীরে নিজেকে তালিফন মুক্ত করল রানা। ‘তুমি ভাল আছ, লোলি?’

‘আছি!’ আনন্দে আপুত হয়ে ইশারাই করল। ‘আমি ভাল আছি, তালিফ!’ রানার বুকে মাথা রেখে কঁপিয়েছে।

‘আর ভয়ের কিছু নেই, লোলি।’ তার মাথার কুল চিকিৎসক করে দিচ্ছে রানা। ‘ভীর গজনিবি মন গোছে।’ তবে এখনই এই

দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে আমাদের। এসো! টানেল থেকে আমরা বেরুব কী করে? এখানে তুমি এলেই বা কীভাবে?

রানাও থামল, কী এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে বাঁকি খেয়ে থেমে গেল কনভেয়ার-বেল্টটাও।

মেয়েটিকে নিজের কাছে টেনে নিল রানা। শ্রমিকদের নোংরা একটা নীল ইউনিফর্ম পরে আছে সে, আস্তিন আর পায়াল গুটানো। উর্দিটা শরীরের তুলনায় অনেক বড়। গোয়ানো ধুলো লেগে সাদা হয়ে আছে তার চেহারা, শুধু চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে দুই গাল। রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'ওই তো, ওই ওদিকে! একটা সাইড টানেল আছে, মেশিন শপ আর গ্যারেজের দিকে চলে গেছে। ওরা কি আমাদের পিছু নেবে?'

কথা বলার সময় নেই, রানা শুধু তাগাদার সুরে বলল, 'আমার পিছু নাও!' বলেই ছুটল। নীরবতার ভিতর মেয়েটির নরম পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাইড টানেলের মোড়ে পৌঁছাল ওরা। গার্ডরা কোনদিক থেকে আসবে? সাইড টানেল, নাকি মেইন টানেলের ক্যাটওয়াক ধরে? সাইড টানেলের বহু দূর থেকে ভরাট গুপ্তন ভেসে আসতে জবাবটা পেয়ে গেল রানা। মেয়েটিকে ধরে মেইন টানেলে কয়েক ফুট পিছিয়ে এল ও। ফিসফিস করে বলল, 'দুঃখিত, লোলি। বাঁচতে হলে ওদেরকে খুন না করে উপায় নেই আমার।'

'জানি,' দৃঢ়, চাপা গলায় জবাব দিল মেয়েটি। রানার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল সে, জায়গা করে দিল ওকে। তারপর দুই হাত তুলে চেপে ধরল কানে।

বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করে চেক করল রানা। ছয়টা চেম্বারই লোড করা। ও জানে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে ভাল লাগবে না ওর, তবে এই লোকগুলো রোহিঙ্গা খুনি, কবির চৌধুরীর পোষা গুণ্ডা, তাদেরকে দিয়েই নির্দয় আর নোংরা সমস্ত

কাজ করানো হয়েছে। এখনকার পরিস্থিতি হয় মারো, নয়তো মরো। কাজটা অবশ্যই দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে ওকে।

লোকগুলোর গলার আওয়াজ কাছে চলে আসছে। তিনজন তারা। কথা বলছে নার্সাস সুরে, গলা চড়িয়ে। সম্ভবত কয়েক বছর পর টানেলে ঢুকতে হয়েছে তাদেরকে। রানা ভাবছে মেইন টানেলে বেরিয়ে আসার সময় তারা কি চারদিকে তাকাবে? নাকি তাদের পিঠে গুলি করতে হবে ওকে?

এখন খুব কাছে চলে এসেছে তারা। মেঝেতে তাদের ছুতো ঘষা খাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে রানা।

'আমি শালা ওই মাগীটার ভাগ চাই!'

'আগে তাকে ধরতে পারিস কিনা দেখ!'

প্রথম লোকটা মেইন টানেলে বেরিয়ে এল, তারপর দ্বিতীয় লোকটা, সবশেষে তৃতীয়জন। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল রয়েছে, তবে আলগাভাবে ধরা।

তীব্রকণ্ঠে ওদের ভাষায় বলল রানা, 'না, আর কাউকে তোমরা ধরতে পারবে না।'

ঝট করে ঘুরল তারা। খোলা মুখের ভিতর সাদা দাঁত ঝকঝক করছে। পিছনের লোকটার মাথায় আর দ্বিতীয় লোকটার পেটে গুলি করল রানা। সামনের লোকটার পিস্তল ধরা হাত উপরে উঠে এসেছে। শিস বাজিয়ে রানাকে পাশ কাটাল একটা বুলেট। আরেকবার গর্জে উঠল রানার পিস্তল। গলাটা খামচে ধরল প্রতিপক্ষ, ধীরে ধীরে ঘুরল, তারপর কাত হয়ে খসে পড়ল কনভেয়ার-বেল্টে। প্রতিধ্বনিগুলো ধীর গতিতে টানেল ধরে ছুটোছুটি করছে। খানিকটা মিহি ধুলো উড়ল বাতাসে, তারপর নেমে এল। বাকি দুটো শরীর স্থির পড়ে আছে।

সাইড টানেল ধরে ছুটছে রানা, এক হাতে মেয়েটির কবজি চেপে ধরে আছে।

সাইড টানেলের বাতাস পরিষ্কার, মেঝে ধরে ছুটতেও কোন সমস্যা হচ্ছে না। তবে রানার উদ্বেগ কমার বদলে আরও বরং বেড়েছে। গুলির শব্দ টানেলের বাইরে থেকে শোনা গেছে কিনা জানা নেই ওর। শত্রুদের সংখ্যা বা শক্তি সম্পর্কেও পরিষ্কার কোন ধারণা নেই। দ্বীপে কবির চৌধুরীর লোক কয়েক শো ভো হবেই, এমনকী হয়তো হাজারও ছাড়িয়ে যাবে। তারা কি সবাই ওদেরকে ধাওয়া করবে? মনে হয় না।

‘প্রায় পৌছে গেছি, ডার্লিং রানা!’ হঠাৎ বলল লোলি। ‘গ্যারেজে একটা দরজা আছে, সেটা দিয়ে একটা মেশিন শপে যাওয়া যায়। ওখানেই তো যেতে চাই আমরা?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ।’

একটু পরই টানেলের গায়ে কাঠের দরজাটা দেখতে পেল ওরা। কবাট খানিকটা খোলা রয়েছে, তবে ভিতর থেকে কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না।

পিস্তলটা বের করে কবাট দুটো সাবধানে পুরোপুরি খুলল রানা। লম্বা গ্যারেজটা খালি। টিউব লাইটের আলোয় কালো আর সোনালি রঙে পেইন্ট করা, চাকার উপর বসানো ড্রাগনটাকে দেখতে পেল ওরা। একটা স্লাইডিং দরজার দিকে মুখ করে রয়েছে ওটা। আর্মারড কেবিনের হ্যাচ খোলা। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা, ট্যাংক যেন ভর্তি থাকে। সেই সঙ্গে আশা করল, নিশ্চয়ই মেশিনটা ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়েছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে লোকজনের গলা ভেসে এল। কয়েকজন লোক, কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে।

মেয়েটির হাত ধরে সামনে ছুটল রানা। লুকাবার একটাই জায়গা আছে—ড্রাগনের ভিতর। ভিতরে ঢুকে মাথা নিচু করে বসে থাকল ওরা। রানা ভাবছে, আর মাত্র তিনটে বুলেট আছে।

স্লাইডিং ডোর ঝনঝন শব্দে খুলে গেল।

‘কী করে জানছ ওরা গুলি করছে?’

‘গুলি ছাড়া কিছু হতে পারে না। আওয়াজটা চেনা যায়।’

‘তা হলে রাইফেল নেয়াই ভাল। নাও, কাদির। বাঙালীটাকে ফেলা চাই। টেবিলের নীচে অ্যামিউনিশন বস্তু।’

বোল্ট ঠেলে জায়গা মত বসানোর ধাতব আওয়াজ হলো। সেফটি ক্যাচ ক্লিক করে উঠল।

‘বাঙালীটা হতে পারে না। আমাদেরই কেউ হয়তো পাগল হয়ে গেছে। খোদা! ডক্টর গজনবি কী ভয়ঙ্কর সব এক্সপেরিমেন্টই না করছেন। সত্যি কথা বলতে কি, গোটা দ্বীপটাকে আমরা একটা পাগলা গারদ বানিয়ে রেখেছি। যাই হোক, আমার ধারণা মেয়েটির পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়। আজ সকালে কেউ তোমরা তাকে দেখেছে?’

‘না, সার।’

‘না।’

‘না।’

কিছুক্ষণ হাঁটা-চলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর আবার কেউ বলল, ‘ঠিক আছে, চলো এবার। দু’জন দেয়াল ঘেঁষে থাকো, যতক্ষণ না টানেলে পৌছাই। গুলি করবে পায়ে। যে-ই ঝামেলা পাকিয়ে থাকুক, ডক্টর গজনবি চাইবেন শয়তানটাকে তাঁর সামনে হাজির করা হোক।’

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল লোকগুলো।

লোলির বাহু ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকাল রানা। সাবধানে হ্যাচ খুলে কান পাতল। কোন শব্দ নেই। গ্যারেজের মেঝেতে নেমে ড্রাগনের পিছনে চলে এল ও, উকি দিল আশ খোলা প্রবেশ পথের ভিতর। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে মাছ ভাজার গন্ধ ভেসে রয়েছে। জিভে পানি চলে এল। কাছাকাছি একটা দালান থেকে ডিশ, প্লেট আর প্যান

শয়তানের দ্বীপ

ঠোকাঠুকির আওয়াজ আসছে। মাত্র বিশ গজ দূরে ওটা। ওটার একটু সামনে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে বেরিয়ে পিটার বাজানোর আওয়াজ, সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের গান। একটা কুকুর বার কয়েক খেঁউ-খেঁউ করে খেমে গেল। ভোবাবমান পিনশার।

ঘুরে গ্যারেজের শেষ মাথায় ফিরে এল রানা। টানেল থেকেও কোন শব্দ আসছে না। সাবধানে টানেল দরজাটা বন্ধ করল ও, বোল্ট টেনে তালা লাগিয়ে দিল। এরপর দেয়ালে তৈরি আর্মস-হ্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল। শিখ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল আর রেমিটেন কারবাইন পছন্দ হলো ওর। লোড করা কিনা দেখে নিয়ে ড্রাগনের পাশে ফিরে এল আবার, অস্ত্র দুটো ধরিখে দিল লোলির হাতে।

এবার প্রবেশপথের দরজা। ওটার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে চাপ বাড়িয়ে পুরোটা খুলল রানা। করোগেটেড আয়রন ফাঁপা আওয়াজ করল। ছুটে ফিরে এসে খোলা হ্যাচ গলে ড্রাগনের ভিতর নামল রানা। ড্রাইভারের সিটে বসে তাগাদার সুরে ফিসফিস করে বলল, 'বন্ধ করো, লোলি।'

কুঁকে ইগনিশন কি ঘোরাল।

ফুয়েল গজ-এর কাঁটা 'ফুল'-এ উঠে গেল। রানা প্রার্থনা করছে, শালার জিনিসটা যেন তাড়াতাড়ি স্টার্ট নেয়। স্টার্টারে পায়ের চাপ দিল ও। খেঁকিয়ে উঠল ইঞ্জিন। আওয়াজটা নিশ্চয়ই কমপাউন্ডের সব জায়গা থেকে শোনা গেছে। আবার চেষ্টা করল রানা। খেঁকিয়ে উঠে খেমে গেল আবার। তৃতীয়বারে স্টার্ট নিল।

এবার সাবধানে গিয়ার দাও। কিন্তু কোনটা? ওটা একবার দিয়ে দেখো। হ্যাঁ, হয়েছে। ব্রেক ছাড়ো, বোকা কোথাকার।

ব্রেক ছাড়তেই পথে বেরিয়ে এল ড্রাগন। দ্রুত ছুটছে ওরা।

'কেউ কিছু নিয়েছে?' ডিজেলের পর্দাভেদে হালিমে উঠল রানার ডিম্বেকার।

'না। দাঁড়াও। হ্যাঁ, কুঁড়ে থেকে একটা লোক বেরিয়েছে? আরেকটা। ওরা হাত নেড়ে, ডিম্বেকার করে কী যেন বলছে আমাদেরকে। আরও অনেক লোক বেরিয়ে আসছে। একজন ডান দিকে দৌড়িয়েছে। আরেকজন তার ঘরে ফিরে গেল। আবার বেরিয়ে আসছে, হাতে রাইফেল। অস্ত্র সেনাটা। ওলি করছে।'

'ফাঁকটা বন্ধ করো! মোকতে করে পড়ো।' কঠি করে একবার শিপিডেমিটারের দিকে তাকাল রানা। বিশ। এই মুহূর্তে একটা তালা রয়েছে ওরা। মেশিনটার কাছ থেকে এর বেশি কিছু আদায় সম্ভব নয়। ওটাকে নির্দিষ্ট পথের উপর রেখে তালাবার চেষ্টা করছে ও।

শিপিডেমিটার উপর বসানো কেবিন উঁচু-নিচু হচ্ছে, কাত হচ্ছে এদিক ওদিক। কন্ট্রোলে হাত আর পা ধরে রাখতে হিমশিম খেতে যাচ্ছে রানা। কেবিনের গায়ে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। আরেকটা। রেজ কত? চারশো গজ? ওভার ড্রিং। তবে তাকে কিছু আসে যায় না। তেঁতিয়ে উঠল ও, 'লোলি, পেছনটা একবার দেখো। ফাটলটা এক ইঞ্চি ফাঁক করো।'

'লোকটা দাঁড়িয়েছে। এখন আর ওলি করছে না। বন্ধ লোক, ভিড় করে তাকিয়ে আছে এদিকে। দাঁড়াও, কিছু কী যেন দেখতে পাচ্ছি। কুকুর! ওরা কুকুর লেলিয়ে নিয়েছে। ওভালের সঙ্গে কেউ নেই। আমাদের দিকে তাঁরের মত ছুটে আসছে। ধরে ফেলবে নাকি?'

'ধরলেও কিছু এসে যায় না। এসো, আমার পাশে এসে বসো। শব্দ করো শরীরটাকে। খেয়াল রাখো মাথায় যেন ছাড়েক সঙ্গে ঠুকে না যায়।' প্রটিল উপরে তুলল রানা। পাশে বসে লোলির দিকে ফিরে হাসল। 'ডিডার কিছু নেই, লোলি। আমরা

পালাতে পেরেছি। লেকে নামি, তারপর কুকুরগুলোকে মারব।
ওগুলোকে চিনি, শুধু একটাকে খুন করলেই হবে, বাকিগুলো
ব্যস্ত হয়ে উঠবে সেটাকে ছিড়ে খেতে।

কাঁধে লোলির হাত অনুভব করল রানা।

লেকে নেমে পানির উপর দিয়ে পঞ্চাশ গজের মত এগোল
রানা, তারপর মেশিনটাকে থামিয়ে ইঞ্জিনকে অলস করে রাখল।
ঘুরে বসল ও, তারপর ফাটলে চোখ রেখে দেখল শেষ বাঁকটা
ঘুরে ছুটে আসছে শিকারী কুস্তার পাল। রাইফেলটা তুলল রানা,
ফাটলের ভিতর ব্যারেল ঢোকাল। কুকুরগুলো পানিতে নেমে
সাঁতরাচ্ছে।

ট্রিগারে আঙুল রেখে ওগুলোর মাঝখানে একের পর এক
গুলি করছে রানা। একটা ঝাঁকি খেয়ে উল্টে গেল, আকাশের
দিকে পা ছুঁড়ছে। আরেকটা থামল, ডুবে যাচ্ছে। আরেকটা চিৎ
হলো। ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে ওগুলোর চিৎকার শোনা
যাচ্ছে। পানিতে রক্ত ছড়াতে দেখল রানা। ওগুলো তুমুল লড়াই
শুরু করেছে নিজেদের মধ্যে।

একটা কুকুরকে লাফিয়ে আহত সঙ্গীর উপর পড়তে দেখল
রানা, ঘাড়ের মাংসে সঁধিয়ে দিল ধারাল দাঁত। দেখতে দেখতে
উন্মত্ত হয়ে উঠল গোটা পাল। ওগুলোর মাঝখানে ম্যাগাজিনটা
খালি করল ও।

আবার ছুটল ড্রাগন। দূরে ম্যানগ্রোভের পাঁচিলে একটা ফাঁক
দেখা যাচ্ছে। ওটাই নদীর মুখ।

পাঁচ মিনিট কোন কথা হলো না। তারপর মেয়েটির হাঁটুতে
একটা হাত রেখে রানা বলল, 'আর কোন বিপদ নেই, লোলি।
বস মারা গেছে জানার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়বে তারা। ঘটে
যাদের বুদ্ধি আছে তারা চেষ্টা করলে পালাতে পারবে, প্রেনে বা
লঞ্চে চড়ে। নিজেদের চামড়া বাঁচাতে অস্থির থাকবে সবাই,

আমাদের কথা ভাবার সময় পাবে না।

'আর আমরা?'

'আমরা নৌকা নিয়ে ফিরব, যেভাবে এসেছি। এখন
বোধহয় দশটা বাজে। আমাদের সেই সৈকতে পৌঁছাতে এক
ঘণ্টার মত লাগবে। ওখানে বিশ্রাম নেব আমরা, গুরুত্বিত হাজার
জনো গুরুত্বিত নেব। আবহাওয়া তো ভালই দেখছি, রাতে
চানও উঠবে। আজ রাতেই রওনা হবে আমরা। তারকি হল
তোমার সইবে তো?'

রানার কাঁধে মৃদু চাপ দিল লোলি। 'আমাকে নিয়ে ভাব
হবে না। বলো, তোমার সইবে কিনা? ইস, যেদিকে তাকাত
সেদিকেই দেখি হয় পুড়ে গেছে, না হয় কেটে-ছিঁড়ে গেছে।
তোমার পেটে লাল দাগগুলো কীসের?'

'পরে বলব। তেমন কিছু নয়। তবে তোমার কথা বলা
কাল রাতে কী হলো? কাঁকড়ার হাত থেকে বাঁচলে কীভাবে
তোমার চিকিৎসা সাবাসি রাত আমি--'

সত্যি হাসছে লোলি। আড়চোখে তাকাল রানা। তার দীর্ঘ
কালো চোখ অনিদ্রায় ভারী হয়ে আছে। তবে বাকি সব একদম
ঠিক।

'লোকটা নিজেকে সবজান্না ভাবত। আসলে বোকার বন।
কালো কাঁকড়াকে আমার চেয়ে বেশি ভয় পেরে সে। তোমাকে
তো বলেছি, কোন পত-পাখি বা কীট-পতঙ্গ আমাকে খুঁশে আমি
কিছু মনে করি না, ভয় তো পাই-ই না। তা ছাড়া, এই
কাঁকড়াগুলো কিছুই বলবে না তোমাকে, তোমার শরীরে যদি
খোলা ক্ষত না থাকে আর তুমি যদি চুপচাপ পড়ে থাকো। আরও
ব্যাপার আছে-ওগুলো মাংস পছন্দ করে না। আসলে বোধহয়
লোকটা দেখতে চেয়েছিল ব্যাপারটাকে কীভাবে নিই আমি।
ব্যাটা বুড়ো ভাম!'

‘হাক বাবা!’ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

‘তাই বলে ভেবে না সময়টা আমার সুখে কেটেছে। কাপড়মোপড় সব খুলে নিয়ে রশি নিয়ে গজালের সঙ্গে বেঁধে রাখল মাটিতে। তবে বোহিলা সেবারও কেউ ছুঁতে সাহস পায়নি আমাকে। প্রথম হাসি-ঠাট্টা করে ফিরে খেল তারা। পাখরে একা গুয়ে হাকা, সে যে কী আতঙ্ক! তবে সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবছিলাম আর প্রাণন করছিলাম কীভাবে তব্বির গজদলবিকে ধরব, তারপর খুন করব।

‘তারপর কনটে পেলাম কাকড়াগুলো আসছে। দেখি ঠিকই বলেছিল লোকটা, সংখ্যায় এত বেশি যে ওবে শেষ করা যাবে না। জানতাম কী করতে হবে—কিছুই না করে পড়ে থাকলাম, নট নড়নচড়ন। ওগুলো আমার পাশ দিয়ে, আমার উপর দিয়ে ইট্টে চলে গেল। আমাকে হয়তো আরেকটা পাখর ভাবল।

‘তোমার অপেক্ষায় থাকলাম আমি, কারণ জানতাম ওই সময় ঘুমানোর জন্যে গর্তে ঢুকবে ওগুলো। সত্যি কথা বললে ভুমিও হয়তো বিশ্বাস করবে না, ওগুলোকে আমার ভালই লেগেছে। আর ত্রো কেউ ছিল না, সারাটা রাত ওরাই আমাকে মরি দিয়েছে।

‘এক সময় ওদের সংখ্যা কমে গেল। তারপর দেখি আর আসছে না। এবার আমি নড়াচড়া শুরু করলাম। পালা করে সবগুলো গজাল টেনে তুলে ফেললাম, তারপর তানদিকের বড় গজালটিকে নিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বস্তাবস্তির পর ফাঁটলের ফাঁক থেকে বের করে আনলাম ওটাকে। বাকি কাজ পানির মত সহজ ছিল।

‘বিকিটে ঢুকে এদিক ঠেসদিক ঘুরলাম। গ্যারেজের কাছে একটি মেশিন শীপ এটা পড়ে থাকতে দেখে গায়ে চড়লাম। তারপর দেখি কনটেয়ার-বেল্ট ছুটিছে। বুঝলাম পাহাড়ের তেতর

দিয়ে পোয়ানো নিয়ে যাচ্ছে। তারফবে ধরে নিয়েছি তোমাকে ঘেরে ফেলেছে ওরা। ভাবলাম কনটেয়ার-বেল্ট ধরে এগিয়ে গজদলবি ব্যাটিকে পাড়ান্না যাবে, আর পাড়ান্না মারই তাকে আমি খুন করব। খুনটা করার জন্যে একটি হু-হুইকার নিলাম। খিক খিক করে হাসল লোলি। ‘তোমার সঙ্গে বাচ্চা লালার সময় আমার পকেটে ছিল ওটা, তা না হলে ঠিকই পেঁখে নিতাম। হাস, আমার গল্প এখানেই শেষ।’

হাত বাড়িয়ে লোলির তুল ধরল রানা। টেনে নিজের দিকে নিয়ে এল তাকে। দুটো মুখ কাছাকাছি হালো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কারও মোখেই পলক পড়ছে না। তারপর লোলিকে চুমো খেল রানা।

মেশিনটা এক পাশে ঝাঁকি খেলো। কুমোটার এখানেই সমাপ্তি। নদীর মুখের কাছে প্রথম মানসম্মত শিকড়ে বাক্স খেঁচেছে দ্বাপন। সেয়ে পড়ল ওরা।

৩৩৩